এ্যাডভেঞ্চার অমনিবাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

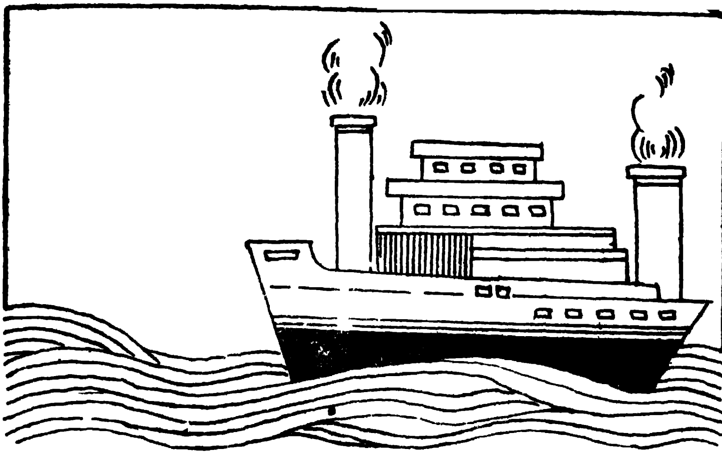
নন্দিতা পাবলিশার্স
৬এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
রবীন্দ্র নাথ চন্দ্র
নন্দিতা পাবলিশার্স
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ : ২ আগস্ট ১৯৬০

মুদ্রাকর :
গোবিন্দ লাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিণ্টার্স
২, ছিদামমুদি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

এতে যা আছে



ভূতুড়ে জাহাজ

॥ এক ॥

জাহাজ ভূতের রহস্য

মানুষ মরে গিয়ে ভূত হয়। অন্তত কিছু কিছু মানুষ যে হয়ই তা আমি হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু কেউ যদি বলে যে আস্ত একটা জাহাজ মরে ভূত হয়েছে, তবে আমি কেন, আমাদের খেঁদা, পেঁচো, ভূতো থেকে শুরু করে স্বয়ং চক্কোত্তিমশায়ও তেড়েমেড়ে ডাণ্ডা হাতে আসবেন। পাগল, না মাথা খারাপ? জ্যান্ত প্রাণী পটল তুললে তার নির্ঘাত ভূত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাই বলে যা জড়পদার্থ, তা মরবেই বা কেমন করে? ভূত হওয়া তো দূরের কথা।

আমাদের ভোম্বল বিজ্ঞানে বড় পাকা। তার মতে জড়পদার্থের বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে। জড়পদার্থ ধ্বংস হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

তাহলেই হল। ভূত তো আসলে একটা স্পিরিট। বাংলা ভাষায় তাকে আমরা শক্তি বলতে পারি অনায়াসে। জাহাজ একটা জড়

পদার্থ। জাহাজের মরা মানে ধ্বংস হওয়া এবং ভোম্বলের মতে তা স্পিরিট হয়ে ওঠা।

ইংরেজীতে স্পিরিট কথার আসল মানে কিন্তু আত্মা বা ভূত-প্রেত। কাজেই একটা জাহাজের মরার পর দস্তুরমত ভূত-প্রেত হবার সম্ভাবনা রয়েছেই।

কিন্তু যাই বলো, এ তো একেবারে আজগুবি ব্যাপার। পোড়ো বা ভাঙা বাড়ীতে ভূতের আড্ডা হয় আমরা শুনেছি। কে শুনেছে, স্বয়ং পোড়োবাড়িটাই ভূত হয়ে ভয় দেখাচ্ছে সবাইকে? তেমনি কে শুনেছে, একটা আস্ত জাহাজ জলে ডুবে মরার পর পাক্কা নির্ভেজাল ভূত হয়ে উঠেছে?

শুনেছে বইকি! সেই আজগুবি কাহিনীটা বলতেই তো আমরা জাঁকিয়ে বসে পড়েছি। শুনেছে আফ্রিকা মহাদেশের সুদাম, ইরিত্রিয়া, আবিসিনিয়ার অজস্র মানুষ—যারা আজীবন জলচর। কেউ নৌকোর মাঝি-মাল্লা, কেউ স্টীমলঞ্চ বা স্টীমারের খালাসী আর সারেঙ, কেউ বা জেলে। তাদের মুখ থেকে শুনেছে আরও অনেক মানুষ। তাদের কারো গায়ের চামড়া সাদা, কারো কালো। কিন্তু সবাই মুণ্ডু কাত করে কথাটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অন্তত কাছাকাছি গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসার পর আর কারো সাহস হয় নি এ বিষয়ে তর্কাতর্কি করে।

কী বিষম বে-আক্কেলে ভূত এই জাহাজভূতটা। পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে থাকতেই নাকি যা বিদঘুটে কাণ্ড করে ভাবা যায় না। চারপাশে জল তোড়পাড় হতে থাকে। অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যায়। রাত্রিবেলা হলে আরও ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য দেখা যায়। একসঙ্গে হুইসেল বেজে ওঠে অনেকগুলো। হাজার হাজার পিদিম নাচে ঢেউয়ের দোলায়। কালো কালো সব ছায়ামূর্তি জলের উপর হেঁটে বেড়ায়—তারা দেখতে আস্ত একেকটি মাস্তুল।

মোটর বোটের ড্রাইভার মাহমুদ জার্ভে আরব। লম্বা-চওড়া ছ'ফুট দশাসই চেহারা। সে বাস করে অবশ্য ডাঙায়। বউ, কাচ্চাবাচ্চা

আছে। সুদানের সোয়াকিন বন্দরের শেষপ্রান্তে তার ছোট্ট পাথরের ঘরখানি। পরিবেশটা বড় বিচিত্র। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে মরুভূমি, আর একদিকে অথৈ জলের সাগর। দেশ-বিদেশ থেকে বেড়াতে আসে নানান জাতের মানুষ। তাদের মোটর বোটে চাপিয়ে সাগরে ঘুরে বেডানোই মাহমুদের পেশা। বেশ দু'পয়সা কামায় সে। তার সঙ্গীর নাম ওমর শেখ। সেও জাতে আরব। গড়নে মাহমুদের চেয়ে অনেক খাটো। রোগা হাড়-জিরজিরে চেহারা। তেমনি মেজাজটিও বড রুক্ষ। হুট্ করতেই লোকের সঙ্গে বচসা তার লেগেই আছে। শেষে পিটুনি খাবার উপক্রম হলে তখন মাহমুদকেই গিয়ে বন্ধুকে বাঁচাতে হয়।

খুব নেশাখোর মানুষ ওমর। কিন্তু একটা গুণে সে মাহমুদের চেয়ে সরেস। খুব ভয়ঙ্কর বিপদের সময় তার মগজটি কিন্তু বেশ পরিষ্কার থাকে। ভীষণ বেপরোয়া দুঃসাহসী গোঁয়ারগোবিন্দ সে। মাহমুদের মত শান্ত গোবেচারা বা বোকা নয়।

এই দুই বন্ধু কমপক্ষে বার-চারেক স্বচক্ষে জাহাজভূতের কাণ্ড-কারখানা দেখে এসেছে। এটা কিন্তু কম দুঃসাহসের কথা নয় ওই অঞ্চলে। একবার দৈবাৎ ওখানে গিয়ে জাহাজভূত দেখার পর আর কেউ কস্মিন্‌কালে ওদিকে যাবার নাম করে না। আর ওমর-মাহমুদ কিনা চার-চারবার ওখানে গেছে! বন্দরের বুড়ো জেলে তারিফ বলে, ওরা এবার গেলেই মরবে। নিশির ডাক লেগেছে ওদের কানে। ওরা না গিয়ে থাকতে পারবে কেন?

আসলে ওমর-মাহমুদ ব্যাপারটা ভূত বলে মানতে পারছে না। ওদের ধারণা, এর পিছনে কিছু একটা রহস্য আছেই। ওরা যদি ডুবুরী হ'ত, অবশ্যই এই রহস্যটা জেনে ফেলে লোকজনকে তাক লাগিয়ে দিত।

অনেক ডুবুরীকে তারা সাধাসাধি করেছে। কিন্তু কেউ রাজী হয়নি। ওরে বাবা! জেনে-শুনে মারা পড়তে যায় কেউ? আর, শুধু ভূত হলেও কথা ছিল, ওই তল্লাটে সমুদ্রের তলায় হাঙরের উপদ্রব

আছে বারোমাস। তার ওপর আছে রাক্ষুসে একরকম জঘন্য মাছ— তার নাম বারাকুদা। দলে দলে তারা ছুটে এসে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা ভয়ঙ্কর রক্তপাগল। কোন মানুষ বা প্রাণীর শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, এমন অবস্থায় জলে পড়লে সে যা কাণ্ড শুরু হয়, বলতেও গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। রক্তের চিহ্ন দেখেই হোক বা গন্ধ শুঁকেই হোক, চারপাশের এলাকায় যত বারাকুদা আছে, বড় বড় করাত দাঁতওয়ালা হাঁ করে তেড়ে আসে।

কাজেই কোন ডুবুরীই রাজী হয়নি এ প্রস্তাবে। এমন কি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে সৌখিন সাহেব-ডুবুরীরা এদিকে এসেছে, অনেক বলেও তারা পিছিয়ে গেছে শেষ অব্দি। হাঙর এবং বারাকুদা ছাড়াও আরেকটা অসুবিধা হচ্ছে, ডুবন্ত জাহাজটার চারপাশে এক মাইল সীমানার মধ্যে যেতে গেলে সুদান সরকারের অনুমতি চাই। স্থানীয় লোকেরা বিনা অনুমতিতে গোপনে ওখানে যেতে পারলেও সাহেব ডুবুরীরা আবার খুব নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ।

বিনা হুকুমে তাঁরা যেতে রাজী নন। আবার অনেক সাধাসাধি করে হুকুম যদি-বা মিলল, হাঙর-বারাকুদার ভয়টা বড় হয়ে উঠল। তারপরও অনেকে গেছে অবশ্য। কিন্তু আর তাকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেখা যায়নি।

এদিকে আর একটা মজার গুজবও চালু আছে। সাধারণ লোকের মতে জাহাজটায় নাকি বিস্তর সোনাদানা রয়েছে। কিন্তু সরকার থেকে রটানো হয়েছে, সোনাদানা নয়, ওতে ডুবে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্রের মশলা যা যুদ্ধের কাজে লাগে। আছে কয়েক হাজার টন ডিনামাইট। আছে বিপজ্জনক মিথেন-গ্যাসের সেল। আরও কত কী! খবরদার ওখানে কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করতে যেও না। হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে গেলে নিজেরা তো মরবেই, এলাকার অনেকগুলো বন্দর বিপন্ন হবে। এমন কি বেশ কিছুকাল এই সাগরের জলপথটাও সব জাহাজের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

সে কারণেই নাকি বড় সহজে অনুমতি কাউকে দেওয়া হয় না।

এবার ডুবন্ত জাহাজটার ইতিহাস বলি শোন।...

তখন ইউরোপে সবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আজ থেকে আশী বছর আগের কথা। চারিদিকে সাজো সাজো রব। সুদান এলাকায় বৃটিশ সরকারের রাজত্ব। ঠিক যেদিন ইটালি মিত্রশক্তি অর্থাৎ বৃটেন-ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল, সেদিনই রাত্রির অন্ধকারে ইরিত্রিয়ার দিকে চলেছে একটা ইটালী বাণিজ্য-জাহাজ। যাচ্ছে মাসোয়া বন্দর লক্ষ্য করে। বাহিরের চেহারায় সেটি নিছক বাণিজ্য-জাহাজ, কিন্তু ভিতরে নাকি রয়েছে যুদ্ধের সরঞ্জাম। সোনাদানাও নাকি রয়েছে প্রচুর। আফ্রিকা উপকুলে ইটালী সরকার অন্তর্ঘাত-মূলক ষড়যন্ত্রের কাজে নাকি জাহাজটাকে ছদ্মবেশে পাঠিয়েছে।

খবরটা সুদানের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন পাঠিয়ে ইটালীর জাহাজটার তলা ফাঁসিয়ে দিলেন। সুদান বন্দরের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং সোয়াকিন বন্দরের সাত মাইল পূর্ব-দক্ষিণে জাহাজটা ডুবে গেল চিরকালের মত। জাহাজের লোকজন—যারা প্রাণ বাঁচাতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল বা লাইফবেল্ট পরে ভাসছিল, তারা কেউ হাঙর-বারাকুদার পেটে, কেউ ব্রিটিশ জলসেনার গুলি খেয়ে মারা গেল।

জাহাজটার নাম ছিল 'উম্‌ব্রিয়া'। সবটাই জলের নীচে রইল তার। কেবল জেগে রইল জলের ওপর একটা মাস্তুল। সমুদ্র-শকুনদের বিশ্রামের জায়গা হয়ে উঠল সেটা। তাদের সাদা বিষ্ঠায় দিনে দিনে মাস্তুলটা পুরো সাদা হয়ে গেল।

উম্‌ব্রিয়া ডুবে যাওয়ার উনিশ বছর পরে এ কাহিনী।

যে সাগরের কথা এতক্ষণ বলেছি, তার নাম 'রেড-সী' বা লোহিত সাগর। লোহিত সাগর কেন? ওকে লাল সাগর বলাই ভালো। এই লাল সাগরের শুরু আরব সাগরের উত্তর-পশ্চিমের এডেন উপসাগর থেকে। শেষ হচ্ছে একেবারে সুয়েজ ক্যানেল হয়ে ভূমধ্য সাগরে। লাল সাগর চলে গেছে উত্তর-পশ্চিম কোণে। লম্বালম্বিতে হাজার মাইলেরও বেশি, চওড়ায় দু'শো, কোথাও আড়াইশো, আবার

কোথাও-বা পঞ্চাশ মাইলও বটে। সুয়েজের দিকে এগোলে লাল সাগরের ডাইনে পড়েছে সউদী আরব, বামে আফ্রিকা মহাদেশের আবিসিনিয়া, ইরিত্রিয়া, সুদান, আর মিশর। ডাইনে বড় বন্দর বলতে এক জেদ্দা। যেখান থেকে মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র মক্কা খুব কাছেই। বাম উপকূলে কিন্তু বন্দরের সংখ্যা অনেক। ওমর-মাহমুদের বাড়ি সোয়াকিনও তেমনি একটা বন্দর।

সাগরের জলের রঙ তো নীল। তাই বলা হয়, নীল সাগরের জল। কিন্তু লাল সাগর কেন? জলের রঙ লাল হয় নাকি? না হয় যদি, তাহলে কেন এই আজগুবি নাম লাল সাগর বা রেড-সী?

বলছি। সাগরের তলায় প্রবাল-কীট জমে ওঠার কথা তোমরা জানো। ঝাঁকে-ঝাঁকে প্রবাল-কীট জমে থাকে কোন কোন জায়গায়। এই সাগরে আবার প্রবাল-কীটের রাজত্ব বললেই চলে। ডুবো পাহাড়ের সংখ্যা এখানে বড় কম নয়। ওই সব ডুবো পাহাড় ঘিরে থরে-থরে লক্ষ-কোটি ঝাঁক প্রবাল-কীট জমে ওঠে। প্রবাল-কীটের দরুণ দূর থেকে এই সাগরের জল সত্যি-সত্যি লাল দেখায় অনেক সময়।

তাই কিনা লাল সাগর। আর এই লাল সাগরের দুই জলচর মানুষ সেই ওমর শেখ আর মাহমুদ। 'উম্‌ব্রিয়া' ভূতের রহস্য জানতে তাদের চোখে ঘুম নেই।

উনিশ শো ষাট খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। উপকূল এলাকায় মরুভূমি আর পাহাড়ের রাজত্ব। তাই ঝাঁঝাল গরম হাওয়া বইছে। ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে গায়ে। কে বলে সাগরতীর নাতিশীতোষ্ণ? লাল সাগরের এ তল্লাটে তো নয়ই।

সেই গরমে সুদান থেকে রেলপথে এসে নেমেছে এক জার্মান সায়েব। নেশাটা তার মজার! জলের নীচে ডুব দিয়ে ঘুরে বেড়ানো। শৌখিন ডুবুরী সে। নাম হচ্ছে 'হ্যানস্ হ্যাস্'। তার বন্ধু সুদানের এক ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট বিল—গ্রাহাম বিল। সোয়াকিনে এসেছে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েই। উদ্দেশ্য, লাল সাগরের তলায় ডুব মেরে

বেড়ানো। শখটা আজগুবি নয় শুধু, রীতিমত মারাত্মকও বটে। হাঙর-বারাকুদা মাছের পাল্লায় পড়লে আর জ্যান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না বাছাধনকে। মাঝি-মাল্লা-জেলেরা এই সব মন্তব্য করছিল নিজেদের মধ্যে।

খবরটা শুনেই লাফিয়ে উঠেছিল মাহমুদ আর ওমর শেখ। এই সায়েব বাবাজীকে একবার বলবে কথাটা?

ব্যস্! সঙ্গে সঙ্গে দৌড়। সাগরের ধারে তাঁবু। সেইখানেই দুই বন্ধু সরাসরি হাজির।

॥ দুই ॥

যাত্রা হল শুরু

গ্রাহাম বিল একে ম্যাজিস্ট্রেট, তার ওপর গোঁড়া রক্ষণশীল ব্রিটিশ সায়েব। মাহমুদ-ওমরের প্রস্তাব শুনেই সে লাল চোখে তেড়ে এল: গেট আউট, গেট আউট!

মাহমুদ ঘাবড়ে গেল। কিন্তু রগচটা ওমর তেজী আরবী ঘোড়ার মত রুখে দাঁড়িয়ে বলল, আরে থামো, থামো সায়েব। তোমাদের ব্রিটিশ লোকগুলোকে চিনতে আমার বাকি নেই। আমরা তো তোমার কাছে আসিনি! এসেছি যার কাছে তার কথা শুনতে চাই।

মাহমুদ আড়ালে চিমটি কেটে বন্ধুকে হুঁশিয়ার করছিল। সর্বনাশ! স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব—বেশি চটে গেলে এলাকায় বোট বাওয়া নিষিদ্ধ করে দেবে। তখন তারা খাবে কী? ওই তো তাদের রোজগারের একমাত্র উপায়!

কিন্তু ওমর সে সব গ্রাহ্য না করে জার্মান সায়েবটির উদ্দেশ্যে বলল, কী সায়েব? তুমি কী বলছ, বলো। যাবে, না যাবে না?

হানস হাস বন্ধুর মত গোমড়ামুখো বদরসিক নয়। সে মিটিমিটি হাসছিল এতক্ষণ। বিল ফের ক্ষেপে গিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, সে

তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ছাখো ওমর, এখানে আসবার অনেক আগেই আমি তোমাদের সেই জাহাজভূতের কথা শুনেছি। আর, সত্যি বলতে কী, আমার আসার পিছনে এই একটিমাত্র কারণই রয়েছে। কাজেই তোমরা নিশ্চিত হতে পারো।

বিল কট্‌মট্ করে তাকাল বন্ধুর দিকে। তারপর বলল, কী সর্বনাশ! তুমি কি সত্যিই ওখানে যাবে নাকি?

হ্যাস একটু হেসে জবাব দিল, সেই জন্যেই তো আমি দু'জন সাহসী বোট-ম্যান আর একটা মোটর-বোট খুঁজছিলাম। এখন দেখছি, মেঘ না চাইতেই জল।

বিল আঁতকে উঠল। তোমার মাথা নির্ঘাত খারাপ হয়েছে হ্যাস। এ সাগর বড় বিপজ্জনক সাগর। বিশেষ করে সোয়াকিনের মাত্র ছ'মাইল দূরে যে এ্যাটল (প্রবালবলয়—সমুদ্রের মধ্যে গোল প্রবাল-পাঁচিল, তার মধ্যেটা হ্রদের মত) রয়েছে—সেখানে হচ্ছে হাঙরের রাজত্ব। হাঙর শিকারীদের বড় আড্ডা, তাই এই বন্দরটা। তুমি কি জীবনে কখনও হাঙর শিকার করেছ? হাঙরের পাল্লায় পড়লে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে ভেবেছ? নাঃ, জেনে-শুনে এত বড় বিপদের মুখে তোমায় ছেড়ে দিলে আমাদের ব্রিটিশ সরকারের অনেক বদনাম হবে।

হ্যাস বলল, আমি সরকারীভাবে লিখে দেব যে, আমার জীবনের জন্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দায়ী নন। তাহলেই হল তো?

বিল গুম হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, উঁহু। আমি তোমায় উমব্রিয়া-অভিযানের ছাড়পত্র দেব কেমন করে? সে নিয়ম এখন নেই।

হ্যাস একটু চটে গেল মনে মনে। বলল, ঠিক আছে, দিও না। আমিও নিয়ম ভাঙবার জন্যে জেদ ধরতে রাজী নই। তবে রেড-সীতে ডুব দিয়ে ঘুরে বেড়ানো তো তুমি আইনতঃ আটকাতে পারবে না! তাই না?

বিল জবাব দিল, সে তোমার খুশি। তবে আমাদের জল-পুলিসের

পাল্লায় পড়লে কী হবে, তার দায়িত্ব কিন্তু আমার নয়। ওদের কর্তা ম্যাকফারসন আবার ছঁদে শয়তান। চুক্তি করে মুক্তো তুলছে বলে বিপদে ফেলতে পারে, সাবধান।

হ্যাস হাসতে হাসতে বলল, তখন তোমার নাম করব। বলব, খোদ ম্যাজিস্ট্রেট আমার বন্ধু।

গোমড়ামুখো বিল এবার না হেসে পারল না।

ওমর বলল, তাহলে সায়েব, আমি বোট তৈরী রাখছি। কেমন? তুমি সেজেগুজে ঠিক চারটেয় হাজির হবে। ওই যে বালির পাহাড়ের পাশে পাথরের ঘরটা দেখা যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে একটা 'কাফে'। ওখানে গেলেই আমাদের পেয়ে যাবে।

ওমর, মাহমুদ একরকম নাচতে নাচতে চলে গেল। বিল চিন্তিত মুখে চুপচাপ বসে রইল ক্যাম্প-চেয়ারে। হ্যাস তাঁবুর কোণ থেকে ইতিমধ্যে একটা বাক্স টেনে এনেছে। উজ্জ্বল রোদে বাক্সটা খুলে একগুচ্ছের টুকিটাকি জিনিসপত্র বের করছিল সে। খালি গা, পরণে মাত্র একটি হাফপ্যাণ্ট—এত উৎকট গরম গায়ে পোষাক রাখা কঠিন। তার বলিষ্ঠ শরীর। মুখের দাড়িগুলো কেমন পাংশুটে দেখাচ্ছে। কিন্তু তার চেহারার মধ্যে সব মিলিয়ে জার্মান বা যে কোন সাদাচামড়ার মানুষের সঙ্গে কী যেন একটা তফাৎ সবার চোখে না পড়ে পারবে না। একদল সাদাচামড়ার মানুষের ভিতর হ্যাসকে সহজেই দূর থেকে চেনা যায়। তার শরীরের রঙ কেমন যেন ফ্যাকাসে—খড়িপড়া জিনিসের মত। এর কারণ আর কিছু নয়। বছরের অধিকাংশ সময় জলে ডুবে ঘুরে বেড়ানোর দরুণ শরীরের রঙটা ধুসর হয়ে গেছে। সে আসলে একজন 'জলমানুষ'।

যে জিনিষপত্রগুলো সে বের করছিল, তা নিয়েই সে সাগরের তলায় ডুব মারে। সবগুলোই যে দামী, তা নয়। শুনলে তোমাদের হাসি পাবে হয়তো—স্ক্রু-ড্রাইভার, রেঞ্জ, স্ক্রু থেকে শুরু করে এক টুকরো রবারও তার জলে ডোবার কাজে এত দরকারী! তবে জলের তলার ছবি তোলবার ক্যামেরাটা অবশ্য একমাত্র দামী জিনিস।

খুব ছেলেবেলা থেকে তাকে সমুদ্র আকর্ষণ করে আসছে। অজানা জলজগৎ আর তার গভীর রহস্য তাকে সারাজীবন পাগল করে রেখেছে। জার্মানীতে তো কোন সমুদ্র নেই। তাই সে সুযোগ পেলেই নানা দেশে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে যেখানে সমুদ্র আছে। সম্প্রতি ভূমধ্য-সাগরে ডুব দিয়ে জলের তলায় অনেক নতুন খবর জেনে সে একটা বই লিখছে। তার ধারণা, বইটা বেরোলে সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যাবে।

ভুরু কুঁচকে লাল সাগরের দিকে তাকাল হ্যাস। কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে রইল। গ্রীষ্মের দুপুরে লাল সাগরে এখন বড় বড় ঢেউ দুলছে। ঢেউয়ের মাথায় চাপচাপ ফেনা। দূর দিগন্তে সামান্য লালচে রঙ—সাগর শান্ত হলে ওই রঙ সবখানে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে। এখন মোটামুটি স্বাভাবিক নীল রঙের খেলা সাগরে। আকাশে শঙ্খচিল সমুদ্রশকুন বা সীগাল আর ক্বচিৎ দলছাড়া দূর সাগরের দু'একটা এ্যালবাট্রেস পাখি ওড়াউড়ি করছে। ডুবন্ত ভৌতিকজাহাজ 'উম-ব্রিয়া'কে খুঁজছিল হ্যাস। এখন খালিচোখে দেখা সম্ভব নয়। সে গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলারটা টেনে নিল। চোখে রাখল। ঢেউয়ের আড়ালে অস্পষ্ট কী যেন একটা খুঁটির মত ভেসে উঠছে মাঝে মাঝে। ওইটে কি ?

কী আছে সে রহস্যের পিছনে ? জানা যাবে তো সব ? নাকি সত্যি সত্যি ওখানে ভূত-প্রেতের হাতে পড়ে অসহায় ভাবে মারা যেতে হবে ?

ঠোঁটের কোণে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল হ্যাসের। ধুৎ! যত সব আজগুবি গল্প। অশিক্ষিত দেশ—বোকাসোকা অধিবাসীরা! কুসংস্কারে ভরতি তাদের মন। সব সময় ভূত-প্রেতের চিন্তায় অস্থির।

কিন্তু সায়েব ডুবুরীরা ? তারা তো অনেকেই সুশিক্ষিত সভ্যভব্য মানুষ ! আসার পথে একজন মার্কিন ডুবুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সে নাকি ওখানে গিয়েছিল একদিন। কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। তাছাড়া লোকটার সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন—হিংস্র বারাকুদা

মাছের পাল্লায় পড়ে এই দুরবস্থা! সে হ্যাসকে খুব ভয় দেখিয়েছে। নিষেধ করে বলেছে, খবরদার! ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে যেও না। একখানা লাঠির বিরুদ্ধে তুমি হয়তো সহজেই লড়াই জিততে পারো বা মাথা বাঁচাতে পারো। কিন্তু আস্ত একটা প্রকাণ্ড মাস্তুল যদি আক্রমণ করতে আসে, তখন কী করবে?

মাস্তুল! সে আবার কেমন আক্রমণ করবে? জ্যান্ত মাস্তুল নাকি?···লোকটা অবশ্য আর খুলে বলেনি।

হ্যাস উদ্বিগ্ন হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পরক্ষণেই ভাবল, অজানাকে জানবার জেদেই না সে সারা-জীবন জলের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা আছে বরাতে, এ রহস্যের ঝাঁপি সে খুলবেই। বাক্সর জিনিসপত্রগুলো কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। হ্যাস সেগুলো একটা চটের উপর বিছিয়ে রাখতে লাগল। বিল তখন ঝিমোচ্ছে।···

বিকেল চারটেয় সমুদ্র অনেকটা শান্ত হয়েছে। একটা লালচে ছটা দিগন্তজোড়া জলের ওপর পড়ে রয়েছে। কী অপূর্ব দৃশ্য এই রেড-সীর বুকে। না জানি তার ভিতরেও কত সৌন্দর্যের খেলা! রঙিন 'এ্যানজেল' মাছ পাখনা মেলে বেড়ায় ফার্ণ শ্যাওলার বনে। প্রবালের পাঁচিলে বসে বিশ্রাম করে পাখাওয়ালা পাখির মত শান্ত ভীতু 'টোড' মাছ। স্বর্ণবিন্দু বা 'গোল্ড ডট' মাছের ঝাঁক হয়তো জলপরীদের দেহে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম পাড়ায়। সে এক আলাদা জগৎ। আমাদের এই মাটির জগতের মতই সেখানে আছে পাহাড় অরণ্য নদী খাল-বিল আর নানা রকম প্রাণী। সে জগতে যে একবার পা দিয়েছে, তার আর এ জগতে ফিরে আসতে ইচ্ছেই করবে না।

কাঁধের ব্যাগে জিনিসপত্র যতটা দরকার ভরে নিয়ে হ্যাস এগোল। বিল ঘুমোচ্ছে। লাঞ্চ খাওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোক্। জাগিয়ে দিলে আবার কী বাগড়া না দিয়ে বসে! হ্যাস খুশিমনে পা বাড়াল। ছোট্ট বাজার একটা—পচা সুঁটকী মাছের গন্ধে বাতাস দুর্গন্ধময়। নাকে রুমাল ঢেকে সে সেই বালিয়াড়ীর কাছে কাফেতে পৌঁছল।

ওমর, মাহমুদ তৈরীই ছিল। তাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠল। এবার দস্তুরমত সমীহ করে 'আপনি' 'আজ্ঞে' শুরু করে দিল ওরা। ওমর লম্বা সেলাম দিয়ে বলল, আসুন। গোলামের (ভৃত্যের) নৌকা তৈরী।

ওরা যে ভাষায় কথা বলে তা আরবী ভাষার অপভ্রংশ। স্থানীয় নাম 'অজ্জু-অজ্জু'। হ্যাস এখানে আসবার আগে এ ভাষা মোটামুটি রপ্ত করে এসেছে। তাই ওদের সঙ্গে কথা বলতে বা ওদের কথা বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না।

ওরা তিনজনে সাগরের দিকে গেল। একটা খাঁড়ির মুখে ওদের ছোট্ট মোটর-বোটটা রয়েছে। হ্যাস প্রথমে বোটটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হল। নাঃ, বেশ মজবুত বোট। অকেজো মিলিটারী জিনিসপত্তর নীলামে অনেক সময় বিক্রি হয়। এটাও ছিল তাই। মেরামত করে নিয়েছে ওরা। ঝড়-বাতাসে এ সব বোট ভারি নিরাপদ।

হ্যাস বলল, ওমর! আজ কিন্তু 'উমব্রিয়ার' খুব কাছে আমরা যাব না। নিরাপদ এলাকায় বোটটা রেখে আমি জলে নামব। যদি কোন বিপদ হয়, তোমরা যা খুশি কোরো। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না, কেমন?

ওমর, মাহমুদ তো অবাক! বলে কী? এ যে দেখছি, ডানপিটেদের গুরু স্বয়ং। আচ্ছা, দেখা যাক্। তারা দুজনে হাঁ-হাঁ করে উঠল। ...তাই হয় নাকি? আমরা তো জাহাজভূতের কারসাজি ভাঙতেই আপনার সাহায্য চেয়েছি। আপনি একা বিপদের মজাটা লুটবেন আর আমরা পিঠটান দেব...বাঃ!

হ্যাস হেসে বলল, ঠিক আছে। বোট স্টার্ট দাও। সন্ধ্যার আগেই ফিরব কিন্তু।

মোটর-বোটটা সগর্জনে জল ভেঙে এগোতে থাকল। হ্যাসের চোখে বাইনোকুলার। হঠাৎ সে চমকে উঠল। দিগন্তের সেই কালো রেখা দুটো স্পষ্ট হয়েছে। ওটাই কি উমব্রিয়ার মাস্তুল? হ্যাসের বুকের ভিতর হাতুড়ী পড়তে থাকল যেন।

দু'মাইল গিয়ে হ্যাস চেঁচিয়ে উঠল, ব্যস! এখানেই বাঁধো।

বাঁধো বললেই তো বাঁধা যায় না। জল খুব গভীর হলে তো নয়ই। অভিজ্ঞ বোট-ম্যান দুজনেই আশেপাশে জল লক্ষ্য করছিল। জলের তলায় প্রবাল-পাঁচিল দরকার। সেখানে নোঙর আটকে রাখা যাবে। হ্যাস বলল, কী হল? আমাদের নীচেই তো প্রবাল-পাঁচিল। নোঙর ফেলো!

নোঙর গেড়ে ওমর চুরুট ধরাল। মাহমুদ উত্তেজিত। দাড়ি চুলকোচ্ছে ক্রমাগত। ওরা হাঁ করে দেখল, হ্যাস সায়েব ডুবুরীর পোষাক পরে কখন তৈরীই ছিল। আচমকা ধাঁই করে শূন্যে ডিগবাজী বা ড্রাইভ দিয়ে ঝপাং করে জলে পড়েছে। তারপর বজবজ করে বুজকুড়ি একরাশ। তারপর আর পাত্তা নেই। এরা উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছে তো আছেই।

॥ তিন ॥

মাস্তুলের অট্টহাসি

হ্যানস্ হ্যাস এর আগে অনেক অজানা সাগরের জলে ঝাঁপ দিয়েছে, —জলমানুষের মত ঘুরে বেড়িয়েছে তার তলায়। দেখেছে কত বিচিত্র উদ্ভিদ আর প্রাণী —হিংস্রতায় যাদের কাছে বাঘ-সিংহও তুচ্ছ। কতবার তাদের পাল্লায় পড়ে কোন রকমে প্রাণটা হাতে নিয়ে ফিরতে পেরেছে সে।

কিন্তু রেড-সী-র জলের তলায় পৌঁছানমাত্র কেন কে জানে, তার মন কী এক অজানা বিপদের ভয়ে কেঁপে উঠল। ডুবো পাহাড়ের চারদিকে ছড়ানো বড় বড় পাথরের চাঁই ঘিরে প্রবাল-কীট জমে রয়েছে দেখল সে। অদ্ভুত তাদের গড়ন। কোনটা প্রকাণ্ড ছাতার মতো, কোনটা বা ঝাকড়-মাকড় বটগাছের মতো, কোনটা দেখলে মনে হয়, আস্ত একটা দৈত্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের ওপর স্বচ্ছন্দে ঘুরে

বেড়াচ্ছে সুন্দর এ্যানজেল মাছগুলো। জলের নীচে এমনিতেই আলোর বড় অভাব। তবে প্রথমটা ঝাঁপ দেবার পর যে প্রচুর বুজকুড়ি উঠেছিল, সেগুলো উবে গেলে এবং জল থিতিয়ে গেলে দৃষ্টি অনেকখানি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এমন কি মাটির পৃথিবীতে এখন সকাল দুপুর না বিকেল, কিংবা রাত্রি, তাও অনুমান করা যায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ হ্যাসের মাথার ওপরকার জলে ঝিকমিক করছিল। ক্রমশ সে দেখল, ওই ঝিকিমিকিটুকু স্বচ্ছ জলের নীচে অনেক দূর অব্দি চমৎকার আলো ছড়াচ্ছে। এবার তার আর দেখতে অসুবিধে হল না। চারদিকে বিশ-ত্রিশ মিটার অব্দি পরিষ্কার নজর হচ্ছিল। ক্ষুদে রিড মাছের ঝাঁকটাকেও সে একটা ধূসর রঙের অদ্ভুত ফার্ণ গাছের ভিতর খেলা করতে দেখছিল। হ্যাস সামনে একটা টোয়াকোনার কাণ্ড দেখে না হেসে পারল না। এই টোয়াকোনা হচ্ছে একটা অদ্ভুত না-মাছ না-ব্যাঙ জাতীয় জীব। আফ্রিকার জঙ্গলে এক বামন-মানুষের জাত আছে, তাদের বলা হয় 'পিগমি'। টোয়াকোনা কতকটা তাদের মতোই দেখতে। দুটো পা ভর করে যখন কোন জলের তলার গাছের ডালে এরা ওঠবার চেষ্টা করে, অবিকল মনে হয়, যেন পিগমি গাছে চড়ছে। এরা হাঁ করলে বড় ভয়ঙ্কর লাগে দেখতে। কিন্তু আসলে এরা বড় নিরীহ জীব। তাদের চেয়ে বড় আকারের কোন জীবকে ধারে কাছে দেখলে প্রাণ ভয়ে পালাবার চেষ্টা করে, এবং সে দৃশ্য দেখলে সবচেয়ে গোমড়ামুখোরও না হেসে উপায় থাকে না।

টোয়াকোনাকে হ্যাস বলে 'জলবানর'। হ্যাসকে দেখামাত্র বেচারা লেজ তুলে পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওদিক থেকে একটা 'করাত' মাছের আবির্ভাব হল। লম্বা করাতের মত তার মুখ। বেচারা জলবানর তখন উবুড় হয়ে একটা পাঁচিল বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে থাকল। সেই সময় চারদিক থেকে তাকে খোঁচাখুঁচি শুরু করেছে এক ঝাঁক রিড মাছ। বেচারা তখন একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। হ্যাস কয়েক পা এগিয়ে তার হাতের লম্বা হারপুনটা দিয়ে করাত মাছটাকে তাড়িয়ে দিল। টোয়াকোনাটা সামনের জঙ্গলে পালিয়ে

বাঁচল। আর নির্ভিক ক্ষুদে রিড মাছের ঝাঁকটা হ্যাসের গায়ে পাখনা বোলাতে শুরু করল। খুব আরাম পাচ্ছিল হ্যাস, যদিও অন্য কারো পক্ষে গা সুড়সুড় করবার কথা।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। হ্যাসের ডুবুরী পোশাকটা একটু অন্য রকম। সচরাচর ডুবুরীরা আগাগোড়া এক ধরনের পোশাকে শরীর ঢেকে নিয়ে জলের তলায় যায়। কিন্তু হ্যাসের পোশাক বলতে একটা মুখোশ --মাথার পিছন থেকে মুখ অব্দি ঢাকা, সামনে কাচের মতোই এক বিশেষ স্বচ্ছ ও শক্ত চশমা। নাক-মুখ থেকে একটা নল কাঁধ ঘুরে পিঠে বাঁধা অক্সিজেন সিলিনডারে পৌঁছেছে। ওই দিয়ে জলের তলায় শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধে হয় না। এবং এই মুখোশটা ছাড়া হাত ও পায়ে হাঁসের পায়ের গড়ন একজোড়া রবারের দস্তানা ও একজোড়া জুতো। সাঁতার কাটবার জন্যে বা জলের নীচে এগোতে হলে এই দস্তানা ও জুতো খুবই জরুরী। ব্যস, এই হল তার ডুবুরী পোষাক। গা পুরো খোলা। পরনে একটা জাঙিয়া মাত্র।

জলের নীচে হাঁটা আর চাঁদে গিয়ে হাঁটা প্রায় একই রকম। ইচ্ছে মত পা ফেলা কঠিন। বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু অভ্যাসবশে হ্যাস এগোতে পারছিল স্বচ্ছন্দে। কখনও সে একটু ভেসে এগোচ্ছিল, কখনও পা ফেলে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তার মন কী অজ্ঞাত বিপদের ভয়ে কেঁপে উঠছিল। ডুবন্ত উম্‌ব্রিয়া জাহাজের প্রায় একশো মিটার দূরে সে ঝাঁপ দিয়েছে। কাজেই বেলা থাকতে থাকতে তাকে তাড়াতাড়ি যেতে এবং ফিরে আসতে হবে। তা না হলে সন্ধ্যার অন্ধকারে খুবই অসুবিধেয় পড়ে যাবে।

যত এগোচ্ছিল, তত অকারণ চমকে উঠছিল হ্যাস। তার মনে হচ্ছিল, একটা নিষিদ্ধ এলাকায় সে চলেছে যেন। প্রবাল-পাঁচিল ডিঙিয়ে এবং গাছপালার জঙ্গল এড়িয়ে একটা পরিষ্কার জায়গায় যখন সে পৌঁছল তার বুকটা ফের কেঁপে উঠল। আন্দাজ ত্রিশ মিটার দূরে কালো উঁচু পাঁচিল লক্ষ্য করল সে। দুর্গের মত কী একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন। ওটাই কি উম্‌ব্রিয়া?

পরক্ষণে মনে সাহস এল তার। কই, তেমন কিছু ঘটল না তো? এত কাছে এসে পড়েছে, অথচ জাহাজভূতটা দিব্যি চুপচাপ শান্ত খোকাটি হয়ে গেছে। ব্যাপার কী? নাকি মানুষ নামক আজব প্রাণীটাকে নিয়ে কিছু মজা করার মতলব? আর কোথায় বা গেল সেই সব হিংস্র বারাকুদার ঝাঁক? সেই হাঙরগুলোই বা কোথায়?

হারপুনটা শক্ত হাতে ধরে এগোতে থাকল হ্যাস। যত কাছাকাছি হচ্ছিল, তত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশটা লক্ষ্য করছিল সে। ক্রমশ দূরত্ব কমে গেল। পনের মিটার···বারো···দশ···পাঁচ···হঠাৎ চমকে উঠল হ্যাস।

কালো পাঁচিলের গায়ের ডোরাকাটা একটা অংশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ডাইনে। তার গায়ে হেলান দিয়ে কি ওটা দাঁড়িয়ে রয়েছে? প্রকাণ্ড চশমা দুটো মুছল হ্যাস। নাঃ, চোখের ভুল নয়। মুহূর্তে হ্যাসের রক্ত জমে যাবার উপক্রম হল। একটা কঙ্কাল! আর কঙ্কালটা নড়ছে—নড়তে-নড়তে একটু করে এগোচ্ছে যে!

অতি বড় সাহসী পুরুষ হ্যাস। ভূত-প্রেতে তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এ বড় অদ্ভুত পরিস্থিতি। জীবন্ত একটা কঙ্কালকে এগিয়ে আসতে দেখলে কারই-বা মাথার ঠিক থাকে। হ্যাস সাঁৎ করে ভেসে কিছুটা বাঁদিকে সরে গেল। তারপর হারপুনটা শক্ত হাতে ধরে কঙ্কালটার দিকে লক্ষ্য রাখল।

কঙ্কালটা থেমে গেছে হঠাৎ। মাটির ওপরে এ ঘটনা ঘটলে হ্যাস নির্দ্বিধায় হয়তো ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং রহস্যটার সমাধান করতে ব্যস্ত হ'ত। কিন্তু জলের নীচের জগৎ সম্পর্কে তো মানুষের ধারণা এখনও বড় কম। বিশেষ করে খুশিমত শরীরটাকে ঘোরানো যায় না বা আত্মরক্ষার জন্যে চোঁ-চোঁ দৌড়ে পালানোও কঠিন!

হ্যাস এবার জাহাজটার দিকে এগোল। হাত বাড়িয়ে ছুঁল তলার প্রকাণ্ড পাঁচিলটা। মরচে ধরে গেছে লোহার খোলে। শ্যাওলা আর প্রবাল-কীটও বিস্তর জমেছে। সে পাঁচিল বেয়ে ভেসে উঠতে থাকল। কতক্ষণ পরে পৌঁছে গেল ডেকের রেলিঙে। রেলিঙগুলো

এখনও বেশ শক্ত আছে। ঝকমক করছে এলুমিনিয়ম ও পেতলের আবরণ। কোথাও কোথাও শ্যাওলার চাপ আর ফার্ণ গজিয়েছে। ঝুলন্ত অর্কিডের মতো লালচে রঙের লতার ঝুমঝুনিও সে দেখতে পেল। অজস্র নানা জাতের মাছ খেলা করছিল। হ্যাসকে দেখামাত্র তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। হ্যাস এবার দ্বিতীয় চমক খেল। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে রয়েছে—হ্যাঁ, সেই কঙ্কালটাই যেন।

হ্যাস কী করবে ভাবছিল। এখানে আলো খুবই পরিষ্কার। সমুদ্রের ওপরের স্তর বলে রোদের ঝিকিমিকি মাথার ওপর দুলছে। কঙ্কালটা যে মানুষের তাতে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাস মরিয়া হয়ে হারপুন বাগিয়ে কঙ্কালটার দিকে এগোতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার বাঁদিকে জাহাজের বন্ধ কামরার দরজা গেল খুলে। তারপর যাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, সে ভূতপ্রেত হলে হয়তো বাঁচার ছিল! একটা প্রকাণ্ড হাঙর লেজের ঘায়ে কপাটটা নাড়া দিয়ে স্থির হয়েছে। জ্বলজ্বলে দুটো চোখে হ্যাসকে দেখছে।

চকিতে হ্যাস তার হারপুনের খোঁচা মারল চোখ লক্ষ্য করে। হাঙরটা পিছিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয়বার খোঁচা মারল হ্যাস। জল কালো হয়ে উঠল রক্তে। ফলে, স্পষ্টতাটুকু ঘুচে গেল। এক হাতে রেলিঙ ধরে হ্যাস তৃতীয় আঘাত হানতে তৈরী, কিন্তু হাঙরটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

কয়েক মুহূর্ত পরে যা ঘটল, তা অভাবনীয়। জলে রক্তের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একঝাঁক হিংস্র বারাকুদা মাছ এসে হাজির। হ্যাস অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখল, তার পিছনে-পাশে, কিছু দূরে বারাকুদাগুলো এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে! ধারাল দাঁতগুলো দেখে গা শিউরে উঠল হ্যাসের। সে টের পাচ্ছিল এই সামান্য অস্ত্রটা দিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব। বিশেষ করে, একটা প্রকাণ্ড মারাত্মক ভুল সে করে বসেছে। হাঙরটাকে কৌশলে এড়ানো তার উচিত ছিল। হাঙরের কেন, যে কোন প্রাণীর রক্ত জলের মধ্যে ঝরলেই বারাকুদারা মড়াখেকো শকুনের মত হাজির হয়। যেন মাথায়

টনক নড়ে। ভীষণ রক্ত-পাগল এরা। হাঙরটার রক্ত না ঝরলে এই বিপদটা ঘটত না। এখন পালানোও প্রায় অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এই ক্ষুধার্ত উত্তেজিত রক্তপায়ী রাক্ষসেরা।

হ্যাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দেখল, বারাকুদাগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে। আহত হাঙরটা সম্ভবত এদেরই ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। এদের না ডরায়, সমুদ্র-জগতে এমন কোন প্রাণী নেই। তবে হাঙরটারও রেহাই নেই। যত তার রক্ত ঝরবে, তত সেখানে যত বারাকুদা আছে, তারা আকৃষ্ট হবে এবং তাকে আক্রমণ করবে।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে কী একটা ঘটে গেল।

জাহাজটা যেন কেঁপে উঠল। জল আলোড়িত হতে থাকল। রেলিঙে ঝুঁকে থাকা কঙ্কালটাও যেন লাফ দিয়ে আরো নীচে কোথায় অদৃশ্য হল। তারপর সে এক অমানুষিক ভয়ঙ্কর একটা চাপা গুর-গুর গর্জন শোনা যেতে লাগল জলের নীচে। পরক্ষণে হ্যাস স্তম্ভিত হয়ে দেখল, বারাকুদাগুলো পালিয়ে যাচ্ছে। জাহাজটা ভীষণ নড়তে শুরু করেছে। হ্যাস যত তাড়াতাড়ি পারে, ওপরের দিকে ভেসে উঠল। এবং ভেসে ওঠার সময় তার মনে হল, জাহাজের মাস্তুলগুলো যেন সোজা হয়ে জাহাজের ওপর চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। ভোঁস করে জলের ওপর ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ গেল সামনের দিকে। হ্যাঁ, অস্তগামী সূর্যের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, উমব্রিয়ার মাস্তুলটা জলের ভিতর হেঁটে বেড়াচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার জন্যেও বটে এবং খালি চোখে স্পষ্ট দেখবার জন্যে হ্যাস একটানে মুখোশটাকে খুলে ফেলা মাত্র তার কানে এল এক অমানুষিক অট্টহাসির শব্দ। যেন হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে হাহা-হাহা করে হাসছে আর হাসছে। বেলা শেষের শান্ত সমুদ্রও গেছে হঠাৎ ক্ষেপে। ফেনিল তরঙ্গের পর তরঙ্গ ঝড়ের সমুদ্রের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, নাকে-মুখে জল ঢুকে যাচ্ছে হ্যাসের। সে মুখোশটা ফের পরে নিয়ে অনেক কষ্টে ভেসে থাকবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওমরদের বোটটা কোথায় গেল? কোথাও কোন বোট নেই, শুধু উচ্ছ্বসিত সমুদ্র।

॥ চার ॥

এরা আবার কারা ?

কোথাও কোন বোট নেই। যত দূর দেখা যায়, শুধু জল আর জল। জলের রঙ কালো হল কেন ? এ জলের রূপ ভয়ঙ্কর। যেন সাগরের গভীরে কোথাও বন্দী ছিল কত কালের এক দৈত্য। আজ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বাইরে আসবার চেষ্টা করছে।

হ্যাস অসহায় বোধ করছিল। ওমরদের হল কী ? বোটসুদ্ধ ডুবে মরে নি তো ওরা ? ওই ডুবন্ত জাহাজের অশুভ শক্তি ওদের কি সত্যি সত্যি ডুবিয়ে মারল ? এতটুকু চোখের ভুল নয়, সে স্পষ্ট দেখেছে সেই জ্যান্ত কঙ্কাল দুটো। তখন এতখানি ভয় পায়নি হ্যাস, এতক্ষণে ওমরদের দেখতে না পেয়ে ভীষণ ভয় পেল।

অতি কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে সে উমব্রিয়ার মাস্তুল দেখার চেষ্টা করল একবার। দেখল সেটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আগের মতো।

ওদিকে সূর্য ডুবে গেছে পশ্চিম দিগন্তে। জলের লাল রংটা দ্রুত ফিকে হয়ে পড়ছে। হ্যাস আন্দাজ করল, ওই দিকটা পশ্চিম—তাহলে তাকে ডাইনে এগিয়ে যেতে হবে, তবে সোয়াকিনের মাটি ছোঁবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু অতখানি পথ পাড়ি দেবার ক্ষমতা কি তার আছে ? ইতিমধ্যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। ভয়ে দুর্ভাবনায়-মন গেছে মুষড়ে। এদিকে সামনে এগিয়ে আসছে অন্ধকার রাত।

কোথাও কোন জাহাজও দেখা যাচ্ছে না, তার কারণ একটিই। এখানটা জাহাজ চলাচলের পক্ষে বড় বিপজ্জনক। তলায় ডুবো-পাহাড়ে ভরতি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল হ্যাসের। সোয়াকিনের ছ' মাইল দূরে—এখান থেকে উত্তর-পূর্বে এবং কাছাকাছি একটা প্রবাল-বলয় ছিল না ? কোথায় সেটা ?

ততক্ষণে সমুদ্র ক্রমশঃ শান্ত হয়ে এসেছে। বাতাসের গতি দক্ষিণে উপকূলের দিকে। কিন্তু সে গতি অতি মৃদু। একটু জিরোবার সুযোগ পেল সে। চিৎ সাঁতার দিতে থাকল। তারপর মুখোশটা খুলে উবুড় হয়ে ভাসল। প্রবাল-বলয়টা খুঁজল।

আশায় আনন্দে নেচে উঠল হ্যাস। ওই তো সেই গোলাকার প্রবাল পাঁচিল! ড্রীমল্যাণ্ড নামে সেই এ্যাটল। শরীরে জোর এল তার। এগিয়ে চলল সেই দিকে। কতক্ষণ পরে হঠাৎ তার মনে হল কে যেন মাউথ অরগ্যান বাজাচ্ছে। ব্যাপার কী? সে মাথা তুলে স্পষ্ট শোনবার চেষ্টা করল।

নাঃ, মাউথ অরগ্যান নয়। ভেঁপু বাজছে তীব্রস্বরে। ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো!

পরক্ষণে হ্যাস দেখল, প্রবাল-পাঁচিলের ওপর কে বা কারা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তারাই একটা প্রকাণ্ড বিউগল বাজাচ্ছে। বিউগলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, কারণ সেটা অবশিষ্ট দিনের ছটায় চকচক করছিল। ওরা যারাই হোক, বেশ আমুদে লোক তো! ওরা বিপন্ন হ্যাসকে দেখতে পাচ্ছে না?

অনেকটা কাছে গিয়ে হ্যাস একটা হাত তুলল। ইশারা করতে থাকল। ওদের চোখে পড়ছে কি না বোঝা গেল না। তখন সে প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠল—হেল্প্…হেল্প্! বাঁচাও, বাঁচাও!

সত্যি সত্যি হ্যাস ডুবে মরছে না, কিন্তু ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সে উচিত মনে করছিল।

এবার দেখা গেল, লোকগুলো ওকে দেখতে পেয়েছে। একজনের হাতে একটা ছোট্ট দূরবীন। সে অন্যদিকে কী যেন দেখছিল সেই দূরবীনে চোখ রেখে। এবার তার দিকে ঘুরল। তিনজন লোক। একজনের হাতে বিউগল, অন্যজন দূরবীনধারী, আরেক জনের হাতে একটা বন্দুক। কে ওরা? জলপুলিশের লোক? হ্যাস ঠাহর করে দেখল, না, ওরা জলপুলিশ হতেই পারে না। অমন বিদঘুটে পোশাক জলপুলিশ পরে না।

আন্দাজ তিনশো মিটার দূরত্ব। হ্যাস দেখল, এবার একজন পাঁচিলের ওপর থেকে ওদিকে অদৃশ্য হল। তারপরই দেখা গেল একটা মোটর-বোট তার দিকে এগিয়ে আসছে। বোটের লোকটার মাথায় লাল চুল দাড়ি আছে, থ্যাবড়া নাক, কেমন ভয় দেখানো চেহারা। একটা ধূসর জ্যাকেটের ওপর নীলচে ওয়েস্টকোট আর সেকেলে যোদ্ধাদের মত ব্রীচেস ধরনের আঁটো পাতলুন তার পরনে। কোমরে খাপখোলা একটা প্রকাণ্ড পিস্তল ঝুলছে।

বোটটা কাছে এসে স্থির হলে লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর পরিষ্কার ইংরাজীতে বলল, উঠে পড়ো।

হ্যাস উঠল। পা ছড়িয়ে হেলান দিল সে। কিছুক্ষণের জন্যে কোন কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে। চোখ বুজে বসে রইল সে।

কতক্ষণ পরে সে যখন চোখ খুলল, দেখল বোটটা প্রবাল-বলয়ের ভিতর ঢুকেছে। একটা খাড়ির গায়ে নোঙর করে লোকটা ওর সঙ্গীদের ডাকল।

তারপর তিনজনে ধরাধরি করে বোট থেকে হ্যাসকে তুলল।

নির্জীব হয়ে পড়ে রইল হ্যাস। তার দেহে যেন আর এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই।

লোকগুলো নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলাবলি করছিল। একটু পরে হ্যাস চোখ খুলল ফের। দূরবীনধারী লোকটার বিশাল দেহ। গায়ে মাত্র একটা হাতকাটা কালো গেঞ্জি। সে হাঁটু মুড়ে বসল হ্যাসের পাশে। তারপর বলল, আশা করি এখন সুস্থ হয়েছো।

হ্যাস একটু হাসল।

বিউগলধারী ব্র্যাণ্ডির বোতলের ছিপি খুলে বলল, নাও। দু'ঢোক খেয়ে তাজা হও তো খোকা। তারপর বল, কে তুমি, খামোকা জলেই বা মড়ার মত ভাসছিলে কেন?

দূরবীনধারী বলল, আরে, দেখছ না? লোকটা নির্ঘাত ডুবুরী।

বোটের লোকটি লাফিয়ে উঠল।......ডুবুরী? এখানটায় কী মণিমানিক্য তুলতে এসেছিলে শুনি?

পরস্পর তিনজন চোখাচোখি করল। ইশারায় কী যেন বলল ওরা। তারপর হঠাৎ দূরবীনধারী হ্যাসের একটা হাত শক্ত করে ধরে বলে উঠল, বাছাধনের তাহলে উমব্রিয়া অভিযানে যাওয়া হয়েছিল? এঁ্যা! কী দেখলে বল তো সোনা? সাত রাজার ধন—নাকি সেই বুড়ো কাপ্তেনের ভূতটা? বিকট হেসে উঠল সে।

হ্যাস ব্রাণ্ডি খেয়ে উঠে বসল। তারপর বলল, তোমরা কে?

পাল্টা প্রশ্ন করল দূরবীনধারী...তুমি কে তাই আগে শুনি?

—আমি হ্যানস হ্যাস...জার্মান ডুবুরী। ভূতটা সত্যি না মিথ্যে দেখতে গিয়েছিলাম!

ওরা হো-হো করে হেসে উঠল। বোটের লোকটা বিউগল-ওয়ালাকে বলল, এর সাহস তো কম নয় ডিক! কী বলল শুনছো? টম, আমার দারুণ সন্দেহ, কোন বিদেশী গভর্মেণ্টের এজেণ্ট এই ডুবুরীটাকে ভাড়া করে উমব্রিয়ার মালগুলো হাতাবার ফিকিরে আছে।

—হ্যারি, তুমি চুপ করো, আমি দেখছি, দূরবীনধারী বলল।

টম ডিক হ্যারি!...হ্যাস মনে মনে বলল।...এ তো ইংরেজদের সাধারণ চলতি নাম! (বাংলায় যেমন রাম, শ্যাম, যদু) নিশ্চয় এরা বোম্বেটে এবং এসব এদের ছদ্মনাম। যাইহোক, এরা কী করে দেখা যাক্।

টম বলল, তা ওহে ধেড়ে খোকা, কে পাঠিয়েছে তোমাকে? ইতালী গভর্মেণ্টের লোকেরা?

হ্যাস একটু হেসে বলল, তা কেন?

—কেন নয়? টম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল,—জাহাজটা তো ওদেরই। ইংরেজদের খতম করবার জন্যে এই জাহাজে এক অদ্ভুত মারণাস্ত্র

পাঠিয়েছিল ওরা। সেগুলো ঝাড়তে পারলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওই ব্যাটাদেরই জয়জয়কার পড়ে যেত। মাঝখান থেকে আমেরিকা জাপানের হিরোসিমায় এ্যাটম বোমা ফেলে দিয়ে কিস্তি মাত্ করে। বাছাধনরা তো জানে না যে ইতালীর জাহাজে এ্যাটম বোমার চেয়ে কী সাংঘাতিক চীজ লুকোন রয়েছে।

হ্যাস বলল, তাই নাকি ?

ডিক গর্জে উঠল, খবরদার! ন্যাকামি করো না। এখন বলো সেগুলো কী অবস্থায় আছে দেখে এলে ?

হ্যাস বলল, আমি শুধু দুটো কঙ্কালভূত দেখেছি!

হ্যারি দাড়ি চুলকে বলল, সেটা ঠিকই দেখেছো। বুড়ো কাপ্তেন বেনজেল্লো আর তার বদমাইশ সহকারী গিয়েসেপ্পো ডুবে মরে ভূত ছাড়া কি দেবদূত হবে নাকি ?

টম বলল, ভূত-টুত রাখো হে! শুধু জবাব দাও, উমব্রিয়ার ভিতর তুমি ঢুকতে পেরেছিলে ?

হ্যাস বলল, উঁহু।

কেন ?

সে বড় ভয়ঙ্কর কাণ্ড। জল কেঁপে উঠল। তারপর আস্ত মাস্তুল দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। কারা সব হাসতে লাগল। উঃ, মনে পড়লে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়!

ডিক বলল, নির্ঘাত ভয় দেখাচ্ছে আমাদের।

টম বলল, ছ্যাখো আমিও একজন পাকা ডুবুরী। আসল নাম বললে সোয়াকিনের তল্লাটে সবাই একবাক্যে বলবে, হ্যাঁ, এত জব্বর ডুবুরী দেখা যায় না। কিন্তু যতবারই উমব্রিয়ার কাছাকাছি গেছি, হাঙর আর বারাকুদোর ঝাঁক আমাকে তাড়া করেছে। তোমার কপাল ভালো বলতে হয় যে তুমি উমব্রিয়া ছুঁতে পেরেছিলে! এবার শোন একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। তোমাকে বেশ ভালো লোক বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া তুমি তো জার্মান। হিটলারের বেআক্কেলে বুদ্ধিতে তোমাদের জাতটার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ঈশ্বরের দিব্যি,

তোমরা, জার্মানরাও উমব্রিয়ার সেই সাংঘাতিক মারণাস্ত্রের একটা অংশ পাবে।

হ্যারি গম্ভীর মুখে বলল, ইংরেজ শতকরা সত্তর ভাগ, ত্রিশ ভাগ জার্মান।

টম বলল, তাই হবে। চলো, আজ রাতের অন্ধকারে আমরা উমব্রিয়ার মধ্যে তল্লাস চালাই। তুমি আর আমি জলে নামব। ওরা পাহারা দেবে।

হ্যাস মনে মনে বলল, আচ্ছা সব পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! তবে যা দেখা যাচ্ছে, সঙ্গী হিসেবে সম্ভবত এরা বেশ সাহসী। উমব্রিয়ার মারণাস্ত্র থাক বা না থাক, অন্তত যার জন্য সে এদিকে পাড়ি দিয়েছে, জাহাজভুতের রহস্য উদ্‌ঘাটন—সেটার একটা কিনারা করা যেতে পারে। কিন্তু ওমর-মেহমুদ গেল কোথায়?

সে বলল, ঠিক আছে, আমি রাজী। কিন্তু ছাখো, আমার দু'জন সঙ্গী একটা বোট নিয়ে ওখানে অপেক্ষা করছিল। ফিরে এসে তাদের আর দেখতে পাইনি। তাদের দেখেছো তোমরা?

হো-হো করে হেসে উঠল টম। আরে, তাই বলো! দূরবীনে আমি তাহলে ওই কাণ্ডটাই দেখছিলাম! জলপুলিশের কর্তা ম্যাকফারসন একটা বোটসুদ্ধ কাদের পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছিল।

হ্যাস উত্তেজিত স্বরে বলল, কখন? কোন্‌দিকে?

টম ঘড়ি দেখে বলল, তখন সাড়ে পাঁচটা হবে। ওরা সোয়াকিনের দিকে যাচ্ছিল! আমি ভাবলাম, বেআইনীভাবে কারা মুক্তার ঝিনুক তুলছিল তাই ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্বস্ত হল হ্যাস, যাক্‌, ওরা তাহলে বহাল তবিয়তেই আছে। পরে বিলকে বলে ওদের ছাড়িয়ে নেওয়া কঠিন হবে না।

টম বলল, তাহলে কী বলছ হে চাঁদ? কখন বেরোব আমরা?

হ্যাস বলল, খানিক জিরিয়ে নিতে দাও।

হ্যারি বলল, ওহে ডিক, আমাদের নতুন স্তাঙাৎকে কিছু খাইয়ে চাঙ্গা করা দরকার। যাও, খাবারের বোঁচকাটা নিয়ে এসো। ফ্লাস্ক

ভরতি কফিও আছে। হ্যালো নতুন স্যাঙাৎ, শরীর গরম করবে না? সে ব্যবস্থাও আছে। ভেবে-চিন্তে আমরা একগাদা শুকনো কাঠও এনেছি। জলে ডুবে শরীরখানার কী দশা হয়, সে কি আমরা জানিনে?

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। প্রবাল-পাঁচিলের চওড়া সমতল একটা ধাপের ওপর আগুন জ্বালাল ওরা। তারপর হ্যাসকে ডাকল। হ্যাস আগুনের সামনে গিয়ে বসল। সে ভাবছিল, এ একটা অভাবিত সুযোগ। মারণাস্ত্রের খোঁজ পাক বা না পাক, অন্তত জলের সেই মারাত্মক আলোড়ন, কঙ্কালভূত, চলন্ত মাস্তুল আব অট্টহাসির রহস্য কী একটুও জানা যাবে না? প্রথমবার হঠাৎ কিছু ঘটলে চোখ-কানের ভুল মানুষের হয়। ম্যাজিকওলারা তো ওই ভুলেরই সুযোগ নেয় দর্শকের কাছে। দ্বিতীয়বার অতখানি ভুল হয় না। আর এই লোকগুলো যাই হোক, সাহসী বলেই মনে হচ্ছে। দেখা যাক্।...

॥ পাঁচ ॥

মৃত্যুর বন

আকাশে নক্ষত্র ঝকমক করছে। লাল সাগরের জলে তার ছটা খেলছে ঝিকিমিকি। কাছে ও দূরে ফসফরাসও অল্প ঢেউয়ে চিকমিকিয়ে উঠছে। রাতের সমুদ্রে এ দৃশ্য বড় সুন্দর। লোনা জলে ফসফরাস থাকে। ঢেউ উঠলে রাত্রিবেলা তার ছটা দেখা যায়। ফসফরাস বাতাসের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে।

রাতের সমুদ্রেও ডুবুরীরা অনায়াসে জলের তলায় পাড়ি দিতে পারে। শুধু দরকার হয় একটা বাতি। তবে বিপদের ঝুঁকিও থাকে বেশি। জলের তলায় আলো বেশি দূর যায় না। কাজেই কোন মারাত্মক প্রাণী খুব কাছাকাছি না এসে পড়লে দেখা যায় না এবং আত্মরক্ষার ফুরসত পাওয়া যায় না।

দেখা গেল টম সত্যি একজন পাকা ডুবুরী। সে হ্যাসের পাশে পাশে এগিয়ে যাচ্ছিল, ওর হাতে একটা বাতি। জলের তলায় কাঁচে ঢাকা সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র এই বাতিগুলো জ্বলার কোনো অসুবিধা হয় না। হ্যাসের অস্ত্র বলতে এক ওই হারপুনটা। কিন্তু টমের হাতে বিচিত্র পিস্তল, যার গুলি জলের ভিতরও চলে।

হ্যাস বলে দিয়েছিল যে, খুব বেশি দরকার না হলে যেন কোন প্রাণীকে আহত না করা হয়। কারণ, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রক্তের গন্ধ পেয়ে হিংস্র বারাকুদা মাছের ঝাঁক এগিয়ে আসবে চারিদিক থেকে।

এবার কিন্তু কোন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটছিল না। এমন কি উমব্রিয়ার গায়ে হাত ছোঁয়ালেও কোন কঙ্কাল দেখা গেল না। উপরে সমুদ্রও আশ্চর্য শান্ত।

দুজনে ভেসে ওপরের ডেকে গিয়ে উঠল। রেলিঙ ডিঙিয়ে যাবার সময় ওরা দেখল বাঁদিকে একটা দরজা খুলে যাচ্ছে। তারপর বেরিয়ে এল একটা সাপ। সাপটা আলোর সামনে স্থির হয়ে ভাসছিল। নীল জ্বলজ্বলে চোখ তার। কালো জিভটা কাঁপছিল। হ্যাস হারপুনটা উঁচিয়ে তাড়া করলে সাপটা ফের ঘরে ঢুকে গেল।

জলের ভিতর কথা বলা যাবে না। তাহলে হ্যাস টমকে জানিয়ে দিত, এই সাপগুলো নির্বিষ এবং আলো দেখাতে অভ্যস্ত। এরা উপকূলের কাছাকাছি বাস করে সচরাচর। তাই সব সময় আলো দেখতে পায় এবং তার চোখ ধাঁধিয়ে যায় না।

ওরা সামনের ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল। একরাশ বুজকুড়ি উঠল। নানান জাতের মাছ ছোটাছুটি শুরু করল। কিন্তু আলোর ছটায় তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তারা ওদের গায়ে গা ঘষতে থাকল। ভিতরে তেমন কোন জিনিসই চোখে পড়ল না। কারা যেন সব তুলে নিয়ে গেছে কবে। শুধু ভাঙ্গাচোরা কাঠ ছাড়া আর কিছু নেই। আর আছে ঘন পাঁক, শ্যাওলা, ফার্ণ। ওরা ওপাশের দরজা ঠেলে এঞ্জিনরুমে নামবার সিঁড়ি পেলে সিঁড়ি বেয়ে প্রথমে নামল হ্যাস। তারপর টম।

এঞ্জিনরুমটা যেন আগাছায় ভরতি। পাঁক জমেছে। আলোয় ঘোলাটে জলে দৃষ্টি চলল না।

একটা ফোকর গলিয়ে ওরা আরো নীচে নামল। পা ঠেকল শক্ত কোন জিনিসে। হ্যাস হেঁট হয়ে হারপুনের সাহায্যে দেখল, ওটা একটা প্রকাণ্ড বাকসো। জোর চাপ দিতেই ডালাটা সহজে ভেঙে গেল।

ওগুলো কী?

হাতে তুলে নিল হ্যাস। শক্ত ইটের মতো। পরক্ষণে তার বুক ধড়াস করে উঠল। সোনার বাঁট নয়তো?

টম ততক্ষণে হাত বাড়িয়েছে। ওর মাথার ওপর বুজকুড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে, সে কিছু বলছে। হ্যাসের হাসি পেল, ওর চোখের দিকে তাকাল। কাঁচের ঠুলির ভিতর জুলজুলে লোভী চোখ দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হ্যাঁ, সোনাই বটে! এ যে কোন কুবেরের ভাণ্ডার!

টম বাকসোটা টানাটানি করছিল। সে ক্ষেপে গেছে যেন। এ সময় মাথার ঠিক রাখা দরকার। হঠাৎ হ্যাস দেখল, একটু দূরে কোণের দিকে—হ্যাঁ, এ বড় অদ্ভুত, একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে রয়েছে! একটু একটু দুলছে। টমের গায়ে খোঁচা দিল সে। টমও দেখল। পরক্ষণে টম গুলি ছুঁড়ে বসল। তারপরই শুরু হয়ে গেছে মারাত্মক কাণ্ড।

টম যেদিকে গুলি ছুঁড়েছিল, সেদিকটা হঠাৎ ঘন কালো হয়ে গেল। কংকালটাও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল সেই কালো পাঁচিলের আড়ালে। তারপর চাপা কি একটা গর্জন শোনা গেল—গর্জনটা কোন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুরও হতে পারে, আবার সমুদ্রের তলায় একসঙ্গে অনেকগুলো কামানের গোলাও হতে পারে। মাটির ওপর যেমন, তেমনি জলের ভিতরেও শব্দ চলাচল করে। তবে সে শব্দ অনেকটা চাপা। ডুবুরীর মুখোশের দুপাশে জলের তলার শব্দ শোনারও ব্যবস্থা আছে। তাই অভিজ্ঞ ডুবুরী হ্যাস ওই গর্জন

শোনামাত্র হতভম্ব হয়ে পড়েছিল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। টমও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার এক হাতে বাতিটার সঙ্গে তখনও সেই বাকসের একটা ইঁটের মতন চৌকো জিনিসটা রয়ে গেছে।

বাতির আলোয় দুজনেই অসহায় হয়ে চেয়ে দেখল সেই জ্যান্ত কালো পাঁচিলটা যেন ঘুরছে এবার। বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর থমকানো জলে স্রোত জেগে উঠল। আরো কয়েকটি সেকেণ্ডে সেই স্রোত বেড়ে গেল। স্থির হয়ে দাঁড়ানো আর সম্ভব হল না তাদের পক্ষে। স্রোতটা তাদের ঠেলে ওপরে তুলল। কেবিনটার ছাদে মাথা ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাস বুঝতে পারল, এখনই বেরিয়ে না পড়লে জলের চাপে তাদের হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাছাড়া, ওই কালো পাঁচিলটা এসে পৌঁছলেই আর বেরোবার পথও খুঁজে পাবে না।

সে টমের একটা হাত ধরে দরজার দিকে ভেসে গেল। টম গোঁয়ার। সে হয়তো আবার ওর অদ্ভুত জলবন্দুকটা থেকে আর এক ঝাঁক গুলি ছোড়ার মতলব করেছিল। কিন্তু কেবিনের ছাদে সেঁটে যাওয়ায় এবং হ্যাসের টানে তাকে অগত্যা সে ইচ্ছে বাদ দিতে হল।

কিন্তু কোথায় দরজা? যেখানটা দিয়ে এই ঘরে ঢুকেছিল, তা আসলে তো একটা ফোকর। কেউ বা কারা জাহাজের এঞ্জিনরুমের তলার কাঠ ভেঙে নিচের ঘরটায় ঢুকে থাকবে। হ্যাস মরীয়া হয়ে ফোকরটা খুঁজছিল।

এই সময় সে টের পেল, তার পিঠের সিলিণ্ডারে যেন অক্সিজেন কমে গেছে। সে শ্বাসকষ্ট অনুভব করল। যা অক্সিজেন ছিল, তাতে অন্তত তিনটে ঘণ্টা স্বচ্ছন্দে জলের তলায় কাটানো যেত। বড়জোর একঘণ্টাও তো কাটেনি, এরই মধ্যে অক্সিজেন কমে গেল কেন? তাহলে কি সিলিণ্ডার ফুটো হয়ে গেছে? তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো নির্ঘাৎ প্রাণে মারা পড়তে হবে। জল ঢুকলেই পিঠে বিস্ফোরণ ঘটবার আশঙ্কা আছে। তার ওপর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটা তো আছেই।

মরিয়া হয়ে উঠেছিল হ্যাস। সেই অন্ধকার জ্যান্ত পাঁচিলটা এখন তাদের নীচে ঘুরপাক খাচ্ছে। চাপা গর্জনের শব্দও সমানে শোনা যাচ্ছে। সেই সময় হ্যাসের মনে হল, তলার কালো রঙটা অজস্র বুজকুড়িতে ভরা। অবাক হল সে। কিন্তু পরক্ষণেই ফের ফোকরটা হাতড়াতে থাকল। এখন আর কিছু নয়, বেরিয়ে পড়ার রাস্তাটাই জরুরী। টমের কাছে বাতি আছে, কিন্তু সে বাতির মুখটা ধরে আছে নিচের দিকেই।

হ্যাঁ, পাওয়া গেছে ফোকরটা। ঘরের ভিতরকার জল যেন চাপ দিয়ে ওই ফোকর গলিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তাই সেখানে গিয়ে পড়ামাত্র বেরোবার অসুবিধে আর হল না। জলের টানে দুজনেই একে একে ছিটকে বেরিয়ে এল। এঞ্জিনরুমের দিকে টম এবার বাতি ফেলল। হ্যাস আশ্বস্ত হল কিছুটা। টম বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি। ওই তো সেই সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে দুজনে ওপরের ডেকে গেল। প্রথমে হ্যাস ভেসে উঠল। তারপর টম। বাতিটি সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়ে দিল সে। অনেকদূর থেকেও টহলদার জল পুলিশের চোখে পড়তে পারে।

অন্ধকার রাত। লোহিত সাগরের আবহাওয়া বেশ শান্ত। মাথার ওপর তারা ঝিকমিক করছে। মুখোশটা তক্ষুনি খুলে ফেলে হ্যাস প্রাণভরে পৃথিবীর বাতাস নিল। আঃ! আর একটু হলেই দম আটকে মারা পড়ে যেত।

টমের সিলিণ্ডার আলতোই আছে। সেও মুখোশটা খুলে সাঁতার দিচ্ছিল। হ্যাসের কাছে এসে সে বলল—ঠিক আছে খোকাবাবু?

এখন এই অতল সমুদ্রের জলে ভেসেও রসিকতা করতে পারে টম! হ্যাস চিত হয়ে ভেসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। কোন জবাব দিল না।

এবার টম বাতির সুইচ টিপে এদিকওদিক দোলাল একবার। এটা একটা সংকেত! একটু দূরে ডিকদের বোটটার চাপা গর্জন শোনা গেল। তারপর এসে পড়ল কাছে।

ওপর থেকে হ্যারি বলল—স্যাঙাতদের খবর ভালো?

টম জবাব দিল—নতুন স্যাঙাত ভড়কে গেছে হ্যারি। দেখছ না, খাবি খাচ্ছে মড়ার মতন। ওকে টেনে তোল শিগগির।

হ্যাসের আঁতে ঘা লাগল! বোটের কিনারায় ভর দিয়ে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। টম জল থেকে হাত বাড়িয়ে বলল—আগে এই জিনসটা হাতাও ব্রাদার। কিন্তু খবর্দার, ওই জার্মানটার হাতে দেবে না।

হ্যারি সেই ইঁটটা নিলে সাবধানে টম উঠে বসল বোটে। তারপর বলল—আগে একটা কড়া সিগ্রেট, তারপর কথাবার্তা।

হ্যারি একটা সিগ্রেট ধরিয়ে তার ঠোঁটে গুঁজে দিল। ডিক তখন বোটের ড্রাইভারের জায়গায় বসে চারদিকে লক্ষ্য রেখেছে। অনেক দূরের দিগন্তে সোয়াকিন বন্দরের আলোগুলো একবার ডুবে যাচ্ছে, একবার ভেসে উঠছে। হঠাৎ ডিক চেঁচিয়ে উঠল—ও কী? কী ও?

বাকি তিনজনে ঘুরে তাকাল। উমব্রিয়ার সেই মাস্তুলটার দুপাশে দুটো নীল বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে এবং জলে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণে আলো দুটোর চারপাশে আরো কয়েকটা ওইরকম ছোট ছোট শিখা দেখা গেল। সেই সঙ্গে এদের বোটের তল ফুঁসে উঠল। মনে হল, কী একটা ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক প্রাণী তলায় ভীষণ বেগে নড়াচড়া করছে।

অমনি টম রুদ্ধশ্বাসে বলল—আর একটুও নয়! শিগগির পালাও এখান থেকে ঝটপট!

বোটটার মুখ ঘুরে গেল! সেই প্রবাল দ্বীপ লক্ষ্য করে জোরে এগিয়ে চলল। হ্যাস উমব্রিয়ার দিকটায় তাকিয়ে ছিল। কেন ওইসব অদ্ভুত ব্যাপার ওখানে ঘটছে? ওই কংকাল দুটোর রহস্যই বা কী? আর, ওই চাপা গর্জন, জ্যান্ত কালো পাঁচিল, জলের ভয়াবহ তোলপাড়—এসবই বা কেন হচ্ছে? হ্যাস তীক্ষ্ণদৃষ্টে মাস্তুলের দুপাশের বড় ও ছোট নীল কাঁপাকাঁপা রড-লাইটের মতন উজ্জ্বল রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা সে কখনও ঘটতে

দেখেনি কোথাও। তার বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে গুলিয়ে যেতে থাকল।

মোটর-বোটটা প্রবাল-বলয় বা অ্যাটলের ফাড়ি দিয়ে সাবধানে এগিয়ে সরু প্রণালীটায় ঢুকল। তারপর ভিতরে ঠিক জায়গায় থামল। ভিতরটা শান্ত হ্রদের মতন—চারদিকে গোল পাঁচিলের মতন দ্বীপের পাহাড়।

একে একে সাবধানে উঠে গেল ওপরে। বোটটা সরু ফাড়িতে লুকানো রইল। সবার আগে এগোল হ্যারি। তার হাতে টর্চ। হ্যাস দেখল, আগের জায়গায় গেল না এরা। সোজা পুবদিক ঘুরে দক্ষিণ-পূব কোণায় ধাপকাটা পাথরের চাতাল বেয়ে নামতে থাকল। এবার হ্রদের প্রায় সমতলের কিছু উঁচু একটা জায়গা। দুধারে উঁচু পাথর। মধ্যে এক ফালি পথ চলে গেছে সুড়ঙ্গের মতন।

একটু ইতস্তত করছিল হ্যাস। পিছন ঘুরে হ্যারি বলল—চলে এসো স্যাঙাত। আমাদের নতুন ডেরা দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কে জানত এমন চমৎকার একটা গুহা ড্রিমল্যাণ্ডে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!

অন্তত পঞ্চাশ-ষাট মিটার ঘুরে ঘুরে যাবার পর গুহার দরজায় পৌঁছল ওরা। ভিতরে আলো পড়তেই হ্যাস সত্যি অবাক হয়ে গেল। ঠিক স্বাভাবিক গুহা নয় যেন—খুব সুন্দরভাবে দেয়াল ও ছাদ খোদাই করা রয়েছে। মেঝেয় চমৎকারভাবে রিড নামে এক ধরনের নরম নলখাগড়া জাতের জলজ গাছ (হোগলার মতন) বিছানো হয়েছে। তার ওপর কম্বল, বোঁচকাবুঁচকি, স্টোভ আর একটা হ্যাসাগও দেখা যাচ্ছে। তাহলে এরা দস্তুরমতো একটা অভিযানেই বেরিয়েছে। তৈরি হয়েই বেরিয়েছে। কয়েকটা ড্রাম আর কাঠের প্যাকিং বাকসোকে চেয়ার করে রেখেছে। টম আর হ্যারি এবার সেই ইঁটের মতো জিনিসটা হাতে নিয়ে আলোতে পরখ করতে বসল। ডিক হ্যাসাগ জ্বালাতে জ্বালতে বলল—কফি খেয়ে তারপর কথাবার্তা শুরু হবে।

সেই সময় হ্যারি চেঁচিয়ে উঠল—সোনা! এ যে সোনা! হিপ হিপ হুররে! যখের ধন পেয়ে গেছি আমরা।

সে কোমর দুলিয়ে নাচ জুড়ে দিল। টম একটা বিদঘুটে গানও ধরে ফেলল।

!! ছয় !!

নিশির ডাক

সে রাতে টম, ডিক, হ্যারি গুহার মধ্যে নাচগানের হুল্লোড় বইয়ে দিল। তিনজনে সরবৎও খেল নানা রকমের। হ্যাসকেও প্রথমে সাধাসাধি করল ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু হ্যাসের মেজাজ ভাল নেই। তার মাথায় কেবল ওই উমব্রিয়া রহস্য নিয়ে ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। ওদিকে বেচারা ওমর, মেহমুদ নিশ্চয় এখন ম্যাকফারসনের পাল্লায় পড়ে খুব কষ্ট পাচ্ছে, অথচ এখন হ্যাসের কিছু করার নেই।

রাত গভীর হলে খাওয়াদাওয়ায় বসল সবাই। একটা বাক্স-ভর্তি প্যাক করা খাবার এনেছে টমরা। সার্ডিন মাছের কাবাব, শূয়োরের হৃদ্‌পিণ্ড, আর কড়াইশুঁটির কারি, বড় বড় বান রুটি, আর তিন-চার রকমের জেলি। হ্যাস কমই খেল। ওরা তিনজনে নেচে-নেচে ক্ষিদে বাড়িয়ে ফেলেছিল হয়তো। যা খেল, দেখে তাক লেগে গেল হ্যাসের। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার একদফা কফি বানাল ডিক। কফি খেতে খেতে ওদের একটা পরামর্শ সভা বসল।

হ্যাসাগটা কেনায় একটা বাক্সে শোঁ-শোঁ করে জ্বলছে। গুহার দরজায় একটা মস্ত বড় পাথর আটকে দেওয়া হয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে। বাইরে বেরোলে সমুদ্রের নোনা আবহাওয়ায় কিছুটা ঠাণ্ডাভাব টের পাওয়া যাবে। বিশেষ করে এসব অঞ্চলে গ্রীষ্মের সময় দিনে যত গরম, রাতে তত ঠাণ্ডা পড়ে। কিন্তু গুহার ভেতরে বেশ ওম জমেছে। আরামে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে টম শুরু করল—খোকাবাবুরা! তাহলে কথা হচ্ছে, আমরা যেখানে এখন পাকাপাকিভাবে আড্ডা গেড়েছি, এর নাম আশা করি তোমরা বুড়ো নাবিকদের কাছে শুনে থাকবে। এ সেই ষোল শতকের পর্তুগীজ জল-ডাকাত বা বোম্বেটেদের আবিষ্কৃত কুখ্যাত গুহা। বুড়ো

নাবিকরা বংশ-পরম্পরা এই আশ্চর্য গুহার গল্প বলে আসছে। কিন্তু কেউ জানে না লোহিত সাগরের কোন্ প্রবালদ্বীপে সেটা রয়েছে। এর নাম 'পাইরেটস-কেভ'—জল-ডাকাতদের গুহা। এখানে তিনশো বছর আগে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা সমুদ্রে বাণিজ্য-জাহাজ লুঠ করে এনে সব ধনরত্ন লুকিয়ে রাখত। কিন্তু সেগুলো যে নির্ঘাত কেউ বা কারা কবে হাতিয়েছে, তা আমরা বুঝতে পেরেছি। কারণ, আমরা ক'দিন আগে ·কটা মাথা গোঁজার আস্তানা খুঁজতে খুঁজতে যখন দৈবাৎ এর খোঁজ পেলুম, তখনই মেঝে খুঁড়ে এফোঁড় ওফোঁড় করেছিলুম। দেয়াল-কোনা তাক খাঁজগুলো কোথাও তল্লাসী চালাতে বাকি রাখিনি। কিন্তু আমাদের পোড়া কপাল, একটুকরো ঝুটো মণিমুক্তোও জোটেনি। তখন অগত্যা আবার সব ঠিকঠাক করে নিয়েছি। এখন আমার বক্তব্য হল—'পাইরেটস কেভ' নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই, উমব্রিয়া জাহাজটাই আমাদের লক্ষ্য। এই যে সোনার ইঁটটা আজ আমি আর আমাদের নতুন খোকা উমব্রিয়া থেকে হাতিয়ে এনেছি, সেটাই বড় প্রমাণ যে এক সিন্দুকভর্তি সোনার ইঁট ছাড়াও উমব্রিয়াতে আরো অজ্ঞাত ধনরত্ন আছে। কিন্তু তা হাতাতে হলে মারাত্মক ভূতুড়ে কাণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে। আমি ভূত বিশ্বাস করি না। আমাদের নতুন খোকাও করে না। অতএব···

বাধা দিয়ে হ্যারি বলল—বেশ তো! তোমরা দু'জনেই উমব্রিয়া থেকে কিছু কিছু করে মাল নিয়ে আসবে। আমার আর ডিকের কোন আপত্তি নাই। কী বলো হে ডিক?

ডিক সায় দিয়ে বলল—মোটেই না। আমরা দু'জন বোটে চাপিয়ে তোমাদের পৌঁছে দেব। বন্দুক বাগিয়ে পাহাড়া দেব। আর শয়তান ম্যাকফারসনের চেলাদের দেখলেই মাথা ফুটো করব। তারপর···

কথা কেড়ে হ্যারি বলল—তারপর তোমাদের নিয়ে ফিরে আসব। ব্যস!

ডিক বলল—শুধু তোমাদের নিয়ে নয়, সোনার ইঁট নিয়ে।

হ্যারি মাথা দুলিয়ে বলল—আলবাৎ, আলবাৎ।

ডিক আড়মোড়া ছেড়ে বলল—তাহলে ওঠ স্যাঙাতরা। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। বলে, সত্যিসত্যি ঝোঁকের মাথায় সে উঠে দাঁড়িয়ে শার্টের ওপর একটা ভায়েলস্কিনের হাতকাটা চড়াতে থাকল।

টম এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার হঠাৎ বেমক্কা গর্জে বলল—এ্যাই ডিক! এসব পাগলামির সময় এখন নয়। চুপচাপ বসে শোন যা বলছি।

ডিক এমনি কেঁচোর মতন গুটিয়ে বসে পড়ল। বোঝা গেল টমই দলপতি এবং ওকে ডিক আর হ্যারি প্রচণ্ড ভয় পায়। হ্যারিও হাত-পা ছড়িয়ে একটা চুরুট বের করে ধরাল। চোখ বুজে টান দিতে থাকল চুরুটটায়। কড়া ঝাঁঝাল গন্ধে গুহা ভরে গেল। এই সময় হ্যাস হাই তুলে বলল—হুঁ, যা বলার শিগগির বলে ফেল ভাই টম। ভীষণ ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে আমার।

টম লোকটা বড্ড নোংরা দেখা গেল। সে সামনের দেয়ালের দিকে থুথু ছুঁড়ে মারল। তারপর বলল—কথাটা যেজন্য বলতে শুরু করেছিলুম, সবাই মন দিয়ে শোন। উমব্রিয়া জাহাজের কেবিনে আপাতত আমরা একসিন্দুক সোনার ইঁটের খোঁজ পেয়েছি। কিন্তু ওই ইঁট নিয়ে আনার বিপদও খুব তুচ্ছ করার মতন নয়। জানি না, এবার ফের হানা দিলে আবার কী সাংঘাতিক বিপদের মুখোমুখি আমাদের পড়তে হবে। মুসকিল হচ্ছে কী, সেই বিপদের মোকাবিলা করব কীভাবে সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না।

ডিক ঘোঁত ঘোঁত করে বলল—বিপদটা কিসের? শুধু তো নীল আলো।

টম তেড়ে গেল—তখন বললুম—কীসব? এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

হ্যারি বলল—ওর মাথায় গোবর পোরা। শোন, আমি বলে দিচ্ছি, বিপদ হচ্ছে সেই একই, যা আমরা এ্যাদ্দিন ধরে এলাকার জেলে আর নাবিকদের কাছে শুনে আসছি। অর্থাৎ কিনা জ্যান্ত মাস্তুল, জ্যান্ত কঙ্কাল, ক্ষুধার্ত হাঙর, আর বারাকুদা মাছ এবং

জলের প্রচণ্ড তোলপাড়।

টম সায় দিয়ে বলল—ঠিক, ঠিক। হ্যারিটার স্মরণশক্তি খুব তেজী। তা বন্ধুগণ, এইসব বিতিকিচ্ছিরি বিপদের মধ্যে থেকে আমি আর এই নতুন খোকাটি সোনার ইট নিয়ে আসব। আমাদের দু'জনের প্রত্যেকের বখরা তাহলে তোমাদের দু'জনের ডবল হওয়া উচিত। কী বলো নতুন খোকা?

হ্যাসের এসব বকবকানি একটুও ভাল লাগছিল না। তার ঘুম পাচ্ছিল। সে মাথাটা নেড়ে শুধু সায় দিল।

ডিক কুতকুতে চোখে দলপতির দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল—বেশ। তারপর···

টম হ্যারিকে বলল—হ্যারি, তোমার কথাটা বলো তাহলে।

হ্যারি আঙুল গুণে কী হিসেব করে বলল—তার মানে আমরা দু'জন যদি একটা করে দুটো সোনার ইট পাই, তুমি একা পাবে চারটে আর ওই জার্মান স্যাঙাতটাও পাবে চারটে। এই তো?

টম গম্ভীরমুখে বলল—হ্যাঁ।

ডিক বলল—তাহলে দশটা ইটের আটটা তোমাদের আর দুটো আমাদের।

টম আবার বলল—হ্যাঁ।

তখন ডিক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ওতে আমি রাজি নই। আমার বোট আমি নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি। আসবার সময় তো এসব কথা হয়নি ভাই টম।

হ্যারিও উঠল। বলল—আমিও তাতে রাজি নই। ভাই টম, ওই ডুবুরির জিনিসপত্র সব আমি নগদ টাকা দিয়ে তোমাকে কিনে দিয়েছিলুম। এবার ফেরত দাও। লক্ষ্মীছেলের মতন আমিও ডিকের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাই।

হ্যাস চোখ বুজে সব শুনছিল। এবার চোখ দুটো একটু ফাঁক করতেই সে দেখল, টম চোখ টিপে কী একটা ইশারা করছে দু'জনকে। ইশারাটা লক্ষ্য করে ডিক আর হ্যারি ফের বসে পড়ল। অমনি

হ্যাসের মনে একটা দারুণ সন্দেহ হল। এরা নিশ্চয় ভেবেছে, হ্যাসও তাদের মতন নিছক ধনরত্নের লোভে উমব্রিয়ায় হানা দিতে এসেছে। অতএব সোনাদানার ভাগ সে ছাড়বে না এবং ভাগ নেওয়ার পর তাকে ওরা হয়তো মেরে ফেলবে। টম চোখ ইশারা করে ওদের যেন একথাটাই বলল।

হ্যাস একটু হেসে চোখ খুলল। তারপর বলল—কী হল? সব চুপচাপ যে?

হ্যারি বলল—চুপচাপ থাকব না তো কি করব? বখরার হিসেবটা শুনলে তো হে নতুন স্যাঙাত! এতে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় না।

ডিক বলল—আলবৎ!

টম কী বলতে যাচ্ছিল, হ্যাস বলল—দেখ ভাই, তোমরা সবাই একটা মস্ত ভুল করছ। আজ বিকেলে তোমরা যখন আমাকে জল থেকে উদ্ধার করলে, তখনও বলেছি, এখনও বলছি, উমব্রিয়ার সোনাদানার প্রতি আমার একটুও লোভ নেই। আমি এসেছি শুধু উমব্রিয়ার রহস্য ফাঁস করতে। ওই কঙ্কাল দুটোই-বা অমন করে ঘুরে বেড়ায় কেন, মাস্তুলের জলের ওপর নাচানাচির কারণ কী, ওই কালো রঙের তোলপাড় করা স্রোতটা কোত্থেকে আসে, আর অমন গর্জনই বা কিসের—এগুলো জানা ছাড়া আর আমার কোন উদ্দেশ্যই নেই। কাজেই তোমরা আশ্বস্ত হয়ে ঘুমোও। আমার ভাগের ইঁট আমি ডিক আর হ্যারিকেই দেব। তাহলে হবে তো?

ডিক আর হ্যারি খুশি হয়ে বলল—খুব ভাল বখরা। হিপ হিপ হুররে।

টম হিসেব করে বলল—তাহলে আমি একা চারটে ইঁট, আর ডিক ও হ্যারি তিনটে করে ইঁট। তা মন্দ কী! ঠিক আছে, এবার তাহলে হ্যাসাগটা নিভিয়ে শুয়ে পড়া যাক। রাত দেখছি দুটো পনের হয়ে গেল। আজকের মতো ঘুমিয়ে পড়ি। কাল আবার দেখা যাবে, কখন হানা দেওয়ার সুবিধে হয়।

ওরা ঝটপট চামড়ার বিছানায় শুয়ে পড়ল। হ্যাসাগটাও নিভিয়ে দিল। হ্যাসকে একটা অয়েলপেপার দেওয়া হয়েছিল। সে তাই বিছিয়ে শুলো। গুহার ভিতর ঘন অন্ধকারে ভরে গেল।

হ্যাস এই লোক তিনটের কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়েছে। এরা বিশেষ লেখাপড়া জানে বলে মনে হয় না। তাই খুব একটা ঘোরপ্যাঁচ জানে না। খানিকটা সরলতা আছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে এদের সেজন্যেই বিশ্বাস করা কঠিন। ঝোঁকের বশে এরা মানুষ খুন করতে একটুও ইতঃস্তত করবে না। খুব সাবধানে এদের মন বুঝে তাকে চলতে হবে।

বিশেষ করে টমকে সাহসী বেপরোয়া মানুষ হিসেবে তার ভালই লেগেছে। এমন একজন গোঁয়ার লোক সঙ্গে থাকলে উমব্রিয়ার সব রহস্য ফাঁস করা খানিকটা সহজ হতে পারে। টম জ্যান্ত কংকাল দেখেও ভয় পায় নি। হ্যাঁ, টমকে তার চাই। আগামীকাল সকালে যদি আবহাওয়া ভাল থাকে এবং জল-পুলিশের বোট না দেখা যায় তাহলে আবার হানা দিতে যাবে উমব্রিয়ায়।···

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল হ্যাস। হঠাৎ কী একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। গুহার ভিতর আঁশটে গন্ধ বরাবর টের পেয়েছিল সে। এখন মনে হল, গন্ধটা খুব বেড়ে গেছে। আর কী ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, দম আটকে আসে যেন। একবার বাইরে বেরোতে পারলে যেন স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া যেত। সে হাতের ঘড়িতে রেডিয়াম দেওয়া কাঁটাদুটো দেখল। মাত্র একঘণ্টা ঘুমিয়েছে তাহলে। এখন রাত সওয়া তিনটে। ভোঁস ভোঁস ঘড় ঘড় করে তিনটে নাক ডাকছে। কিন্তু শব্দটা কিসের সে বুঝতে পারল না। তাহলে কী স্বপ্নের ব্যাপার ?

সে ফের ঘুমোবার চেষ্টা করল। আর তখনই মনে হল, গুহার দরজার দিকে একটা চাপা খসখস শব্দ হচ্ছে। তারপরই বেশ জোরে ওদিকে বাইরে কোথাও একটা ভারি পাথর পড়ল যেন। হ্যাঁ, জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তখন এই রকম শব্দেরই রেশ শুনেছিল। পাথর

পড়েই থামেনি, একটু গড়িয়ে গেল যেন। তারপর ফের চুপচাপ। খসখস শব্দটাও আর নেই।

হ্যাসের খুব অশ্বস্তি হচ্ছিল। গুহার দরজার বাইরে যে কেউ বা কিছু এসেছে এবং আটকে দেওয়া প্রকাণ্ড ভারি পাথরটা টানাটানি করতে গিয়েই কোথাও আলগা একটা পাথর পড়েছে, এতে কোন ভুল নেই। যে এসেছে, তাকে শত্রু ছাড়া বন্ধু ভাবার কোন কারণ নেই।

সাবধানে নিঃশব্দে হ্যাস উঠল। তারপর টমের গায়ে হাত রেখে একটু ঠেলল, কিন্তু কোন সাড়া নেই। আরও খানিকটা ঠেলাঠেলি করেও নাকডাকা বন্ধ হল না টমের। ব্যাটা শরবতের নেশায় কাহিল হয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে সন্দেহ নেই। এখন কানের কাছে ঢাক বাজলেও ঘুম ভাঙবে বলে মনে হয় না।

তখন ডিকের কাছে গেল সে। ডিকের অবস্থাও তাই। একেবারে মড়ার মতন হয়ে ঘুমোচ্ছে সে।

হ্যাস অন্ধকারে হাতড়ে তার ওপাশে হ্যারির কাছে গেল। এবার ওর মাথার কাছে একটা টর্চ পেল সে। টর্চটা সাবধানে মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে জ্বেলে দেখল, ব্যাটারি টাটকা আছে। হ্যারিকেও ওঠানো গেল না। তিনজনের অবস্থা একেবারে সমান। অত অস্বস্তির মধ্যেও হ্যাসের হাসি পেল। এই ঘুম নিয়ে ব্যাটারা এসেছে সোনাদানা হাতাতে।

আস্তে আস্তে টমের কাছে এসে সে তার মাথার কাছে হাতড়ে বেঢপ সেই পিস্তলটা নিল। এটা জলের তলায় গুলিছোঁড়ার পিস্তলটা নয়। হ্যাস পরীক্ষা করে দেখল, এ পিস্তলটা অটোমেটিক। গুলিও ভরা আছে পাঁচটা। তখন সে ওটা বাঁ-হাতে নিয়ে ডান-হাতে টর্চটা ধরে নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল। টর্চ জ্বললে পাছে সেই নিশীথরাতের আগন্তুক পালিয়ে যায়, তাই জ্বালল না।

দরজার মাথায় ফাঁক রয়েছে। সেখানে আকাশের নক্ষত্রজ্বলা একটুখানি চোখে পড়ছে। দরজাটা মাত্র সাড়ে পাঁচফুট উঁচু। কাজেই হ্যাসের ওর ফোকরে চোখ রাখতে অসুবিধে হল না। বাইরে

কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুধারে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গের মতন পথ আর উঁচু পাথরের দেয়াল, ওপরে ছাদ নেই এই যা। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর দৃষ্টি স্বচ্ছ হল।

সেই সময় হ্যাস দেখল, কী একটা উঁচু প্রকাণ্ড মানুষের মতন মূর্তি আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গপথটার বাঁকের দিকে চলে গেল।

এখন সমস্যা এই দরজার পাথরটা সরানো। তখন চারজনে টানা-টানি করে আটকেছে। এখন একা ওটা সরানো নিশ্চয় অসম্ভব হবে তার পক্ষে। তবু হ্যাস একটা দিক ধরে ঠেলে ফাঁক করার চেষ্টা করল।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর একটু ফাঁক হল। তার মধ্যে দিয়ে অতি-কষ্টে সেঁদেল চোরদের কৌশল বেরিয়ে গেল। বাইরের বাতাসে দম নিতে পেরে তার বুকে জোর এসে গেল তক্ষুনি। সে সুড়ঙ্গপথের একধারে দেয়াল ঘেঁষে পা টিপেটিপে এগোল। প্রথম বাঁকটা অব্দি গিয়ে সামনে তাকাল। এখন অন্ধকারেও তার দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না। দ্বিতীয় বাঁক অব্দি পুরো পথটা একেবারে ফাঁকা। সেই মূর্তিটা নেই। হ্যাস দ্বিতীয় বাঁকে হাজির হল।

এইভাবে অবশেষে প্রবাল-হ্রদের ধারে গিয়ে পড়ল। কিন্তু সেই বিকট প্রাণীটির কোন পাত্তা পেল না। সে পাথরের খাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকল এবার কী করা উচিত? একটা মানুষের মতন প্রাণীর মূর্তি সে দেখেছে, তাতে কোন ভুল নেই। এত ছোট্ট একটা প্রবাল-হ্রদের চারদিক গোলাকার পাঁচিলের মতন এ্যাটল বা বলয়-দ্বীপে, সে মানুষ হোক আর কোন অদ্ভুত প্রাণী হোক, কিছুতেই হারিয়ে যেতে পারে না।

হ্যাস মরীয়া হয়ে উঠল। হাতে জোরালো টর্চ আর এমন চমৎকার পিস্তল থাকতে তার আত্মরক্ষা করা তেমন কোন সমস্যা নয়।

হঠাৎ হ্যাসের চোখ গেল উত্তর-পূর্ব কোণে উঁচু পাথরের পাঁচিলের দিকে। কী একটা যেন সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাস টের পেত না, যদি লোকটা আকাশের সঙ্গে না মিশে থাকত। কারণ, তার

নড়াচড়ায় আকাশের তারা ঢাকা পড়ছিল মাঝে মাঝে। এতদূর থেকে টর্চের আলো ফেলা ঠিক মনে করল না সে। চুপিচুপি ঢালু পাড় বেয়ে পাথরের পাঁচিলের দিকে উঠতে থাকল।

হ্রদের ধার থেকে শক্ত মাটি আর পাথরের ছোটছোট টিলা উঁচু হয়ে রয়েছে। তার ওপাশে নিচে সমুদ্র। এই গোলাকার দ্বীপটা একেবারে ন্যাড়া। গাছ কেন, এক চিলতে ঘাসও গজায় না এখানে। তাই চোখের দৃষ্টি অনেকটা দূর অব্দি চলে।

মূর্তিটা এদিকে পিছু ফিরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে যেন। পা টিপে টিপে তার আন্দাজ পনের মিটার দূরে গিয়েই টর্চের বোতাম টিপল হ্যাস। জোরালো আলো গিয়ে পড়ল মূর্তিটার গায়ে।

অমনি মূর্তিটা ঘুরল।

আলোয় তাকে দেখাব সঙ্গে সঙ্গে হ্যাস এমন হতচকিত আর আতঙ্কে কাঠ হয়ে পড়েছিল যে কয়েক মুহূর্ত তার যেন একটুও সম্বিৎ ছিল না। ও কি মানুষ?

মূর্তিটার কাঁধের ওপর থেকে ছেঁড়া কিছু ন্যাকড়ার মতন কী ঝুলছে, বাকিটা সবই উলঙ্গ। সারা গায়ে ঝাঁকড়া লোম। চোখদুটো হিংস্র, নীল, জ্বলজ্বলে। বড় বড় এলোমেলো চুল রয়েছে মাথায়। তার হাতদুটো অস্বাভাবিক লম্বা। একটা হাতে অন্তত দশ-পনের কিলো ওজনের একটা পাথর রয়েছে।

প্রথমে পাথরটা হ্যাসের দিকে ছুঁড়ে মারল সে। হ্যাসের বরাত জোর, সেটা ডানপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। টর্চ এসময় নিভে গেল।

ফের টর্চ জ্বেলে পিস্তল তাক করে সে দেখল, মূর্তিটা নেই। একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এদিক ওদিক আলো ফেলেও আর তাকে দেখতে পেল না সে। তখন তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। এমন বিভীষিকার সঙ্গে জীবনে কোথাও তার পরিচয় হয়নি।

হ্যাস আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। যে পথে উঠেছিল, আছাড় খেতে খেতে কোনরকমে নেমে এল। তারপর সুড়ঙ্গ পথে এসে দৌড়তে শুরু করল।

পাথরের দরজার সেই ফাঁকটা দিয়ে সে ঢুকতেই এবার টমের ঘুম-জড়ানো গলায় সাড়া পেল—কে রে? কে রে? কে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে? তিনবার গোনার মধ্যে জবাব না দিলে গুলি ছুঁড়ব। এ্যাঁ! আমার পিস্তল কে নিল? এ্যাই হ্যারি! ডিক! নতুন স্যাঙাত আমার পিস্তল চুরি করে ভেগেছে! ওঠ্ ওঠ্ তোরা! হ্যারি, আলো জ্বালতো!

হ্যারি জড়ানো গলায় বলল—টর্চটা খুঁজে পাচ্ছি না!

ডিকও উঠে পড়ল। চেঁচামেচি করে বলল—কে ঢুকছে রে? মার, মার! মেরে শেষ করে দে ব্যাটাকে! আগে ওর ঠ্যাঙটা ধরে ফেল হে বড় খোকা, দেখবে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

হ্যাস তিন মাতালের কাণ্ড দেখে বোকা বনে গিয়েছিল। এবার টর্চ জ্বেলে ধমক দিয়ে বলল—চুপ, সব চুপ! শোন, সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেল এদিকে, আর তোমরা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ!

টম এবার ধীরে-সুস্থে একটা হাই তুলে বলল—ও, তুমি! কী হয়েছে?

হ্যারি দেশলাই জ্বেলে সিগ্রেট ধরাল। ডিক ফের শুয়ে পড়ে কাত হল। তারপর বলল—আলো নেভাও হে স্যাঙাত। ঘুমের সময় কী জ্বালাতন করো ভালো লাগে না!

হ্যাস টর্চটা নিভিয়ে টমের পাশে গেল। চাপা গলায় বলল—ড্রিমল্যাণ্ডে আমরা ছাড়াও আরো কে একজন আছে। সে মানুষ না কী জানি না। একটু আগে সে দরজার পাথর সরাচ্ছিল। তখন তোমাদের টর্চ আর পিস্তল নিয়ে তাকে তাড়া করলুম।

টম চমকে উঠে বলল—কী বললে? মানুষ না কী!

—হ্যাঁ। মানুষের অমন ভয়ঙ্কর চেহারা হতে পারে না।

—তা বটে! তারপর কী হল বলে যাও!

—সে আমার দিকে পাথর ছুঁড়েছিল।

—তোমার গায়ে নিশ্চয় লাগেনি?

—না লাগেনি।

টম খুব গম্ভীর হয়ে বলল—ওহে স্যাঙাতরা, তাহলে ড্রিমল্যাণ্ডে নিশিতে এসে যার ডাক শুনেছিলুম, তা দেখছি সত্যি! নতুন খোকাকে নিশিতেই ডেকেছিল।

ডিক বিছানা থেকে একটুখানি গা তুলে বলল—নিশি! মানে সেই উমব্রিয়ার ক্যাপটেন, বেনজেল্লোর ভূতটা তো? ছেড়ে দাও। বেনজেল্লোর ভূতকে তো আজ অব্দি কারো ঘাড় মটকাতে শুনিনি! তবে মাঝিমাল্লা বা জেলেরা বিপদে পড়ে আশ্রয় নিলে নাকি শুধু দেখাটা দেয়।

টম বলল—দরজাটা ভালো করে আটকে দেওয়া যাক্। ড্রিমল্যাণ্ড তাজ্জব জায়গা।

॥ সাত ॥

ভূত, না গুহামানুষ?

তখন সকাল আটটা। কেরোসিন স্টোভ জ্বেলে ডিক ও হ্যারি ব্রেকফাস্ট আর কফির জোগাড় করতে ব্যস্ত রয়েছে। টম তার দূর-বীনটা নিয়ে বেরোল। হ্যাসকেও ডাকল সে—এস হে স্যাঙাত, ঝট-পট একবার পশ্চিম দরিয়ায় উমব্রিয়ার তল্লাটটা দেখে আসি। শয়তান ম্যাকফারসানের দল আনাচে-কানাচে না থাকলে এ বেলা আবার হানা দেব।

হ্যাসও তার সঙ্গে বের হল। সুড়ঙ্গপথটা পেরিয়ে গিয়ে হ্রদের বাঁদিকের পাড়ে উঠল টম। তখন হ্যাস বলল—ভাই টম, তুমি ওখানে গিয়ে বসো, আমি একবার এদিকটা তল্লাস করে আসি।

টম চোখ পাকিয়ে বলল—ওদিকে কী আছে শুনি?

—ক্যাপটেন বেনজেল্লোর ভূতটা আমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। দেখে আসি, পাথরটা সত্যিকার পাথর, নাকি ওটাও ভূত! বলে,

হ্যাস নিজের রসিকতায় হেসে উঠল।

টম আমুদে মানুষ। সেও হো-হো করে হাসল বটে, কিন্তু পরক্ষণে চোখ নাচিয়ে হুঁশিয়ারি দিল—কিন্তু খবর্দার খোকা, এখানে আমাদের আতিথ্য থেকে কেটে পড়বার মতলব করো না। পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। যদি বা অব্যর্থসন্ধানী ডিকের গুলির হাত থেকে দৈবাৎ মাথাটা বাঁচাও, সমুদ্রের হাঙর আর বারাকুদার ঝাঁক তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

হ্যাস ভুরু কুঁচকে বলল—আমি কি তোমাদের হাতে কয়েদী নাকি ?

টম জবাব দিল—তোমাকে আমরা সহজে ছাড়তে চাই না। তুমি একজন পাকা ডুবুরি যে ! দলে আমি ছাড়া আর ডুবুরি নেই। কাজেই তোমাকে আমাদের খুব দরকার হবে।

হ্যাস একটু রেগে গেল। বলল—আমাকে গায়ের জোরে আটকে রাখতে পারবে ভেবো না টম। আমার বোট এসে গেলে কিন্তু আমি তোমাদের দল ছেড়ে চলে যাব।

টম রাগল না মোটেও। হেসে বলল—সে আশা আর কোরো না, চাঁদ। জল-পুলিশের কর্তাটিকে তুমি চেনো না। তোমার বোট এতক্ষণ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আমাদের কমন্সসভায় দরবার করতে পারলে ফেরত পেতে পারো, তার আগে নয়। তবে কমন্সসভার লর্ডরা সবাই জার্মানদের ওপর রেগে আছেন। আর যদি ভাবো দরিয়া সাঁতরে পালাবে, চেষ্টা করে দেখ। তুমি জার্মান কিনা, সখের ডুবুরি হয়েছো, কিন্তু সমুদ্রের খবর বিশেষ রাখো না। তোমাদের দেশে সমুদ্রই তো নেই। আর আমরা ইংরেজ, বাস করি দ্বীপে।

টম বকবক করে সমানে নিজেদের বড়াই শুরু করল। হ্যাস আর দাঁড়াল না ওর কাছে। উল্টোদিকে অর্থাৎ উত্তর-পূর্বে খাড়াইয়ের দিকে এগোল। টম হাসতে হাসতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের প্রণালীটার দিকে চলল।

হ্যাস ভাবল, টম হয়তো ভুল বলেনি। ড্রিমল্যাণ্ড থেকে সাঁতার কেটে চলে যাবার বিপদ আছে। প্রচণ্ড হাঙর আর হিংস্র বারাকুদা মাছ ছাড়াও এইসব দরিয়ায় বিষাক্ত সাপের সংখ্যা বড় কম নয়।

রাতের সেই জায়গাটা কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারল না সে। মুসকিল হচ্ছে, দ্বীপটায় কোন উদ্ভিদ নেই—পুরো ন্যাড়া। তাই সব জায়গাই একই রকম লাগছে। সে বড় বড় পাথর আর প্রবাল-কীটের তৈরি শক্ত সব পাঁচিল ও চাঙড় পেরিয়ে অনেকটা এগোল। এবার টের পেল, এই দ্বীপে যা সে মাটি বলে মনে করছে, তা মোটেই মাটি নয়। প্রবাল-কীটের দেহ জমে এরকম হয়েছে। তাই এখনও কোন ঘাস বা উদ্ভিদ গজাচ্ছে না। তবে দূর ভবিষ্যতে প্রকৃতির নিয়মে এই দ্বীপের অনেকটাই মাটি হয়ে উঠতে পারে—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সেটাই খুব স্বাভাবিক হবে এবং তখন প্রাণের জন্ম সম্ভব হবে।

একেবারে পূবের শেষপ্রান্তে উঁচু জায়গাটায় উঠে সে দেখল, নিচে খাড়া হয়ে নেমেছে পাহাড়টা এবং সমুদ্রের জল সশব্দে আছড়ে পড়ছে। এদিকটায় সমুদ্র বেশ চঞ্চল মনে হচ্ছিল। আর একটা ব্যাপার, এই দ্বীপে কোন গাছপালা বা উদ্ভিদের চিহ্ন নেই, কিন্তু পাখি আছে। ছোট ছোট পাহাড় আর পাঁচিলের গড়নে তৈরী শুকনো খটখটে জায়গায় অজস্র পাখির গর্ত। এসব পাখিরা সবাই সমুদ্রচর। অজস্র সীগাল বা সমুদ্র-শকুন চুপচাপ এখানে ওখানে মাছ বা মরা সামুদ্রিক জন্তু ভেসে ওঠার আশায় বসে রয়েছে। শঙ্খচিলগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে নিচের খাড়ির জলে ছোঁ দিচ্ছে এবং উড়ে বেড়াচ্ছে। এ্যালবাট্রসও দেখা গেল অনেক। এইসব পাখির চিৎকারে তুমুল হট্টগোল হচ্ছে এদিকটায়।

হ্যাস সাবধানে পা ফেলে উত্তর বরাবর এগোল। কিছুটা যাওয়ার পর সে দেখল, সমুদ্রের একটা ফালি মতো লম্বাটে অংশ দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, যেন কোন আদিম যুগে সমুদ্র একবার জিভ বাড়িয়ে দ্বীপটাকে চাটতে শুরু করেছিল, এখনও তাই করে যাচ্ছে।

নিচটা দেখতে বাধা পাচ্ছিল সে—একটা বড় পাথরের চাতাল ছাদের মতন ঝুঁকে রয়েছে। প্রবাল-কীটগুলো কোন্ যুগে এইসব ডুবো পাথরের গায়েই ঝাঁক বেঁধে ছিল এবং দ্বীপটা গড়ে ওঠার পর সেই পাথরগুলো উঁচুতে উঠে আসার কারণ হয়তো ভূমিকম্প কিংবা ভূগর্ভের লুকানো কোন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ।

পাথরের চাতালটায় লাফিয়ে পড়ে সে উপুড় হয়ে শুলো, তারপর নিচে তাকাল। না শুলে পড়ে যাবার চান্স ছিল।

লম্বাটে খাড়িটা বেশি চওড়া নয়, কিন্তু গভীর মনে হল। জল সেখানে শান্ত। পরক্ষণে হ্যাস চমকে উঠল। পূবের সূর্য সোজাসুজি রোদ ছড়াচ্ছে খাড়িতে। তাই দুধারের ছোট্ট নুড়িগুলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এমন কি নুড়ির তলায় কোন পোকাও নজরে পড়ছে। হ্যাস হতভম্ব হয়ে দেখল, রাতের সেই বিকট মূর্তিটাই বটে, একটা পাথর ছুঁড়ে মারল জলে। তারপর হুড়মুড় করে নেমে গেল।

এবার তার হাতে বেশ বড় একটা মাছ দেখতে পেল হ্যাস। মাছটা হাতে নিয়েই সে ঘুরল। তখন হ্যাসের বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। কী জ্বলজ্বলে নীল ওর চোখদুটো! প্রাণীটা মানুষের মতো, অথচ কিছুতেই মানুষ নয়। হ্যাস দ্বিতীয়বার চমকে উঠল। তবে কি এই দ্বীপে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বনমানুষ এখনও টিঁকে রয়েছে? তা যদি হয়, তাহলে তো এক আশ্চর্য আবিষ্কারের গৌরব সে পাবে!

কিন্তু সভ্যজগতের নাকের ডগায় এমন একটা বলয়দ্বীপে প্রাগৈতিহাসিক বানর-মানুষ বা বনমানুষ থাকা কেমন করে সম্ভব হল?

সে অবাক হয়ে এসব ভাবতে ভাবতে প্রাণীটাকে দেখছে, সেই সময় আচমকা প্রাণীটা মুখ তুলে ওপরে তাকাল। তারপর কয়েকটি লাফ মেরে নিচের দিকে কোথায় অদৃশ্য হল।

হ্যাসের সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। হারপুনটাও 'পাইরেটস্ কেভে' ফেলে এসেছে। সে গত সন্ধ্যা থেকে শুধু জাঙিয়া পরে খালি গায়েই কাটাচ্ছে, কারণ ওমরদের বোট থেকে ওই অবস্থাতেই জলে নেমে ছিল। গুহায় ওরা তাকে একটা পাতলুন দিতে চেয়েছিল, হ্যাস

পরে নি। লোকগুলো বড্ড নোংরা। আর পাতলুনটাতেও বিচ্ছিরি গন্ধ।

সে একবার ভাবল, বনমানুষটার খোঁজে নিচে নামবে। পরে ভাবল, বরং ডিকহ্যারিদের ডেকে নিয়ে আসাই নিরাপদ হবে।

সেই সময় তার মাথার ওপর দিয়ে নিচ থেকে এসে একটা পাথর শাঁ-শাঁ করে চলে গেল এবং কিছুটা পিছনে গিয়ে পড়ল। তারপর আবার একটা পাথর এল। হ্যাস বিপদে পড়ে গেল। বনমানুষটা তাকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করেছে। ওই পাথর এসে লাগলে মৃত্যু অনিবার্য।

হ্যাস বুকে হেঁটে খাঁজের আড়ালে পিছিয়ে আসতে থাকল। কিন্তু একের পর এক পাথর পড়ার বিরাম নেই। বোঝা যাচ্ছে, ওই বন-মানুষটার দেহে প্রচণ্ড শক্তি আছে। খুব সহজেই দশ-পনের কিলো ওজনের পাথর সে একশো ফুট উঁচুতে ছুঁড়ে মারতে পারছে।

একটু পরে পাথর ছোঁড়া বন্ধ হল। তখন হ্যাস সাবধানে যে-পথে উঠে এসেছিল, সেই পথেই নামতে শুরু করল। খুব তাড়াতাড়ি নামছিল সে। এর ফলে হ্রদের কিনারায় খাড়া হয়ে ওঠা একটা দেয়াল থেকে পা ফস্কে সে একেবারে তিরিশ ফুট নিচে হ্রদের জলে পড়ল।

তৈরি ছিল না বলে পিঠে জলের ঝাপটানিটা জোর লাগাল। তবে সে ডুবুরি এবং একজন সত্যিকার জল-মানুষ। ওতে তার কিছু ক্ষতি হবার নয়। সাঁতার কেটে তরতর করে এগিয়ে চলল নিচু পাড়ের দিকে।

পাড়ে ওঠার সময় হঠাৎ দেখল, তার সামনে একটা হাত এগিয়ে আসছে। চমকে উঠেছিল, কিন্তু হাতটা তখনই চিনল সে, উল্কি আঁকা হাতটা টমেরই। টম উপুড় হয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। তার দু'চোখে মিটমিটি হাসি। বললে—চলে এস খোকাবাবু। মনে হচ্ছে, বেজায় ভয় পেয়ে জলে মরণঝাঁপ দিয়েছিলে, তাই না?

টমকে এই মুহূর্তে খুব ভাল লেগে গেল হ্যাসের। ওর হাতটা ধরে

ফেলল সে।

ওপরে ওঠার পর টম তাকে বলল—কী স্যাঙাত। আবার ক্যাপটেন বেনজেল্লোর ভূত দেখে ভড়কে গিয়েছিলে নাকি?

হ্যাস ওর কৌতুকে হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল—দেখ টম, ভূত কিনা জানি না, তবে একটা বিকট প্রাণী সত্যি দেখেছি। গত রাত্রে ওটাই এসে আমাদের গুহার পাথর সরাতে চেষ্টা করছিল। এইমাত্র সেটাকে দেখতে পেলুম, উত্তর-পূর্ব কোণের খাড়িতে পাথর ছুঁড়ে মাছ মারল। তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে পাথর ছুঁড়তে শুরু করল।

টম এখন নেশা করে নি। অবাক হয়ে বলল—বল কি! তাহলে তো সবাই মিলে দ্বীপটা চষে ফেলতে হয়। আচ্ছা ভায়া, কী রকম প্রাণী? ক'টা ঠ্যাং, ক'টা হাত, কিসের মতো দেখতে?

—মানুষের মতো, কিন্তু মানুষ যে নয় তা হলফ করে বলতে পারি।

—হুম্! আমাদের কাছে অস্ত্র বলতে এখন তিনটে। এক নম্বর হচ্ছে জলবন্দুকটা, দু'নম্বর আমার এই পাঁচঘরা অটোমেটিক পিস্তল, তিন নম্বর হ্যারির একটা দূরপাল্লার গুলিছোঁড়ার রাইফেল। ঠিক আছে। চলো তো, ওদের সঙ্গে পরামর্শ করা যাক। দাড়িওয়ালা হ্যারিটার মাথা এসব ব্যাপারে খুব খুলবে বলে মনে হচ্ছে। ও স্কুলে তিন বছর পড়েছিল কিনা!

দু'জনে কথা বলতে বলতে গুহায় ফিরল। দেখল, ডিক আর হ্যারি ব্রেকফাস্টের জন্য ওদের অপেক্ষা করছে। এদের দেখে হ্যারি ধমক দিয়ে বলল—অতক্ষণ ধরে কফির জল চড়ানো থাকলে জলের স্টক ফুরিয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। দু'পিপে জলের মধ্যে এখন মাত্র দেড়পিপে আছে।

ডিক বলল—ফুরোক না। বোট নিয়ে চলে যাব সটান সোয়াকিন বন্দরে। মিঠে জলের কুয়োর মালিক আমার শ্বাশুড়ীর দূরসম্পর্কের মাসতুতো দাদার ভাইয়ের নাতি। ভেবো না।

টম বসে বলল—ইয়াকি ছাড়ো এখন। ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আমরা কনফারেন্সে বসবো। ব্যাপার খুব জটিল হয়ে উঠেছে।

হ্যারি কৌতূহলী হয়ে বলল—কী হয়েছে আবার? সুদান সরকার ডুবুরির দল পাঠিয়েছে নাকি? তাহলে ড্রিমল্যাণ্ডের পাঁচিল থেকে রাইফেলের গুলিতে ব্যাটাদের মুণ্ডু ফুটো করে দিতে হয়।

টম ধমকাল—চুপ করো তো। শোন ডিক, কফি তৈরী করতে করতে শুনে যাও। আমাদের নতুন খোকা আবার ভূত কিংবা কী একটা প্রাণীর পাল্লায় পড়েছিল। আমরা সেটা খুঁজতে বেরুব। কারণ, সেটাকে শেষ না করলে এখানে থাকাই দায় হবে। গত রাতে সে দরজার পাথর সরাচ্ছিল। সরাতে পারলে ঘুমন্ত অবস্থায় সব্বাইকে মেরে রেখে যেত। এদিকে আমাদের এখন কতদিন থাকতে হবে কিচ্ছু ঠিক নেই। সাধারণ আতঙ্ক নিয়ে বাস করা যায় নাকি?

হ্যারি বলল—প্রাণীটা কেমন?

টম বলল—মলোচ্ছাই! আমি দেখেছি নাকি? দেখেছে আমাদের স্যাঙাত।

কোণা থেকে ডিক বলল—জার্মানরা বড্ড মিছে কথা বলে।

হ্যাস রেগে গিয়ে বলল—দলপতি টম, ওকে নিষেধ করে দাও যেন জাত তুলে কথা না বলে।

হ্যারি দাড়ি চুলকে বলল—হ্যাঁ, ডিকের এটা অন্যায়। তা, ওহে খোকা, প্রাণীটা আদিমযুগের মনে হল নাকি?

হ্যাস জবাব দিল—হ্যাঁ। কিন্তু দেখতে মানুষের মতো।

—তাহলে গুহামানুষ বলো।

—তাও হতে পারে।

টম দুটো ডিম পরপর কোঁৎ করে গিলে ফেলে বলল—ঝট্‌পট্ সবাই তৈরী হও। হ্যাস ভায়া, তোমাকে বরং ডিক তার মাছমারা বল্লমটা দিক।

ডিক বলল—হ্যাঁ, জার্মানদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী নই আমি। আদিম অস্ত্র ওদের হাতে থাকলে বিশ্বযুদ্ধের বিপদ

থেকে বাঁচার চান্স আছে।

টম তেড়ে গেল—আবার জাত তুলছিস? হ্যারি, এই মড়াখেকো শকুনটা বঁড়শিতে গেঁথে, মা মেরীর দিব্যি, আমি তিমি মারতে যাব।

ডিকের কোন রাগের লক্ষণ দেখা গেল না। সে কফির পেয়ালাটা হ্যাসের দিকে এগিয়ে বলল—নাও হে, বেজাত স্যাঙাত। এ হচ্ছে ইংরিজি কফি। দেখো, কাপড়ে-চোপড়ে করে ফেলো না।

রাগ করে থাকা যায় না এই আমুদে লোকগুলোর ওপর, হ্যাস তা প্রথম থেকেই টের পেয়েছে। সে এবার হাসতে হাসতে কফির পাত্রটা নিল। বলল—আমিও মা মেরীর দিব্যি করছি, ডিককে একবার জার্মান কফি খাওয়াব।

ডিক বলল—খেতে রাজি আছি। তবে আগে তোমাকে পোশাক পরে সভ্য হতে হবে। ছ্যা-ছ্যা, একজন ইংরেজ হলে কক্ষনো ওই রবারের লেংটি পরে ভদ্রলোকের বৈঠকে বসে থাকত? টম, ওকে এক্ষুনি পোশাক পরতে বলো তো। তাকাতে লজ্জা হচ্ছে আমার।

টম বলল—তাই তো! হ্যারি, তোমার সেই পাতলুনটা কই?

হ্যারি বলল—এই তো, বালিশ করে ঘুমিয়েছি। রাতে পরতে চাইল না তো কী করব?

টম চোখ পাকিয়ে বলল—ভাই হ্যাস, এবার যদি পাতলুনটা না পরো, আমরা জোর করে পরাব কিন্তু। ডিক ঠিকই বলেছে। বিশেষ করে গুহামানুষের সামনে ওরকম ন্যাংটো হয়ে যাওয়া আমার বিবেচনায় মোটেও উচিত হবে না। কী ভাববে গুহামানুষটা? বলবে এই হাজার হাজার বছর ধরে সভ্য মানুষ তাহলে করলটা কী? ছ্যা-ছ্যা, ওরা দেখছি আমাদের মতো ন্যাংটো হয়ে থাকে। বলবে না, হ্যারি?

হ্যারি সায় দিল—একশো বার বলবে।

অগত্যা কফি খাওয়ার পর সেই নীল পাতলুনটা পরল হ্যাস। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওরা তৈরি হয়েছে। টম বেরোবার মুখে পইপই করে

বলে দিল—খবর্দার, কেউ প্রাণে মারবে না ওটাকে। বড় জোর পায়ে গুলি ছুঁড়ে কাবু করবে। তবে সেও নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে নয়। আমরা চেষ্টা করব, ওটাকে গায়ের জোরে ধরে ফেলতে। তারপর এই দড়িদড়া দিয়ে বাঁধব।

বাকি পথ ওরা চুপচাপ চলল। হ্যাস আগে-আগে যাচ্ছিল। সেই খাড়ির ওপর পৌঁছে ওরা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিচের দিকটা খুঁজতে থাকল, কিন্তু কিচ্ছু দেখা গেল না। তখন হ্যাস ওদের নিচে নামতে ইসারা করল।

সাবধানে পরস্পরকে ধরে একের পর এক নামতে থাকল ওরা। ধাপের মতো চাঙড় থাকায় নামতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না। খাড়ির ধারে কয়েক মিটার সমতল জায়গা পাওয়া গেল। সেখানেই সেই বনমানুষটা তখন দাঁড়িয়েছিল। জায়গাটা চাতাল মতো। সামনে জল, ওদের ডাইনে-বাঁয়ে পা রাখার মতো জায়গা নেই।

ডাইনে-পুবে একস্থানে একটা পাথর জল থেকে মাথা তুলে আছে। হ্যাস খাড়া দেয়াল ধরে সেই পাথরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর এদের ওইভাবে আসতে ইসারা করল। সামনে আবার ধাপ দেখা গেল। ধাপ বেয়ে কখনও ওপরে, কখনও নিচে চলতে চলতে ওরা পুবের সীমানায় পৌঁছাল। সমুদ্র থেকে অনেক বড়বড় পাথর কিনারা অব্দি মাথা উঁচু করে আছে। হঠাৎ হ্যাস এদের লুকিয়ে পড়তে ইসারা করল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ল।

তারপর তিনজনেই অবাক হয়ে দেখল, হ্যাঁ, বনমানুষ বা গুহা-মানুষ ছাড়া প্রাণীটা আর কিছু নয়। হাত পনের দূরে বুকে হেঁটে ঢালু একটা চাতাল বেয়ে উঠছে। তার ওভাবে বেড়ালের মতো এগোবার কারণ একটু পরেই বোঝা গেল। কয়েকটা সীগাল চুপচাপ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। গুহামানুষটা একটা সীগাল ধরবে বলেই এগোচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে দিতেই এরা দেখল, আঙুলে বড় বড় নখ রয়েছে। কালো কুচকুচে রঙ হাতের, কিন্তু জায়গায়-জায়গায় যেন ঘায়ের দাগ,

ক্ষতকটা শ্বেতীর মতো সাদা বা ফিকে গোলাপি ছোপ। কাঁধ থেকে পিঠ পেরিয়ে কোমর অব্দি ফালি-ফালি ন্যাকড়ার মতো কী সব ঝুলছে। বাকি দেহ পা অব্দি পুরো উলঙ্গ। সে উবুড় হয়েই এগোচ্ছে।

খপ করে একটা সীগালের ঠ্যাঙ সে ধরে ফেলতেই বাকিগুলো পাখার শব্দ তুলে তক্ষুনি পালিয়ে গেল। হাতে ধরা পাখিটা প্রকাণ্ড। ডানা ঝটপট করতে লাগল। তারপর গলায় কামড় বসাতেই পাখিটা বারকতক লাফালাফি করে থেমে গেল।

এতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে সবাই দেখছিল। উত্তেজনার চোটে হঠাৎ হ্যারি বেমক্কা চেঁচিয়ে বলে উঠল—সাবাস বুনো স্যাঙাত!

অমনি বনমানুষটা মাথা ঘুরিয়ে এদের দেখতে পেল। তারপরই সে একলাফে খাড়া হল এবং চোখের পলকে লম্বা কয়েকটি পা ফেলে ওদিকে পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই সময় ডিক রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে বসল ঝোঁকের মাথায়। গুলি লাগার কারণ ছিল না। প্রচণ্ড আওয়াজ পাহাড় ও জলে প্রতিধ্বনি তুলল। সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক ভয় পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে দূরে পালিয়ে গেল।

হ্যাস টমের হাত ধরে বলল—জলদি চলে এস।

চারজনে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপরে সেই জায়গাটায় গিয়ে উঠল। কিন্তু প্রাণীটার পাত্তা পেল না। যে পথে সেটা পালিয়েছে, অনুমান করে সেই পথে চলল ওরা। একখানে গিয়ে দেখল, নিচে একটা গোল মতো খাড়ির দু'ধারে অনেকটা সমতল জায়গা রয়েছে। এখানে খাড়ির জলটা এত স্বচ্ছ যে তলাঅব্দি রোদ্দুরে ঝকমক করছে।

অনেক কষ্টে নিচে গেল ওরা। টম হেঁট হয়ে পায়ের ছাপ খুঁজতে লাগল। ডিক ও হ্যারি বন্দুক বাগিয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে শুরু করল। সেই সময় হ্যাস বলে উঠল—টম, টম! এখানে দেখছি, আর একটা গুহা রয়েছে।

টম সবে মুখ তুলেছে, ডিক ও হ্যারি দৌড়ে কাছে এসেছে—সেই সময় দেখা গেল, প্রাণীটা বেরিয়ে পড়েছে গুহা থেকে। বাধা দেবার

আগেই প্রচণ্ড জোরে টমের বুকে এক লাথি মেরে অদ্ভুত কৌশলে সে পাথরের ধাপ বেয়ে ওপরে চলে গেল। টম পড়ে গিয়েছিল। ডিক আর হ্যারি বন্দুক ছোঁড়ার কথা ভুলে তখন তাকেই সামলাতে গেছে। হ্যাস বল্লমটা ছুঁড়তে পারত, ছুঁড়ল না। তার মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল কিছুক্ষণ আগে।

টম উঠে প্যান্ট-জামার ধুলোবালি ঝেড়ে তারপর ধীরে-সুস্থে পিস্তল তুলে অকারণ দুটো গুলি ছুঁড়ল।

হ্যাস বলল—থাক, আর মিছিমিছি গুলি ছুঁড়ে কাজ নেই। এস, মনে হচ্ছে আমরা ওর থাকার জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু টর্চ চাই যে!

হ্যারি বলল—দেশলাই আছে সঙ্গে। চলো।

গুহাটা পাইরেটস কেভের চেয়ে বড়ো। দরজার পাশে বড়ো একটা পাথর রয়েছে। ওটা দেখেই টম বলল—জন্তুটার আমাদের মতোই বুদ্ধি আছে দেখছি।

ভিতরে ঢুকতেই পচা গন্ধ লাগল নাকে। দেশলাই জ্বালার পর চারজনে হতভম্ব হয়ে দেখল, গুহার মেঝেয় রাজ্যের মাছের কাঁটা আর জন্তুর হাড় রয়েছে। কোণের দিকে কী একটা জিনিস দেখে হ্যাস এগিয়ে গেল। তারপর বলল—হ্যারি, শিগগির। দেশলাই জ্বালো এখানে।

দেশলাই কাঠিটা জ্বলে উঠতেই হ্যাস জিনিসটা দেখে বলল—একটা ছেঁড়া কম্বল। তাহলে···তাহলে···সে হটাৎ থেমে গেল।

টম বলল—আরে, বলে ফেলো না স্যাঙাত। আটকে রাখছ কেন?

হ্যাস বলল—টম, টম! আমরা হয়তো উমব্রিয়া জাহাজের সেই হতভাগ্য ক্যাপটেন বেনজেল্লোর দেখা পেয়েছি।

টম আঁতকে উঠে বলল—সর্বনাশ! সে যে আস্ত ভূত।

ডিক ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বুকে ক্রস আঁকতে থাকল। হ্যারি ফিসফিস করে বলল—বেনজেল্লোর ভূত! ওরে বাবা, কী হবে তাহলে?

হ্যাস উত্তেজিত ভাবে বলল—টম, হ্যারি, ডিক। ক্যাপটেন বেনজেল্লো মারা যাননি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। উমব্রিয়ায় মিত্রশক্তির টর্পেডো আঘাত হানলে নিশ্চয় উনি প্রাণ বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তারপর এই দ্বীপে এসে উঠেছিলেন।

হ্যারি বাধা দিয়ে বলল—যুদ্ধের সময় হোক আর যখনই হোক, কোন জাহাজের ক্যাপটেন কক্ষণো সবার আগে নিজের প্রাণ বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেয় না। সমুদ্রের জীবনে অনেক নীতি আর আইনকানুন মেনে চলা হয়।

—হয়, তা আমি জানি। জাহাজ বিপন্ন হলে ক্যাপটেন সবার শেষে জাহাজ ছেড়ে যান। তাই বেশির ভাগ সময়ই তাঁদের প্রাণ হারাতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো। উমব্রিয়ার ক্যাপটেন নিশ্চয় নিজের প্রাণ বাঁচানো জরুরী মনে করেছিলেন।

টম বলল—ব্যাটার বিবেক বলতে কিছু ছিল না।

হ্যাস বলল— যে কারণেই হোক, তিনি জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দ্বীপে আশ্রয় পাওয়ার পর হয়তো সেই বিবেকের খাতিরেই সভ্যসমাজকে মুখ দেখাতে চাননি আর। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন।

হ্যারি বলল—তাহলে আত্মহত্যা করে মরে ভূত হয়েছে ব্যাটা। আর সেই ভূতটাকেই আমরা দেখেছি।

হ্যাস বলল—না, আমরা জ্যান্ত মানুষটাকে দেখেছি। এমন হতে পারে, তিলেতিলে এভাবে কষ্ট সয়ে বেঁচে থেকে উনি সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। আত্মহত্যাকে পাপ ভেবেছেন। কিংবা হয়তো গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ভেবে ভয়ে লুকিয়ে রয়েছেন।

ডিক বলল—হল তো, জার্মান পণ্ডিতটা বড় বড় কেতাবী বুলি আওড়াতে শুরু করল। ওদের জাতের স্বভাবই এই।

টম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—তাহলে হ্যাস, তুমি বলছ আমরা যাকে দেখলুম, সে স্বয়ং বেনজেল্লো? মনের দুঃখে অথবা শাস্তির ভয়ে এভাবে পড়ে আছে এখানে?

হ্যাস জবাব দিল—হ্যাঁ।

—তাহলে ব্যাটা অমন ভূতের মতো আচরণ করছে কেন?

—সেটা এখনও স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। টম, আমরা বরং কোন কৌশলে ওঁর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করি। তারপর ওঁকে যেভাবে হোক, বুঝিয়ে দিই যে আমরা আপনাকে গ্রেফতার করতে আসিনি। আমরা বন্ধু।

তিনজনেই সায় দিল—বেড়ে বলেছ স্যাঙাত। তাই করা যাক।

॥ আট ॥

বেনজেল্লো ও গিয়েসেপ্পো

সে বেলার মতো বেনজেল্লোর গুহাটা চিনে রেখে ওরা 'পাইরেটস কেভে' ফিরে এল। আবার অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল, কীভাবে বেনজেল্লোর সঙ্গে ভাব করা যায়। ডিক বড্ড গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ। তার মতে, ওই বিদঘুটে জীবটা যদি সত্যি বেনজেল্লোবুড়ো হয়, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে, সে বিলকুল পাগল হয়ে গেছে। অতএব, তাকে দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে আটকে ফেলায় তেমন কিছু বাইবেল অশুদ্ধ হবে না। ডিক এই ফাঁস ছোঁড়ার খেলায় খুব ওস্তাদ। দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে এটা শিখেছে সে। দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে জীব-জন্তু ধরা হয় সেখানে।

ডিক বলল—কিছুদিন একটা সার্কাস দলেও ছিলুম। তখন মাঝে মাঝে টাটকা জন্তুজানোয়ার ধরতে কোম্পানি আমাকে আফ্রিকার জঙ্গলে পাঠাত। এই কৌশলে জ্যান্ত সিংহ ধরেছি আমি।

শুনে হ্যারি গম্ভীর হয়ে বলল—ডিক ভায়া, তোমার মোটর-বোটটা কিনতে কতগুলো সিংহ ধরতে হয়েছে?

ডিক চটে গিয়ে বলল—ভাবছ আমি মিথ্যে বলছি? ঠিক আছে। ওই তো দড়ি রয়েছে। ওই দিয়েই ব্যাটাকে আমি ধরে ফেলব, কথা

দিচ্ছি। বলে, সে তক্ষুনি দড়ির ফাঁস বানাতে ব্যস্ত হল। আপন মনে ফের বলল—তবে এই দড়ি বড্ড নরম। ফাঁসের দড়ি কড়া হওয়া চাই। হুঁ, মোম দিলে এটা কড়া করা যাবে।

হ্যাস ওর কথা মন দিয়ে শুনছিল। তার মনে হল, ডিকের কৌশলটাই সবচেয়ে নিরাপদ হবে। কিন্তু গায়ের জোরে বেনজেল্লোকে আটকানোর চেয়ে ওর সঙ্গে আগে ভাব করার চেষ্টা করে দেখা যাক্ না কী হয়। সে বলল—হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে আমাদের ডিকভায়ার কৌশলটা অপূর্ব। কিন্তু আমি বলছিলুম কী, আজকের দিন ও রাতটা অন্তত আমাকে সময় দেওয়া হোক না। আমি একা কিছু করতে পারি কিনা দেখি।

টম বলল—কিন্তু তার মধ্যেই হঠাৎ যদি আমাদের কারো মাথা বুড়ো শয়তানটা পাথর ছুঁড়ে গুঁড়ো করে ফেলে?

হ্যারি মাথা নেড়ে বলল—সেটাই ভাবনার কথা। ব্যাটা লুকিয়ে থেকে পাথর ছুঁড়তেও তো পারে।

হ্যাস বলল—বরং আজকের দিন ও রাতটা তোমরা কেউ এখান থেকে বেরিও না। আমি একা বেরুবো। দরজাটা ভাল করে আটকে রাখো। আমি ডাকলে তখন খুলে দেবে।

ডিক চোখ পাকিয়ে বলল—শুনছ জার্মানটার মতলব! বাঃ, আমাদের আটকে রেখে ও পালাবার মতলব করেছে, বুঝতে পারছ তো?

হ্যারি তাকে সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ, নতুন খোকা কেটে পড়বে ভাবছে। তা হবে না চাঁদ। পালিয়ে গিয়ে সেই আরব দুটোকে নিয়ে এসে গুপ্তধন একা হাতাবে সেটি হবে না।

কিন্তু টম ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল—পালাবে কোথায়? বিনা নৌকোয় এই দ্বীপ থেকে কোন মানুষ পালাতে পারে না। উমব্রিয়ার ভূতুড়ে কাণ্ডর ভয়ে এ তল্লাটে প্রাণের দায়ে না ঠেকলে কোন জেলে-নৌকোও আসে না। যা খুশি করতে দাও না ওকে।

ডিক ফাঁসটা তৈরি করে রেখে সিগারেট ধরাল। তারপর বলল—

ঠিক আছে। তবে আজ লাঞ্চে (দুপুরের খাওয়া) টাটকা মাছ না খেলে আমি মরে যাব। টিনের বাসি মাছ আর মুখে রোচে না। চলো হে হ্যারি, আমরা বরং মাছ মেরে আনি দু'জনে।

টম সায় দিয়ে বলল—কিন্তু সবসময় সাবধানে থাকবে।

ওরা দু'জনে বল্লম আর হারপুন নিয়ে বেরিয়ে গেল। টম হাত-পা ছড়িয়ে শুলো। হাই তুলে বলল—রাত্তিরে মদটা বড় কড়া ছিল। ঢুলুনি যাচ্ছে না। আমি ঘুমিয়ে নিই।

হ্যাস একটু হেসে বলল—আজ একবার উমব্রিয়ায় হানা দেবে না, টম?

টম চোখ বুজে থেকে বলল—দিনের বেলায়? পাগল না মাথা খারাপ? এখান থেকে পাক্কা ছ'মাইল বোট চালিয়ে যাওয়া, তারপর উমব্রিয়ার কাছে আমাদের ছেড়ে দিয়ে আসা—এর মধ্যে অনেকটা ঝুঁকি আছে। বদমাস জল-পুলিশগুলোর নজর শকুনের মতো। তোমার সেই আরব-দুটোর বরাত দেখে টের পাচ্ছ না? আমাদের চোখে না পড়লে আর ডিকের বোটটা না থাকলে তুমি নির্ঘাৎ হাঙরের পেটে যেতে। কাজেই উমব্রিয়ায় হানা দিতে হলে সেই শেষবেলায় সন্ধ্যার মুখোমুখি কিংবা রাত্তিরে।

লোকটা অদ্ভুত তো! বলতে বলতে ওর নাক ডাকতে লাগল। দিনদুপুরে এরকম ঘুম দেখে তাজ্জব বনে গেল হ্যাস। একটু বসে থাকার পর খুব সাবধানে ওর কোমরে ঝুলানো চামড়ার খাপ থেকে পিস্তলটা বের করে নিল। টম টের পেল না। তারপর হ্যারির টর্চটাও নিল।

হ্যাস বাইরে এসে পাথরটা গুহার মুখে আটকে দিল। তারপর হাঁটতে থাকল। মাথার ওপর সূর্য! রোদে চামড়া ঝলসে যাচ্ছে। ছায়া বলতে যেটুকু আছে তা পাথরের খাঁজ, কিংবা প্রবালদেয়ালের ধারে। কিন্তু সূর্য মাথার ওপর বলে সেটুকু ছায়া কোন কাজে লাগবার নয়।

সে ওদের ধারে এসে দেখল, ডিক ও হ্যারি পশ্চিমে প্রণালীটার

দিকে মাছ মারতে চলেছে। তারা চোখের আড়ালে গেলে হ্যাস ডাইনে ঘুরে বেনজেল্লোর গুহার দিকে চলল।

এবড়োখেবড়ো একটা টিলার ওপর উঠে সে চারদিকটা এবং ওপরে-নিচে ভাল করে দেখতে থাকল। কোন জন-মানুষ নেই। খাড়িতে পাখির ঝাঁক ওড়াওড়ি করছে। বাতাস বেড়েছে। তাই সমুদ্রের বুকে বড় বড় ঢেউ উঠছে এখন। খাড়িতে জল প্রচণ্ড শব্দে আছাড় পড়ছে। সাদা ফেনা ভাসছে চাপচাপ। দূরে এদিকে ওদিকে আবছা দু-একটা জাহাজও দেখতে পেল হ্যাস। দ্বীপের পূব ও দক্ষিণে সমুদ্রের তলায় ডুবো-পাহাড় আছে। তাই সেগুলো এড়িয়ে যেতে হয় জাহাজকে। আর দূর পশ্চিমে উমব্রিয়ার আবছা মাস্তুলটা একটা মোটা বিন্দুর মতো ঢেউএ মাথা উঁচু করে দুলছে। ওদিকটা অনেক দূর অব্দি নিষিদ্ধ এলাকা। তাই ওদিকেও কোন জাহাজকে যেতে দেওয়া হয় না। হ্যাস দেখল, উত্তর-পশ্চিম কোণে সোয়াকিন বন্দরটা যেন আকাশে ভাসছে। উজ্জ্বল রোদে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এতদূর থেকে। এমনকি বালির পাহাড়গুলোও ঝকমক করতে দেখল সে। সমুদ্র বা মরুভূমির এই এক ব্যাপার—দূরের কোন জিনিস আকাশে উঁচুতে ভাসছে দেখা যায়।

উমব্রিয়ার মাস্তুলটা আবার দেখতে থাকল হ্যাস। ওটা কেন চলে বেড়াচ্ছিল? আর সেই সব নীল আলোর ঝলকানিই বা কেন দেখা যাচ্ছিল? সত্যি কি ওটা ভূতুড়ে জাহাজ? নানা কথা ভেসে এল হ্যাসের মাথায়। তারপর মনে পড়ল, ক্যাপটেন বেনজেল্লোর কথা। জাহাজটা ডুবেছে উনিশ বছর আগে। এই উনিশ বছর ধরে লোকটা এই দ্বীপে কাঁচা মাছ-মাংস খেয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু দ্বীপ ছেড়ে যাবার চেষ্টা করেনি তা বোঝাই যায়। কেন? নাকি অতবড় কাণ্ডর পর লোকটা মানসিক আঘাতে জড়বুদ্ধি বা পাগল হয়ে গেছে?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। তারপর টের পেল, কড়া রোদে তার গায়ে ফোস্কা পড়তে শুরু করেছে, সারা গায়ে নুন জমে গেছে। সে সামনে এগিয়ে গেল। তারপর ডাইনে ধাপে

ধাপে নামতে শুরু করল। ঘণ্টা তিনেক আগে এই জাহাজটা ভালো করে দেখে গিয়েছে। তাই চিনতে ভুল হল না।

একটু পরেই গোল খাড়িটার ধারে পৌঁছাল সে। তারপর সাবধানে গুহাটার দিকে পা বাড়াল। গুহামুখের একপাশে দাঁড়িয়ে সে চাপা গলায় ইটালিয়ান ভাষায় ডাকল---ক্যাপটেন বেনজেল্লো।

কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। তখন সে আবার ডাকল—ক্যাপটেন! আমি আপনার বন্ধু। কোন ভয় নেই আপনার। আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে আসিনি।

তবু কোন সাড়া নেই।

—ক্যাপটেন বেনজেল্লো, আমি একজন জার্মান ডুবুরি। সরকারী লোক নই। দয়া করে সাড়া দিন।

কিন্তু গুহা থেকে কোন শব্দ ভেসে এল না। তখন হ্যাস গুহায় ঢুকে গেল। ভিতরটা প্রচণ্ড অন্ধকার। টর্চ জ্বালল সে। সেই একই দৃশ্য। মাছের কংকাল আর হাড়গোড় ছড়িয়ে আছে মেঝেয়। কোণায় ছেঁড়াখোড়া কম্বলটাও রয়েছে। হ্যাস কম্বলটা সাবধানে সড়াল। তলায় কিছু থাকবে ভেবেছিল, কিন্তু নেই।

এবার সে গুহার ভিতরের দেয়ালগুলোয় আলো ফেলল। হঠাৎ দেখল, কোণায় একটা চারফুট-তু'ফুট ফোকর আন্দাজ রয়েছে। একটু ইতস্তত করে সে ফোকরটার ভিতরে আলো ফেলল। বাঃ, এ যে দিব্যি একটা সুড়ঙ্গপথ রয়েছে!

তার ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল হ্যাস। আলো ফেলে এগোল। পথটা ঘুরে ঘুরে যেখানে শেষ হল, সেখানে আর একটা চওড়া ঘর। কিন্তু ছাদ থেকে বটের ঝুরির মতো অনেক থাম এসে মেঝেয় মিশেছে। থামগুলো এবড়োখেবড়ো। বোঝা যায়, প্রাকৃতিক কারণেই গুহাটা গড়ে উঠেছে অন্য সব গুহার মতোই।

টর্চের আলো একটা থামের কাছে পড়ামাত্র হ্যাস চমকে উঠল। এ কী দৃশ্য! সেই উলঙ্গ ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে কে আস্টেপিস্টে থামের সঙ্গে বেঁধে রেখে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল হ্যাস। এবার সে কাছে গেল। হতভাগ্য লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আলোর দিকে। ওই দৃষ্টি অস্বাভাবিক। হ্যাস কাছে হাঁটু মুড়ে বসে বলে উঠল—ক্যাপটেন বেনজেল্লো! আমি আপনার বন্ধু। দয়া করে ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে আসিনি। আমি একজন জার্মান ডুবুরি।

লোকটা কি বোবা? শুধু বড় বড় হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে। গা শিউরে ওঠে সেই চাউনি দেখলে।

হ্যাস ওর গা থেকে কড়া দুর্গন্ধ পাচ্ছিল। নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধ বমি হয়ে যাবার দশা একেবারে। তবু সে ওর নোংরা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফের বলল—ভয়ের কিছু নেই ক্যাপটেন। বলুন, কে আপনাকে এমন করে বেঁধে রেখে গেল? তাকে আমি শাস্তি দেব। আমি আপনার বন্ধু। বলুন, ভয়ের কিছু নেই।

আশ্চর্য, এবার ওর দুচোখ ফেটে ঝরঝর করে জল ঝরতে থাকল। তারপর লোকটা হাঁ করল। হ্যাস বুঝতে পারল, কী বলতে চায়। সে টর্চের আলো ফেলে মুখের ভিতরে যা দেখল, শিউরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ওর জিভটা আদ্ধেক কেউ কেটে নিয়েছে কবে। তারপর আশ্চর্যভাবে ঘা শুকিয়েও গেছে। কিন্তু কথা বলা দূরে যাক, এর ফলে কোন আওয়াজ করার ক্ষমতাও যেন ও হারিয়ে ফেলেছে।

হ্যাস তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে বাঁধনগুলো কেটে ফেলল। ভাগ্যিস ছুরিটা তার ডুবুরির জাঙিয়ার পকেটে ছিল। হ্যারির পাতলুনটা এবার খুলে ফেলল সে। ক্যাপটেন বেনজেল্লো তখন মেঝেয় কাঠ হয়ে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। পাতলুনটা তাকে পরাল হ্যাস। কোন বাধা দিল না সে। এখন খানিকটা জল পেলে ভাল হত। কিন্তু জল তো পাইরেটস কেড়ে। এত ওজনদার প্রকাণ্ড মানুষটাকে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কি তার আছে?

হ্যাস উদ্বিগ্ন মুখে বলল—আপনার জলতেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়? কিন্তু এখানে তো খাবার জল নেই।

ধাপে নামতে শুরু করল। ঘণ্টা তিনেক আগে এই জাহাজটা ভালো করে দেখে গিয়েছে। তাই চিনতে ভুল হল না।

একটু পরেই গোল খাড়িটার ধারে পৌঁছাল সে। তারপর সাবধানে গুহাটার দিকে পা বাড়াল। গুহামুখের একপাশে দাঁড়িয়ে সে চাপা গলায় ইটালিয়ান ভাষায় ডাকল--ক্যাপটেন বেনজেল্লো।

কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। তখন সে আবার ডাকল—ক্যাপটেন! আমি আপনার বন্ধু। কোন ভয় নেই আপনার। আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে আসিনি।

তবু কোন সাড়া নেই।

—ক্যাপটেন বেনজেল্লো, আমি একজন জার্মান ডুবুরি। সরকারী লোক নই। দয়া করে সাড়া দিন।

কিন্তু গুহা থেকে কোন শব্দ ভেসে এল না। তখন হ্যাস গুহায় ঢুকে গেল। ভিতরটা প্রচণ্ড অন্ধকার। টর্চ জ্বালল সে। সেই একই দৃশ্য: মাছের কংকাল আর হাড়গোড় ছড়িয়ে আছে মেঝেয়। কোণায় ছেঁড়াখোড়া কম্বলটাও রয়েছে। হ্যাস কম্বলটা সাবধানে সড়াল। তলায় কিছু থাকবে ভেবেছিল, কিন্তু নেই।

এবার সে গুহার ভিতরের দেয়ালগুলোয় আলো ফেলল। হঠাৎ দেখল, কোণায় একটা চারফুট-দু'ফুট ফোকর আন্দাজ রয়েছে। একটু ইতস্তত করে সে ফোকরটার ভিতরে আলো ফেলল। বাঃ, এ যে দিব্যি একটা সুড়ঙ্গপথ রয়েছে!

তার ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল হ্যাস। আলো ফেলে এগোল। পথটা ঘুরে ঘুরে যেখানে শেষ হল, সেখানে আর একটা চওড়া ঘর। কিন্তু ছাদ থেকে বটের ঝুরির মতো অনেক থাম এসে মেঝেয় মিশেছে। থামগুলো এবড়োখেবড়ো। বোঝা যায়, প্রাকৃতিক কারণেই গুহাটা গড়ে উঠেছে অন্য সব গুহার মতোই।

টর্চের আলো একটা থামের কাছে পড়ামাত্র হ্যাস চমকে উঠল। এ কী দৃশ্য! সেই উলঙ্গ ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে কে আস্টেপিস্টে থামের সঙ্গে বেঁধে রেখে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল হ্যাস। এবার সে কাছে গেল। হতভাগ্য লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আলোর দিকে। ওই দৃষ্টি অস্বাভাবিক। হ্যাস কাছে হাঁটু মুড়ে বসে বলে উঠল—ক্যাপটেন বেনজেল্লো! আমি আপনার বন্ধু। দয়া করে ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে আসিনি। আমি একজন জার্মান ডুবুরি।

লোকটা কি বোবা? শুধু বড় বড় হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে। গা শিউরে ওঠে সেই চাউনি দেখলে।

হ্যাস ওর গা থেকে কড়া দুর্গন্ধ পাচ্ছিল। নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধ বমি হয়ে যাবার দশা একেবারে। তবু সে ওর নোংরা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফের বলল—ভয়ের কিছু নেই ক্যাপটেন। বলুন, কে আপনাকে এমন করে বেঁধে রেখে গেল? তাকে আমি শাস্তি দেব। আমি আপনার বন্ধু। বলুন, ভয়ের কিছু নেই।

আশ্চর্য, এবার ওর দুচোখ ফেটে ঝরঝর করে জল ঝরতে থাকল। তারপর লোকটা হাঁ করল। হ্যাস বুঝতে পারল, কী বলতে চায়। সে টর্চের আলো ফেলে মুখের ভিতরে যা দেখল, শিউরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ওর জিভটা আদ্ধেক কেউ কেটে নিয়েছে কবে। তারপর আশ্চর্যভাবে ঘা শুকিয়েও গেছে। কিন্তু কথা বলা দূরে যাক, এর ফলে কোন আওয়াজ করার ক্ষমতাও যেন ও হারিয়ে ফেলেছে।

হ্যাস তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে বাঁধনগুলো কেটে ফেলল। ভাগ্যিস ছুরিটা তার ডুবুরির জাঙিয়ার পকেটে ছিল। হ্যারির পাতলুনটা এবার খুলে ফেলল সে। ক্যাপটেন বেনজেল্লো তখন মেঝেয় কাঠ হয়ে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। পাতলুনটা তাকে পরাল হ্যাস। কোন বাধা দিল না সে। এখন খানিকটা জল পেলে ভাল হত। কিন্তু জল তো পাইরেটস কেভে। এত ওজনদার প্রকাণ্ড মানুষটাকে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কি তার আছে?

হ্যাস উদ্বিগ্ন মুখে বলল—আপনার জলতেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়? কিন্তু এখানে তো খাবার জল নেই।

বলেই হঠাৎ মনে হল, তাহলে কি জল না খেয়েই টানা উনিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে বেনজেল্লো? তা অসম্ভব। নিশ্চয় প্রবালদ্বীপের কোথাও স্বাভাবিক প্রস্রবণ আছে, যেখানে মিঠে জল পাওয়া যায়।

সে বলল—ক্যাপটেন, আপনি কোথায় খাবার জল পেতেন? দয়া করে শিগগির বলুন। আমি এক দৌড়ে সেখান থেকে জল নিয়ে আসব।

বেনজেল্লো হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে ইসারা করল। হ্যাস তাকে ধরল। তখন অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল সে। হ্যাসের কাঁধে ভর করে পা বাড়াল। বাইরে বেরিয়ে গোল খাড়িটার পশ্চিমে গেল ওরা। তারপর হ্যাস অবাক হয়ে দেখল, একটা ফাটল বেয়ে ওপর থেকে এক ফালি স্বচ্ছ জলের ধারা নেমে এসে পাথরের ফাঁক দিয়ে খাড়ির লোনা জলে মিশে যাচ্ছে। যা ভেবেছিল, তাই বটে। ওপরে কোথাও একটা প্রস্রবণ আছে।

বেনজেল্লো সেই জলে মুখ রেখে জন্তুদের মতো অদ্ভুত ভঙ্গীতে তেষ্টা মিটিয়ে নিল। তারপর হাত বাড়াল ফের।

না, লোকটা পুরো পাগল নয়। তবে পাগলামি কিছুটা আছে, তা ঠিকই। তা না হলে হ্যাসদের পাথর ছুঁড়েই বা তখন মারতে চেষ্টা করবে কেন?

হ্যাস তাকে ধরে আস্তে আস্তে চড়াই ভেঙে উঠতে শুরু করল। যখন তারা টিলাটার মাথায় পৌঁছেছে, হঠাৎ মাথার ওপর প্রচণ্ড গুলির শব্দ হল। বেনজেল্লো তাকে আঁকড়ে ধরে তক্ষুনি মাটিতে শুয়ে পড়েছিল। আবার তিনবার গুলি ছুঁড়ল কে? একটা গিয়ে লাগল সামনের একটা পাথরের দেয়ালে। খানিকটা চটা উঠে গেল। তখন হ্যাস তার পিস্তলটা বের করে যেদিক থেকে গুলি আসছিল, সেদিকে পরপর দুবার গুলি ছুঁড়ল।

সেই সময় নিচের দিকে একটা জায়গার দিকে বেনজেল্লো ইসারায় হ্যাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হ্যাস দেখল, অবিকল তিমির বাচ্চার মতো কী আজব একটা সামুদ্রিক প্রাণী ডাঙা থেকে পিছনে সমুদ্রের

জলে গিয়ে ডুবল। কয়েক মিনিট তাকিয়ে থাকল হ্যাস। কিন্তু সেটা আর দেখা গেল না। যেখানে ডুবেছিল. সেখান থেকে বড়বড় বুদ্বুদ উঠছিল। একটু পরেই বুদ্বুদগুলো মিলিয়ে গেল।

হ্যাস অবাক হয়ে বেনজেল্লোকে বলল—কী ওটা?

কিছু বলার চেষ্টা করল বেনজেল্লো। কিন্তু চাপা গোঁ-গোঁ শব্দ ছাড়া কিছুই বোঝা গেল না।

তখন হ্যাস বলল—কিন্তু গুলি ছুঁড়ল কে? আপনাকে যে বেঁধে রেখেছিল সেই লোকটা নিশ্চয়?

বেনজেল্লো জোরে মাথা দোলাল। অর্থাৎ হ্যাঁ, সেই বটে!

হ্যাস আবার প্রশ্ন করল--তিমিমাছের বাচ্চার মতো যেটা দেখলুম সেটা কী?

এবার বেনজেল্লো একটুকরো প্রবালমাটি ভেঙে নিয়ে একটা কালো পাথরের ওপর পরিষ্কার ইটালিয়ান ভাষায় লিখল—শয়তান গিয়েসেপ্পো। সে এখনও বেঁচে আছে। উমব্রিয়ার যখের ধনের মালিক সে। এতদিন সে আমাকে ধরার চেষ্টা করেছে, পারেনি। আজ ধরে ফেলেছিল।

এই প্রখর রোদে বসে থাকা কঠিন। হ্যাস বলল—চলুন, আগে আমাদের আস্তানায় যাওয়া যাক। তারপর সব শুনব।

বেনজেল্লো লেখাটা আগে সাবধানে মুছে ফেলল। তারপর এগোল হ্যাসের কাঁধে ভর দিয়ে। এতক্ষণে হ্যাস দেখল, বুড়োকে শয়তান গিয়েসেপ্পো বেঁধে প্রচণ্ড মার দিয়েছে। পিঠের দিকটায় লাল ছোপ পড়েছে। কোথাও কোথাও বিশ্রিভাবে কেটে গেছে বা ফুলে রয়েছে। দেখে হ্যাসের খুব কষ্ট হল।

ওরা যখন 'পাইরেটস কেভে' পৌঁছাল, ডিক আর হ্যারি মাছ ধরে ফেরেনি। টম ভোঁস ভোঁস করে তখনো ঘুমোচ্ছে।

বেনজেল্লো গুহায় ঢুকেই হঠাৎ নাক উঁচু করে কী শুঁকছিল। এবার সে লাফ দিয়ে কোণায় রাখা প্যাকিং বাক্সোগুলোর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর খাবারের টিনগুলো হিংস্র হাতে বের করে

দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। হ্যাস হাসিমুখে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে টমকে ডাকল—হ্যালো দলপতি। ওঠ, ওঠ শিগগির। মজা দেখবে তো উঠে পড়ো।

বেনজেল্লো তখন কৌটোর মুখ প্রায় দুমড়ে ঢাকনা খুলে সার্ডিন মাছের শুটকি গুলোয় কামড় বসিয়েছে।

টমের ঘুম ভেঙে গেল। লাল চোখে তাকিয়ে সে বলল—এত চেল্লাচিল্লি কিসের হে স্যাঙাত? বললুম না তখন, ঘুম পণ্ড করবে না:

—আরে দাদা ওঠ। দেখ না ওদিকে কী কাণ্ড হচ্ছে!

টম বেনজেল্লোর দিকে ঘুরেই কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর বিকট চেঁচিয়ে বলল—কোন্ হতচ্ছাড়া বদমাস রে তুই? ওরে ব্যাটা রাক্ষসের ধাড়ি! ওরে মামদো খোক্কস! কে, কে তুই? যাঃ, সব খেয়ে শেষ করল!

তারপর হ্যাসকে তেড়ে এল—হাঁ করে খাবারগুলো ধ্বংস হওয়া দেখছ তুমি? ডিক ঠিকই বলেছে, দেখছি! জার্মানগুলোর আক্কেল কবে হবে?

বলে, সে কোণের দিকে দৌড়ে গেল। তারপর বেনজেল্লোর দু' কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওই ক্ষুধার্থ পাথরটাকে নড়ানোর শক্তি তার নেই।

এবার বেনজেল্লো দুধের কৌটোটা কামড়াতে কামড়াতে তার দিকে ঘুরতেই টম বিকট চিৎকার করে আঁতকে উঠে এক লাফে সরে এল—ওরে বাবা! এযে দেখছি, সেই ভূতুড়ে গুহা-মানুষটা! ওকে গুলি করে মারব!

হ্যাস টমের একটা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। বলল—চুপ করে বসো তো দাদা! ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে খেতে দাও। উনিশ বছর ধরে শুধু কাঁচা মাছ-মাংস খেয়ে কাটাচ্ছেন বেচারা। আজ সভ্য জগতের খাবারদাবার খেয়ে উনি ফের সভ্যমানুষ হোন।

টমের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। সে বলল—তাহলে উনি সত্যিসত্যিই উমব্রিয়ার ক্যাপটেন বেনজেল্লো?

—হ্যাঁ। আমার অনুমান ভুল হয়নি, টম।

—তুমি গিয়ে ডাকলে, আর ভালমানুষের মতো চলে এল ?

—না, সব বলছি। তুমি ততক্ষণে ডিক আর হ্যারিকে শিগগির ডেকে আনো। আমাদের জরুরী কনফারেন্স বসবে।

॥ নয় ॥

সর্বনাশের সূচনা

গুহার মেঝেতে খড়ি দিয়ে হতভাগ্য বেনজেল্লোবুড়ো যা লিখল, তা এই :

—উমব্রিয়ার সহকারী ক্যাপটেন গিয়েসেপ্পোর ফুসলানীতে ক্যাপটেন বেনজেল্লোর বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুদান এলাকায় গোপনে আঘাত হানবার জন্য ইতালী সরকার জাহাজটা পাঠায়। কিন্তু গিয়েসেপ্পো তলে তলে ব্রিটিশ গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিল। উমব্রিয়া যখন সুদানের উপকুল থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে, তখন শয়তান গিয়েসেপ্পো ক্যাপটেনকে সব খুলে বলে এবং টাকার লোভ দেখায়। ক্যাপটেন বেনজেল্লো ভুল করল! সে রাজী হয়ে গেল সহকারীর কথায়। ভাবল, ইতালী-জার্মানতো হেরে ভূত হবে এই যুদ্ধে। কাজেই ফাঁকতালে কিছু রোজগার হয়ে যাক না।

···কথাছিল, উমব্রিয়া কবে কখন কোথায় পৌছচ্ছে, এ খবরটা বেতারে গোপন সংকেতের সাহায্যে সুদানের ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে জানিয়ে দিতে হবে। তখন রাত বারোটা! উমব্রিয়া প্রবালদ্বীপের ছ'মাইল পশ্চিমে পৌছানোর পর গিয়েসেপ্পো ক্যাপটেনকে কথাটা জানিয়েছিল। তখন ক্যাপটেনেরও অবশ্য কিছু করার নেই সায় দেওয়া ছাড়া। কারণ, শয়তানটার হাতে বেতারের ভার। সে জানাতই ব্রিটিশ দলকে।

···যাই হোক, বোকার মতো কিছুটা টাকার লোভে, কিছুটা

প্রাণের মায়ায় বেনজেল্লোকে রাজি হতে হল। খবর পাঠাবার পর কথামতো সাবমেরিন রওনা হল সুদান থেকে। এদিকে প্রবাল দ্বীপের কাছে একটা মোটর-বোট অপেক্ষা করবে। ক্যাপটেন ও সহকারী ক্যাপটেনকে তুলে নেবে আগে-ভাগে।

ঠিক সময়ে চুপিচুপি দু'জনে লাইফবেল্ট পরে সমুদ্রে নেমে পড়ল। কেউ টের পেল না এই কাণ্ড। জাহাজ চলতে থাকল। কিছুদূর যাবার পর কথামতো গিয়েসেপ্পো প্রবাল দ্বীপের দিকে টর্চ দুলিয়ে ইশারা করল—শিগগির বোট নিয়ে এসো।

বোট এসে গেল। কিন্তু গিয়েসেপ্পো শয়তান আর লোভী যেমন, তেমনি নিষ্ঠুর সে, বেনজেল্লোকে ওঠাতে বারণ করল। বলল—এই পাজিটা খুব দেশভক্ত। ওকে উদ্ধার করলে বিপদ বেড়ে যাবে। ওকে খতম করে দাও!

অমনি বোট থেকে একজন ব্রিটিশ সেনা বন্দুক তাক করে গুলি ছুঁড়ল বেনজেল্লোর দিকে। বেনজেল্লো ব্যাপারটা টের পেয়েই প্রাণ বাঁচাতে লাইফ বেল্ট খুলে ফেলেছিল। জলে ডুব দিল তক্ষুনি। বেল্ট না খুললে ডুবতে পারত না।

...সেই মুহূর্তে খানিকটা দূরে উমব্রিয়ার তলায় ঢুঁ মারল টর্পেডো। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটল। তখন গিয়েসেপ্পে চেঁচিয়ে উঠল—শিগগির সরে পড়া যাক্ এখান থেকে। ব্যাটা হাঙরের পেটে যাবে। ছেড়ে দাও।

...তক্ষুনি বোট নিয়ে ওরা সুদানের দিকে চলে গেল প্রচণ্ড বেগে, আর অসহায় বেনজেল্লো সাঁতার কাটতে থাকল। অন্ধকারে লাইফ-বেল্টটা আর খুঁজে পেল না সে। ঈশ্বরের দয়ায় হাঙর আর হিংস্র বারাকুদা মাছের ঝাঁক তাকে আক্রমণ করতে এল না। সে প্রবাল দ্বীপটা কোন্‌দিকে তা জানত। সাঁতার কেটে সেদিকেই এগিয়ে চলল সে। অবশেষে দ্বীপে পৌঁছতে পারল।

...তারপর? আর কিছু মনে নেই বেনজেল্লোর। উনিশটা বছর কীভাবে যে কাটিয়েছে, তা বলা অসম্ভব তার পক্ষে। প্রাণ বাঁচাতে

কাঁচা মাছ আর সামুদ্রিক পশুপাখি পাথর দিয়ে মেরে কাঁচা কামড়ে খেয়েছে। কিন্তু পালিয়ে যাবার কথা ভাবতে পারেনি। একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটিয়েছে সে। তাকে নিশ্চয় এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে ফাঁসি দেওয়া হবে। তাই দ্বীপে দৈবাৎ কেউ এসে পড়লে সে ভয় পেয়ে ভেবেছে, তাকে গ্রেফতার করতেই লোক পাঠানো হয়েছে। তাই তাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে চেয়েছে সে।

আর গিয়েসেপ্পো?

…গিয়েসেপ্পোর পরবর্তী জীবনের ঘটনা সে কিছু জানে না। তবে ক'বছর আগে এক রাত্রে হঠাৎ গিয়েসেপ্পো আর কয়েকজন লোককে এই দ্বীপে বোট নিয়ে আসতে দেখে বেনজেল্লো তাদের কাছে রাইফেল আর রিভলবার ছিল, পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে ওদের কথাবার্তা শুনেছিল। উমব্রিয়া জাহাজে নাকি এক সিন্দুক সোনার ইঁট আছে। আর আছে একরকম সাংঘাতিক অস্ত্র—শেলে ঠাসা মিথেন গ্যাস। এই গ্যাস বড় মারাত্মক। গিয়েসেপ্পো সোনার দিকে তত মনোযোগী নয়। ওই গ্যাসের শেলগুলো কোন দেশের সরকারকে পাচার করতে পারলে কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারবে সে। সোনার দাম বড় জোর পঞ্চাশ-ষাট লাখের বেশী হবে না। কিন্তু গ্যাসের শেলগুলো নাকি পঞ্চাশ-ষাট কোটি টাকায় যে কোন দেশের সরকার এক্ষুনি লুফে নেবে। ওই গ্যাস তৈরি করতেই ইতালী সরকার কয়েক শো কোটি টাকা খরচ করেছিল! দেনায় এখনও চুল বিকিয়ে রয়েছে তাদের!

…গিয়েসেপ্পো তারপর থেকে প্রায়ই আসে, আর সম্ভবতঃ খোঁজা-খুঁজি করে ফিরে যায়। উমব্রিয়ার কোন্ গোপন জায়গায় শেলগুলো আছে সে এখনও পাত্তা করতে পায়নি। ব্যাটা পাকা ডুবুরি। অদ্ভুত জলপোষাক আছে তার। দেখলে মনে হবে, আস্ত তিমি মাছের বাচ্চা।

বেনজেল্লোকে আবিষ্কার করল কীভাবে সে?…

…বুদ্ধির ভুলে নিজে থেকেই একদিন সামনে গিয়েছিল বেনজেল্লো।

তাকে মেরেই ফেলতো গিয়েসেপ্পো! কিন্তু দলের এক স্যাঙাতের মনে দয়া হল, বলল—মিছিমিছি মানুষ খুন করে আবার কী হাঙ্গামায় পড়বে? তার চেয়ে ওর জিভটা কেটে নেওয়া যাক। বোবা হয়ে যাবে। কাউকে ও কিছু বলতে পারবে না। সে বড় অমানুষিক যন্ত্রণায় কাটাতে হয়েছে বেনজেল্লোকে। তারপর থেকে মানুষ দেখলেই সে প্রতিহিংসায় পাথর ছুঁড়ে মারে। আজ একটু আগে ব্যাটা কখন ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল গুহার মধ্যে। আচমকা অন্ধকারে ধরে ফেলে এবং দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। হয়তো প্রাণেই মেরে ফেলত এবার, কিন্তু হ্যাসের সাড়া পেয়ে সে পালিয়ে যায়।

এতক্ষণ ধরে সব শোনার পর হ্যাস বলল—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, গিয়েসেপ্পো মাঝে মাঝে দ্বীপে আসে এবং সেই তিমিমাছের পোষাকে উমব্রিয়ায় যায়। কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে না।

টম বলল—কী?

—কেন ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে সে বাঁচিয়ে রাখল?

ডিক বলল—বেড়ে বলেছ। এ কথাটাই বুঝতে পারছি না।

হ্যারি বলল—আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয় ক্যাপটেন-বুড়ো কিছু লুকোচ্ছে আমাদের। ওর কাছেই বোধ হয় মিথেন শেলগুলোর খোঁজখবর আছে, বুঝলে টমভায়া। জ্বালাতন করে তা আদায় করতে চায় গিয়েসেপ্পো।

হ্যাস কথাটা শুনতে শুনতে ক্যাপটেন বেনজেল্লোর দিকে তাকাল। দেখল, বুড়ো অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যারি এগিয়ে গিয়ে বলল—ক্যাপটেন বুড়ো! ওসব চালাকি দয়া করে ছাড়ুন। এবার সত্যি কথাটা ঝেড়ে বলুন তো ভালমানুষের মতো। মিথেন শেলের ভাঁড়ার জাহাজের কোন্ খোলে আছে, নিশ্চয় আপনি জানেন। আমার ধারণা, টর্পেডোর আঘাতেও সে জায়গাটা ফাঁসানো যায়নি—এমন কোন শক্ত ধাতুতে সেই জায়গাটা তৈরি। ফাঁসলে তো প্রলয় কাণ্ড হ'ত। কী বলেন ক্যাপটেন?

অমনি বেনজেল্লো তার গলাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরল। হ্যারি গোঁ-গোঁ করে উঠল। হ্যাস, টম আর ডিক ঝাঁপিয়ে পড়ে অতিকষ্টে ছাড়াল ওকে। বুড়োর গায়ে যেন অসুরের শক্তি। হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—ওরে বাবা! বুড়ো যে সাক্ষাৎ দত্যিদানো! রক্ষে করো বাবা, ওর ধারে কাছে আর আমি যাচ্ছিনে। যেতে হলে আগে মুণ্ডুটি রাইফেলের গুলিতে ফুটো করব, বলে দিচ্ছি হ্যাঁ।

টম ক্যাপটেন বুড়োকে ধমক দিয়ে বলল—আপনি তো ভারি নেমকহারাম লোক মশাই! আমাদের তিনদিনের খাবার একবেলায় গিলে এবার রীতিমতো বেইমানি শুরু করলেন দেখছি। থাক্, ওই মিথেন গ্যাসের কথা আমাদের বলতে হবে না। আমরা খুঁজে বের করব'খন।

হ্যাস বলল—ওঁকে এখন বিরক্ত করা উচিত নয়। বিশ্রাম করতে দাও। মাথা আরো খানিকটা ঠিকঠাক হোক।

ডিক গজগজ করল—সব চালাকি বুড়োর। গিয়েসেপ্পো এমনি-এমনি তো জিভ কাটেনি ওর!

হ্যাস ক্যাপটেন বুড়োর কাঁধে হাত রেখে বলল—স্যার, আপনি শুয়ে পড়ুন। এদের কথায় কান দেবেন না।

বেনজেল্লো হ্যাসের কথায় শিশুর মতো বাধ্য হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে খালি মেঝেতেই শুয়ে পড়ল।

টম বলল—কিন্তু ওর গায়ের গন্ধে যে ঘরে টেঁকা দায় হচ্ছে। ওবেলা ওকে হ্রদের জলে আচ্ছাসে রগড়ে চান করাতে হবে।

ডিক বলল—এক কাঁড়ি সাবান লাগবে তাহলে। বাপ স্! এমন আজব জন্তু চিড়িয়াখানায় পাঠালেই তো ভাল হয়।

হ্যাস বলল—শোন স্যাঙাতরা, আর ফষ্টিনষ্টি নয়। বেনজেল্লোকে আমরা নিয়ে এসেছি, গিয়েসেপ্পো টের পেয়ে গেছে। এবার আমরা বেশ খানিকটা বিপদের মধ্যে পড়েছি, ভুলো না। কিচ্ছু বলা যায় না, সে হয়তো দলবল নিয়ে বন্দুকবাজী করতে আসবে। হুঁসিয়ার থাকা দরকার।

ডিক গোঁফে তা দিয়ে বলল—আসুক না, মুণ্ডু ঝাঁঝরা করে দেব।

টম বলল—মেলা বকো না। আমাদের ভাল অস্ত্র বলতে তিনটে মাত্র। ডিক, তুমি আর হ্যারি বেরিয়ে পড়ো বরং। বোট নিয়ে সোয়াকিনে চলে যাও। দি শার্ক বা হাঙর নামে যে রেঁস্তোরা আছে, তার মালিক ওয়েগার আমার বন্ধু। হ্যারির সঙ্গে তার আলাপ আছে। হ্যারি, তুমি গিয়ে ওকে বলো, অন্তত গোটা তিনেক ভাল রাইফেল আর প্রচুর কার্তুজ দাও। টম পাঠিয়েছে। ওয়েগার চোরা অস্ত্র-শস্ত্রের কারবারী, দাম চাইলে বলবে, টম দেবে। দেখো, ওর সংগে দরদাম নিয়ে তর্কাতর্কি কোরো না। ওয়েগার খুব চড়া মেজাজের লোক। ডিক, উঠে পড়ো এক্ষুনি।

হ্যারি বলল—ওয়েগার যা জিনিস। নগদানগদি কিছু মালকড়ি না পেলে ও ব্যাটা কিছুতেই রাজি হবে না, হলফ করে বলতে পারি।

টম বলল—আহা, আগে যাও না বাবা। গিয়ে দেখই না কী বলে?

হ্যারি বেঁকে বসল—পাগল না মাথা খারাপ। আমি বেশ জানি, ব্যাটা পয়সা না দেখলে মুখই খুলবে না।

টম কী বলতে যাচ্ছিল, হ্যাস বলল—দেখ টম, বরং এক কাজ করো। সোনার ইঁটটা ভেঙে খানিকটা দাও হ্যারির হাতে। ওটা জমা রেখে রাইফেল আনুক।

হ্যারি আর ডিক লাফিয়ে উঠল—বেড়ে বলেছ।

একটা চামড়ার ওপর সোনার ইঁটটা রেখে হাতুড়ি মেরে খানিকটা ছাড়াল টম। তারপর হ্যারি সেগুলো পকেটে পুরে বেরোল। ডিক তার সংগে চলল।

এই সময় হ্যাস লক্ষ্য করল, ক্যাপটেন বেনজেল্লো আড়চোখে সোনার ইঁটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ডিক ও হ্যারি চলে যাবার পর সে হঠাৎ উঠে বসল। তারপর সেই খড়িটা খুঁজে নিয়ে মেঝেয় লিখল—ওদের ফিরে আসতে বলো। তোমরা যেটাকে সোনা ভাবছ, তা সোনা নয়, একরকম নকল পাথুরে জিনিস।

হ্যাস ও টম চমকে উঠে বলল—সে কী! সোনা নয়?

বেনজেল্লো আগের লেখাগুলো মুছে লিখল—না। ওগুলো নকল সোনা। ওই ইটগুলোর কোন একটার মধ্যে একটা নক্সা আছে।

তু'জনে আরও চমকে রুদ্ধশ্বাসে বলল—কিসের নক্সা ?

বেনজেল্লো তখন হঠাৎ খড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। তাকে অনেক অনুরোধ করেও আর ওঠানো গেল না।

টম বলল—নক্সা! বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো ?

হ্যাস একটু হেসে বলল—টমভায়া! আশা করি, নকল সোনা শুনে তুমি খুব মনমরা হয়ে পড়েছ। নক্সাটা কিসের তা আমি বুঝতে পেরেছি। এখন শোন, শিগগির ডিক আর হ্যারিকে ফিরে আসতে বলো গে। তোমার বন্ধু ওয়েগার সম্ভবত আমাদের মতো অতটা বোকা নয়। নকল সোনা গছাতে গেলে হয়তো পুলিশে দেবে ওদের।

শুনে টম ভড়কে গিয়ে তক্ষুনি দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আর হ্যাসকে অবাক করে বেনজেল্লোও আবার উঠে বসল। তারপর সেই খড়িটা দ্রুত কুড়িয়ে খসখস করে লিখল—সাবধান, এই বেলেল্লা বোম্বেটে লোকে এক তিল বিশ্বাস করো না। বিপদে পড়ে যাবে। কাজ উদ্ধার করতে পারলে এরা তোমাকে মেরে ফেলতে দেরি করবে না।

হ্যাস হাসতে হাসতে বলল—সে আমি বেশ বুঝি ক্যাপটেন বেনজেল্লো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বেনজেল্লো লেখাগুলো মুছে আবার শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই তিনমূর্তিকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। সবাই যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসছে। টম গুহায় ঢুকেই রুদ্ধশ্বাসে বলল—ওহে, সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমাদের বোটটার পাত্তা নেই! সমুদ্রের চারিদিকে খুঁজে দেখলুম, একেবারে উধাও।

হ্যাস বলল—সে কী!

হ্যারি বলল—নির্ঘাৎ শয়তান গিয়েসেপ্পোর কীর্তি। তখন বললুম ডিককে, বোটটা কোথাও ভালভাবে লুকিয়ে রাখো। এখন ঠেলা বোঝ! এই বুড়োর মতো বাকি জীবন কাঁচা মাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচাও আর খোকস হয়ে পড়ো।

ডিক ভাঙা গলায় বলল—আহা! অমন সাধের বোটটা আমার, ও জিনিস আর পাব কোথায়!

টম ভয়ার্ত স্বরে বলল—এ কী সর্বনাশে পড়া গেল দেখ দিকি! এখন দ্বীপ থেকে যাবার উপায়ই বা কী হবে?

সবাই হতবুদ্ধি হয়ে চুপচাপ বসে রইল। প্রত্যেকের মুখে ভয়ের ছাপ পড়েছে। এই নির্জন প্রবাল দ্বীপের এত দুর্নাম, তাই কেউ এদিকটায় ভুলেও নৌকা বা লঞ্চ নিয়ে আসে না। চেঁচিয়ে মাথা খুঁড়লেও কোন উপায় নেই। সাঁতার দিয়ে সোজাসুজি দক্ষিণ বা উত্তর উপকূলের দিকে পাড়ি জমানো সহজ কথা নয়—দু' দিকেই লোহিত সাগর, এখানে দেড়শো মাইলের বেশি চওড়া। কিন্তু তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে, দ্বীপের চারধারের সমুদ্রে হাজার হাজার হিংস্র হাঙর আর বারাকুদা মাছের আড্ডা। তাছাড়া আছে অক্টোপাশ, অজগর জাতীয় সাপ আর মাকড়সার ঝাঁক। তাদের মুখ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কাজেই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে পড়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই।

ওরা বুঝতে পেরেছিল। শুধু হ্যাস অন্য একটা কথা ভাবছিল। গত কাল সন্ধ্যা থেকে তার কোন খোঁজ নেই। সোয়াকিনের ম্যাজিস্ট্রেট বিল হ্যাসের বন্ধু। সে কি এখনও চুপচাপ বসে থাকবে?

পরক্ষণে তার মনে হল, বিল তো চুপচাপ নিরুদ্বেগে বসেই আছে দেখা যাচ্ছে। তা না হলে এখনও কোন খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করছে না কেন? অদ্ভুত মানুষ তো বিল!

হ্যাসের খুব অভিমান হল। নাকি নিজে ইংরেজ বলে জার্মান-বন্ধুর বন্ধুত্বের মর্যাদা সে আসলে দিতে চায় না, শুধু মৌখিক ভদ্রতা দেখিয়েছে। হয়তো তাই হবে।

কিংবা ভেবেছে, হাঙরের পেটে চলে গেছে জার্মানটা, তাই নিশ্চিন্তে বসে আছে।

বিলের অদ্ভুত আচরণের মানেটা খুঁজে পাচ্ছিল না হ্যাস। কিন্তু একটা কিছু করা দরকার। সে ডাকল—টম!

টম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল -বলো খোকাবাবু।

রসিকতা ও ছাড়তে পারে না। হ্যাস একটু বিষণ্ণ হেসে বলল—শোন, এখন একটামাত্র উপায় হচ্ছে, সেই শয়তান গিয়েসেপ্পোর ওপর নজর রাখা। দ্বীপটা এমন কিছু বড় নয়। আমরা চারজন চার-দিকের পাহাড়ে বসে কড়া নজর রাখব। গিয়েসেপ্পোকে নিশ্চয় কোন সময় দেখতে পাব। সে তো সবসময় দ্বীপে থাকে না। মাঝে মাঝে আসে এখানে। ক্যাপটেন বেনজেল্লোর একথা সত্য হলে তাকে এই দ্বীপে নিশ্চয় বোটে চেপে আসতে হয়। আমার ধারণা, ওর সঙ্গীরা ওকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যায়। আবার কথামতো বোট নিয়ে আসে, তখন গিয়েসেপ্পো সুদানে চলে যায়। ক্যাপটেন বেনজেল্লো, তাই তো?

বেনজেল্লো শুয়ে সব শুনছিল। মাথা দোলাল। তার মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ পড়েছে। বেচারা ভেবেছিল, এবার দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবে।

হ্যাস বলল—তাহলে আমার অনুমানই ঠিক। গিয়েসেপ্পো নিশ্চয় ডিকের বোট নিয়ে পাড়ি দিয়েছে সুদানে। সম্ভবত দলবল নিয়ে ফিরে আসবে। কেন আসবে তাও অনুমান করেছি।

ডিক চাপা গলায় বলল—কেন?

—আমাদের হাত থেকে ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে কেড়ে নিতে। কারণ, উনি এখনও ওকে গ্যাসের শেলের খোঁজখবর দেননি।

টম রুখে উঠে বলল—আসুক না। ব্যাটার মুণ্ডু ফুটো করে দেব।

—টম, ওরা দলে যতজন থাক, প্রত্যেকে কিন্তু সশস্ত্র থাকবে।

হ্যারি বলল—কুছ পরোয়া নেই আসতে দাও।

হ্যাস দেখল, এরা এবার ভয়টা অনেক কাটিয়ে উঠেছে। এ সময় দমে গেলে প্রাণ বাঁচানো কঠিন হবে। তাই সে খুশি হল। বলল—ঠিক আছে। তাহলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যাক্। টমভায়া দূরবীণ নিয়ে উত্তর-পশ্চিম কোণের পাহাড়ে বসবে। কারণ ওদিক থেকেই গিয়েসেপ্পোর আসার সম্ভাবনা বেশি। আমি বসব

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায়। হ্যারি বসবে দক্ষিণ-পূর্বে আমাদের গুহার একেবারে ছাদের দিকে। আর ডিক বসুক উত্তর-পূর্বে খাড়ির ওপরে।

টম বলল—আর এই ক্যাপটেন বুড়ো?

—উনি গুহায় থাকুন। ক্যাপটেন, আপনি পাথরটা ভাল করে আটকে দিন। সাবধান, আমরা কেউ না ডাকলে খুলবেন না।

বেনজেল্লো মাথা নাড়ল। চারজনে বেরোল। টম কোমরে তার পিস্তলটা ঝোলাল। হ্যারিও তার রাইফেল নিল। পকেটে একগাদা গুলিও নিল। আর ডিক নিল জলবন্দুক। হ্যাস নিল মাত্র বল্লম আর হারপুন।

ওরা বেরোলে বেনজেল্লো পাথরটা গুহার মুখে শক্তভাবে আটকে দিল।

সুড়ঙ্গপথে দাঁড়িয়ে হ্যাস বলল—তাহলে হ্যারি, তুমি এখানেই উঠতে শুরু করো। একটা কথা বলে দিচ্ছি। মাঝে মাঝে আমরা পরস্পরের দিকে তাকাব। যদি কেউ সন্দেহজনক কিছু দেখ, ইশারা করবে প্রত্যেককে। কেমন?

হ্যারি সায় দিয়ে বিদায় নিল। এখন বিকেল। হ্রদের ধারে পৌঁছে বাকি তিনজন তিনদিকে চলল। সোনালি আলোয় শান্ত হ্রদের জল ঝলমল করছিল। প্রণালীর দিকটায় সূর্য সোজাসুজি প্রতিফলিত হচ্ছিল। সেদিকে তাকানো যাচ্ছিল না। হ্যাস দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় উঠতে শুরু করল। একেবারে উঁচু জায়গায় উঠে সে তাকাল সমুদ্রের দিকে। উমব্রিয়ার মাস্তলটা ছ'মাইল দূরে ঝিকমিক করছে। সমুদ্রের দৃশ্য এখন বড় সুন্দর। দিগন্তে সমুদ্রের জল প্রবাল-কীটের জন্যে একটু লালচে দেখাচ্ছে। তার ওপর বিকেলের রোদ পড়ে লালচে রঙটা ভেঙেচুরে অনেকগুলো রঙে যেন রামধনুর মতো ঝিকমিক করছে।

হঠাৎ হ্যাসের চোখ গেল তার ডাইনে দূরের দিকে। ওটা কি, একটা বোট না?…

॥ দশ ॥

চারমূর্তির কাণ্ডকারখানা

একটা সাদা বিন্দুর মতো ঝকঝক করছিল জিনিসটা। আস্তে আস্তে সেটা যত এগিয়ে এল, বিন্দুটা তত বড় হতে থাকল। তারপর ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। দুরু দুরু বুকে চাপা উদ্বেগ নিয়ে হ্যাস জিনিসটা দেখছিল। উমব্রিয়ার মাস্তুল থেকে অন্তত দু-মাইল উত্তরে জিনিসটা খুব জোরে এগিয়ে আসছে এবং সেটা একটা মোটর-বোটই বটে। হ্যাস মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ভাবল, যদি ম্যাজিস্ট্রেট বিল পাঠিয়ে থাকে তাদের উদ্ধারের জন্যে, তাহলেই মুক্তি। কিন্তু ওটা যদি শয়তান গিয়েসেপ্পোর হয়, তাহলে তো মহা সর্বনাশ! এই ক্ষুদে প্রবাল-দ্বীপে কতক্ষণ লুকিয়ে থাকা সম্ভব হবে তাদের চোখের আড়ালে! খুঁজে ওরা বের করবেই। তাছাড়া গিয়েসেপ্পোর সঙ্গে লোকজন নিশ্চয় থাকবে।

হ্যাস ডাইনে উত্তর-পশ্চিম কোণায় টমের দিকে তাকাল। টম দূরবীণটা চোখে দিয়ে এতক্ষণ বসেছিল। তারপর সে হ্যাসের দিকে ঘুরে হাত নাড়তে থাকল। হ্যাঁ, বোটটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক-গুলো লোক দেখা যাচ্ছে বোটে। হ্যাস পিছনে ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় হ্যারিকে হাত নাড়ল। হ্যারি তার আগেই টমের ইশারা টের পেয়েছে। সে নেমে আসছে। উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড় থেকে ডিককেও দৌড়ে ও ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে পাথরে ধাপ ডিঙোতে দেখা গেল। সবাই এখন টমের কাছে হাজির হতে চায়।

হ্যাসের অসুবিধে একটু বেশি। দশ-বারো গজ চওড়া প্রণালীটা তাকে পেরিয়ে উত্তরে যেতে হবে। প্রণালীটা গভীর, সে অবশ্য বড় সাঁতারু। পেরিয়ে যেতে বেশি সময় লাগল না। হ্যারি এসে গেল পূব আর উত্তর ঘুরে। পথে তার সঙ্গে ডিকের দেখা হল। দু'জনে

দৌড়ে টমের কাছে এগোল। পাহাড়টা খানিক ঢালু ওখানে, তারপর বাকিটা বেশ খাড়া। টম কী কৌশলে চড়ে বসেছিল কে জানে। ডিক ধপাস করে দশ ফুট নিচে পড়ে গেল। বেচারার শরীরটা প্রকাণ্ড জালীর মতো। সামলানো কঠিন। এবার হ্যারি তাকে ঠেলে তুলে দিলে একটা খাঁজে। ততক্ষণে হ্যাস গিয়ে পৌঁছাল সেখানে। ওপর থেকে টম প্রচণ্ড হাত-পা নাড়ছে। চাপা গলায় ডাকছে। কিন্তু খাড়া দেয়ালের মতো জায়গাটা বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ডিক ওপরের খাঁজে পা দিয়ে গিরগিটির মতো আরেকটা খাঁজ হাতড়াচ্ছে পা বাড়িয়ে। নিচে হ্যারি নির্দেশ দিচ্ছে—বাঁয়ে, বাঁয়ে! ডিকের বাঁ-পা কাঁপতে কাঁপতে বাঁদিকে এগোচ্ছে আবার পিছিয়ে আসছে।

দৃশ্যটা হাস্যকর। কিন্তু এখন হাসির ব্যাপার নয়, জীবনমরণ সমস্যা। হ্যাস খুঁজছিল, কোন্ পথে টম ওখানে উঠেছিল! হঠাৎ তার চোখে পড়ল, ডিকের হাত তিনেক তফাতে ছোট-বড় অনেক খোঁদর রয়েছে। দেখলে মনে হয়, কামানের গোলায় ওইসব গর্ত হয়ে গেছে। আসলে ওগুলো পাখির বাসা। হ্যাস চেঁচিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল ডিককে। তারপর নিজে সেদিকে তরতর করে উঠতে থাকল। ডিকের আগেই সে ওপরের চাতালে পৌঁছে গেল, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল।

সেই সময় হ্যারি চেঁচিয়ে উঠল—সাপ! সাপ!

ডিক হাত ছেড়ে দিতেই ফের ধপাস করে পড়ল নিচে। হ্যাঁ, সত্যিই সাপ। একটা গর্ত থেকে মুণ্ডু বাড়িয়ে প্রকাণ্ড সাপটা বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। তার লাল জিভটা লকলক করছে। ওপর থেকে হ্যাস উঁকি মেরে সাপটা দেখে শিউরে উঠল। এগুলো উভচর সাপ। জলেও থাকে, ডাঙাতেও থাকে। বিষ নেই। কিন্তু কামড়ে মাংস তুলে নিতে পারে এবং শরীরের কোথাও প্যাঁক দিয়ে মড়মড় করে হাড়গোড় ভেঙে দিতেও পারে। সাপটা বেরিয়ে দড়দড় করে নেমে পালিয়ে গেল।

ডিক নিচে রয়ে গেল। হ্যারি মরিয়া হয়ে উঠে পড়ল হ্যাসের

সাহায্যে। বলল—ডিকের ওঠার দরকার নেই। বরং ডিকভায়া, ওখান থেকে হ্রদের দিকটা লক্ষ্য রাখো। অস্ত্রটাও তৈরি রাখো। শত্রুর মুণ্ডু দেখলেই ফুটো করে দেবে।

ওপরে গিয়ে একটা পাথরের আড়াল থেকে ওরা দেখল, বোটটা দ্বীপের পশ্চিম দিকটা ঘুরে কোণার প্রণালীটার কাছে যাচ্ছে, যেটা হ্যাস পেরিয়ে এসেছে একটু আগে। বোটে মাত্র চারজন লোক আছে। তাদের পোষাক দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তারা সরকারী লোক মোটেই নয়। প্রত্যেকের বুকে আড়াআড়ি ভাবে কার্তুজের বেল্ট বাঁধা, হাতে রাইফেল। যে লোকটা বোট চালাচ্ছে, তার সামনে একটা কাঠের টবে বসানো জিনিসটা দেখেই টম অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—সর্বনাশ! ওদের মেসিনগান আছে দেখছি! কী চায় ওরা?

হ্যাস ফিসফিস করে বলল—হ্যাঁ, লাইট মেসিনগান! ওরা যে গিয়েসেপ্পো আর তার সঙ্গীরা, তাতে কোন ভুল নেই।

হ্যারি তার রাইফেলটা তাক করে বলল—শিগগির বলে দাও কোন্ ব্যাটা শয়তান গিয়েসেপ্পো? তার মুণ্ডুটা ফুটো করে দিই।

হ্যাস তার রাইফেলের নলটা ধরে বলল—চুপ! খবরদার ও কাজ করো না এখন। কে গিয়েসেপ্পো আমি চিনি না, তোমরাও কেউ চেনো না। আমি তাকে তিমিমাছের পোষাকে দেখেছিলুম, চেনার উপায় ছিল না।

টম বলল—আমার হুকুম না পেলে গুলি ছুঁড়বে না। আগে দেখা যাক ওরা কী করে।

হ্যাস পিছিয়ে হাঁটু গেড়ে হ্রদের দিকে এসে নিচে ফিসফিস করে ডিককে বলল—শুয়ে পড়ো ডিক। ওরা প্রণালী দিয়ে ঢুকছে। সাবধান, যেন তোমাকে দেখতে না পায়।

বেচারা ডিক অমনি শুয়ে পড়ল। একটা ঢিবির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে মুণ্ডুটা বের করে রাখল। ওর টুপিটার রঙ ধূসর। তাই ওকে দূর থেকে মানুষ বলে চেনা কঠিন হবে।

বোটটা প্রণালীর দিকে গেলে পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ল।

কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর সেটা হ্রদে ঢুকছে দেখা গেল।

এবার টম, হ্যাস আর হ্যারি ঝটপট নিজেদের লুকিয়ে ফেলল পাথরের আড়ালে। বোটটা সোজা গিয়ে হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় ভিড়ল। টম বলে উঠল—সর্বনাশ! ওরা কি পাইরেটস কেভে হানা দিতে যাচ্ছে? ওখানে গেলেই তো ক্যাপটেন বুড়োকে পেয়ে যাবে।

হ্যাস চিন্তিতভাবে বলল—তাই তো দেখছি!

হ্যারি ওর ওপর রেগে গিয়ে বলল—যাই বলো, তোমার জার্মান-বুদ্ধির গলায় দড়ি! বেনজেল্লোকে ওরা হাতালেই আমাদের কপালে লবডঙ্কাটি জুটবে! ছ্যা-ছ্যা, তোমার কথায় পড়ে টম ভায়াও বুদ্ধু বনে গেল।

হ্যাস বলল—আমি দুঃখিত, ভাই হ্যারি। এমন সরাসরি ওরা হানা দিতে যাবে ভাবিই নি। আমাদের উচিত ছিল, এক্ষুনি কোন গোপন পথে ওই গুহাতে গিয়ে…

বাধা দিয়ে টম বলল—ধুত্তোর! এতক্ষণ গেলে না কেন?

হ্যাস একটু হেসে বলল- বোট দেখে আমরা প্রত্যেকেই তো ঘাবড়ে গিয়েছিলুম, টম। গুহায় চলে যাওয়ার কথা মাথায় আসেনি।

হ্যারি ঘোঁত-ঘোঁত করে বলল—তার ফল ভোগ এবার। তবে আমার স্পষ্ট কথা, যদি বেনজেল্লো বুড়োকে ওরা হাতায়, তোমার মুণ্ডুটি আমি ফুটো করব, স্যাঙাত।

বোটটা বাঁধা রইল হ্রদের কিনারায়। বন্দুকবাজরা চলে গেল। মনে হল, সুড়ঙ্গ পথটা ওরা চেনে। একটু পরে ওরা অদৃশ্য হতেই হ্যাস লাফিয়ে উঠল—নেমে এস শিগগির। এক মুহূর্তও আর দেরি নয়। আগে আমাদের ওই বোটটা হাতাতে হবে। তারপর যা করার বলব। ডিক, ডিক! তুমি আগে দৌড়ে চলে যাও বোটটার কাছে।

এরা তিনজনে নামবার আগেই ডিক এক লাফে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল নীচে হ্রদের কিনারায়। তারপর পূর্বমুখে দৌড়তে শুরু করল।

কিনারায় একগজেরও বেশি চওড়া সমতল জমি থাকায় হ্রদটা চক্কর দেওয়ার অসুবিধে নেই। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রণালীটা পেরোতে যা ঝক্কি। তবে ওদিকে যাবার দরকার কী? পূব পাড় ঘুরে গেলেই তো বোটের কাছে পৌঁছানো যায়।

হ্যাস, টম আর হ্যারিও দৌড়াচ্ছিল, ডিক অনেকটা আগে। বোটের কাছে পৌঁছেই ডিক দু'হাত তুলে নাচতে লাগল। বোঝা গেল বোটটা তারই, সেই হারানো ধন। প্রণালীর পথে ডুবন্ত সূর্যের শেষ আলো ওর মুখে পড়েছে। ওর বড়বড় দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। নিঃশব্দে হাসছে ডিক। হাসতে হাসতে বোটে গিয়ে বসেও পড়েছে।

দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনজনে বোটটার কাছে হাজির হল। হ্যাস চাপা স্বরে বলল—খবর্দার ডিক, বোটে ষ্টার্ট দিতে যেও না। এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাবে ওরা। তুমি বোট ছেড়ে চলে এস। তারপর দড়ি ধরে ওটা টানতে টানতে উত্তর-পূর্ব কোণায় চলে যাও। ওই যে পাথরের খাঁজটা হ্রদের ধারে উঁচু হয়ে আছে, ওর আড়ালে লুকিয়ে রাখো। তারপর ঝটপট চলে এসো। হ্যারি, ওকে সাহায্য কর।

ডিক আর হ্যারি কথামতো দড়ি ধরে মোটর-বোটটা টানতে টানতে নিয়ে চলল। তারপর ঠিক জায়গায় ওরা লুকিয়ে রেখে দৌড়ে ফিরে এল।

সেই মুহূর্তে আচমকা কোথায় হুলুস্থুল বেধে গেল। প্রথমে কয়েকবার রাইফেলের গুলির শব্দ, তারপর একটানা মিনিটখানেক ধরে টাট্ টাট্ টাট্ টাট্…নির্ঘাৎ মেসিনগান চালাচ্ছে ওরা।

চারজনে দৌড়ে সুড়ঙ্গ পথটার উঁচু দেয়ালটার মাথায় গিয়ে হাজির হল। কিছু দেখা যাচ্ছে না ওখান থেকে। তবে আন্দাজ করা যায় কী ঘটছে। পাইরেটস কেভের পাথরটা বাইরে থেকে সরানো যায় না, এমনি কৌশলে আটকাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিতর থেকে ঠেলে সরানো খুবই সহজ অবশ্য। গিয়েসেপ্পোরা

নিশ্চয় দরজাটা মেসিনগানের গুলিতে ফাটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সেটা অসম্ভবই হবে। ওই প্রকাণ্ড পাথরটা প্রবাল-কীটের তৈরি নয়, আস্ত পাথর···ইস্পাতের মতো শক্ত। তবে গুহার মুখে গুলি লাগলে প্রবালপিণ্ড খসে পড়ার আশঙ্কা আছে। এর ফলে মুখটা বড়ো হয়ে যেতে পারে এবং তখন পাথর ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা সহজ হবে।

চারজনে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে রইল। ওপরে-ওপরে এগিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে। যে কোন মুহূর্তেই ওদের চোখে পড়ে যাবে। টাট্··· টাট্···টাট্···সামনে গর্জাচ্ছে মেসিনগানটা। মনে হচ্ছে, গিয়ে-সেপ্পোরা পাগল হয়ে উঠেছে। এই পুরনো গুহাটা ধ্বংস না করে ক্ষান্ত হবে না।

কিন্তু তাহলে যে বুড়ো ক্যাপটেনও মারা পড়বে। তখন আর কে দেবে তাকে মিথেন গ্যাসের শেলগুলোর খোঁজ? হ্যাস এসব ভাবছিল। তার মনে হল, আর যাই করুক প্রাণে বুড়োকে মারবে না গিয়েসেপ্পো। এতকাল তো মারেনি।

এতক্ষণে গুলির শব্দ হল। তারপর আর কোন সাড়া নেই। টম ফিসফিস করে বলল—ব্যাটাচ্ছেলেরা এ পথেই তো ফিরে আসবে। তখন আমরা ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব। অস্ত্রগুলো কেড়ে নেব। প্রত্যেকে তৈরী হও।

হ্যাস বলল – কিন্তু···

টম চোখ পাকিয়ে বলল—না, কোন কিন্তু টিন্তু নয়। তোমার পাল্লায় পড়ে আর তোমার বুদ্ধি নিয়েই দেখছি যত বিপদ ঘটছে। ডিক, হ্যারি! তৈরি তো? ওরা চারজন আমরা চারজন। আমি শিস দিলেই ঝাঁপ দেবে। গলা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেবে। প্রথমে শ্বাসনালীতে একটা মারাত্মক টিপুনি দিলেই হাতদুটো অবশ হয়ে পড়বে।

হ্যারি তার রাইফেলটা পিঠে আটকে নিল। মাটিতে হাত দুটো ঘষল। দেখাদেখি টম আর ডিকও তাই করল। হ্যাস দেখল—

এরা কোন কথা শুনবে না। বড্ড গোঁয়ার লোকগুলো। তবে টম যা করতে বলছে, তাতে ওর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়! এর নাম হল, গেরিলাপদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সেনা দলকে ভড়কে দেওয়া যায়। হ্যাসও মাটিতে ঘষে হাত দুটো তৈরি করে নিল।

কিন্তু তখনও ওদের পাত্তা নেই। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আকাশে নক্ষত্র ফুটল। দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে এল। অথচ আর কোন সাড়া শব্দ নেই। ব্যাপার কী?

হ্যাস ফিসফিস করে বলল – ওরা নিশ্চয় আমাদের গুহায় গিয়েছে। সম্ভবত ক্যাপটেন বেনজেল্লোর ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। টম, বরং এভাবে অপেক্ষা না করে চলো আমরা চুপিচুপি গুহার কাছে যাই।

টম বলল—ঠিক বলেছ। অন্ধকার হয়ে গেল। এখানে বসে থাকলে আর নামবার পথ খুঁজে পাব না। ডিক, হ্যারি। উঠে পড়ো।

চারজনে যে পথে উঠেছিল, সাবধানে আস্তে আস্তে নেমে এল। অন্ধকার এখন বেশ ঘন হয়েছে। সুড়ঙ্গ পথে ঢুকল ওরা। তখন আর কেউ কাউকে দেখতে পেল না। এত বেশি অন্ধকার জমে উঠেছে সেখানে যে পরস্পরকে ছুঁয়ে ওরা পা টিপে টিপে এগোতে থাকল। টর্চ আছে হ্যারির কাছে কিন্তু জ্বালতে গেলেই তো শত্রুদের চোখে পড়ে যেতে পারে।

একটু পরে সুড়ঙ্গপথের শেষ বাঁকটায় ওরা থামল। হ্যাস উঁকি-মেরে দেখে বলল—কী কাণ্ড! ব্যাটারা দেখছি হ্যাসাগ জ্বেলেছে!

বাঁক ছাড়িয়ে পা বাড়াতেই পাথরের ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে দেখা গেল। হ্যাঁ, ওরা পাথরটা সরাতে পারেনি। কিন্তু গুলির আঘাতে গুহার বাঁ দিকটা অনেকখানি ফাটিয়ে ভিতরে ঢুকেছে।

হ্যাসের ইসারায় প্রত্যেকে গুঁড়ি মেরে এগোল। টম ফিসফিস করে বলল—ব্যাটারা ভেবেছে কী! আমাদের ঘর দখল করে আমাদেরই হ্যাসাগ জ্বেলে স্ফূর্তি করছে!

হ্যাঁ, স্ফূর্তি করছে, তাতে কোন ভুল নেই। এক পাঁটরা সরাব ছিল। ফাঁকে চোখ রেখে দেখা গেল, বোতলগুলো থেকে চোঁ-চোঁ করে চার বদমাস বেদম সরাব গিলছে। আর বেচারা বেনজেল্লোকে পিঠমোড়া করে বেঁধে কোণার দিকে ফেলে রেখেছে।

সরাব নিকেশ করতে দেখে ডিক ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল আর কী? হ্যারি তার মুখ চেপে ধরল। তখন টম ফিসফিস করে বলল—আহা রে! খাবারগুলো ব্যাটারা মেরে দিচ্ছে।

হ্যারি রাইফেলটা খুলে ফোকরে নলটা রাখতেই হ্যাস ওকে ইশারা করল। ফিসফিস করে বলল—না, না। আগে দেখা যাক, ওদের কাণ্ডটা।

রাইফেলগুলো পাশে ফেলে রেখেছে ওরা। মেসিনগানটাও একপাশে রেখেছে। হ্যাস খুঁজছিল, কোন লোকটা গিয়েসেপ্পো।

ততক্ষণে সরাব সব সাবাড় করে ফেলেছে ওরা। বান-রুটিতে জেলি মাখিয়ে কামড় দিচ্ছে। তারপর একজন বলল—স্যাঙাতরা গেল কোথায় বলো তো হে! এখনও পাত্তা নেই। আমার হাত যে নিসপিস করছে।

আরেকজন বলল, মনের দুঃখে জলে ডুবে মরেছে।

অন্য একজন বলল—ব্যাটাদের আয়োজনটা দেখছ! ভেবেছিল, উমব্রিয়ার সম্পত্তি হাতিয়ে দিব্যি ফুড়ুৎ করে কেটে পড়ব সেগুড়ে বালি! গিয়েসেপ্পোভায়া, আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

একটা লোক লাল চোখে তাকিয়ে ধমক দিল—হইহল্লা করো না। নিকি, তুমি টর্চ নিয়ে একবার উঁকি মেরে বাইরেটা দেখ তো।

তাহলে ওই গিয়েসেপ্পো! বড়বড় চুল, গোঁফ, খোঁচাখোঁচা বিচ্ছিরি দাড়ি—বাঘের মতো তুম্বো মুখ! লোকটার ছাতি চওড়া, হাতগুলোও মস্তো লম্বা। দানব বলা যায়। বেনজেল্লোর মতোই স্বাস্থ্য, তবে বয়স ওর চেয়ে কম।

নিকি টর্চ নিয়ে টলতে টলতে গুহার দরজার দিকে আসছে। এরা তক্ষুনি গুহামুখের প্রকাণ্ড পাথরটার নিচে বসে পড়ল। একেবারে

সেঁটে রইল পাথরটার সঙ্গে। যদি পাশের ফোকর গলে নিকি বেরিয়ে আসে, তাহলেই বিপদ। হ্যাস ফিসফিস করে বলল হ্যারিকে—তৈরি থেকো।

কিন্তু না, নিকি ভিতর থেকে উঁকি মেরে সুড়ঙ্গপথে টর্চের আলো ফেলল। এরা ওর নিচেই রয়েছে, তাই দেখতে পেল না।

নিকি সরে গেল—নাঃ! কেউ কোথাও নেই।

গিয়েসেপ্পো বলল—নাহলে গেল কোথায় ব্যাটারা?

কে জবাব দিল—তখন বললুম না! সোয়াকিনের ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর একটা লঞ্চ পাঠিয়েছে উমব্রিয়ার দিকে, সেই জার্মান ডুবুরিটার খোঁজে।

গিয়েসেপ্পো বলল—লঞ্চ-টঞ্চ তো আমরা দেখতে পেলুম না।

—আরে, সে তো দুপুর বেলার খবর। লঞ্চ আমরা আসার আগেই ফিরে গেছে। আমরা বেরিয়েছি পাঁচটা নাগাদ। এর মধ্যে জার্মানটাকে দ্বীপ থেকে নিয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব।

—তাহলে বোম্বেটে বদমাসগুলোও কি লঞ্চে কেটে পড়ল?

—আলবাৎ। তবে নিজে থেকে কেটে পড়েনি। বোঝা যাচ্ছে, ওদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তিন ব্যাটাই তো ফেরারী আসামী!

টম ফিসফিস করে গাল দিল—তোর কর্তাবাবা ফেরারী আসামী।

হ্যাস ভাবছিল, তাহলে বিল তার খোঁজে লঞ্চ পাঠিয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত লঞ্চের লোকগুলো তো। ভাল করে না খুঁজেই ফিরে গেল! সম্ভবতঃ তারা যখন ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তখনই লঞ্চটা এসে উমব্রিয়ার আশেপাশে দায়সারা গোছের তল্লাস চালিয়ে কেটে পড়েছে। সরকারী লোকজনের কারবারই এইরকম। ওদের মাথায় আসা উচিত ছিল যে ভাসতে ভাসতে এই প্রবাল-বলয়ে আশ্রয় নিতে পারে হ্যাস।

ভিতরে এবার নিকের গলা শোনা গেল—আরে, একটা গিটারও এনেছে দেখছি ব্যাটারা। বাঃ! ভারি তুখোড় স্যাঙাত ছিল তো ওরা। হো-হো! কী আনন্দ, কী আনন্দ!

তারপর গিটারের বাজনা শোনা গেল। গিয়েসেপ্পোর ধমকেও কোন ফল হল না। নেশায় ওরা হুল্লোড় করতে ব্যস্ত। হেঁড়ে গলায় কে গানও গেয়ে উঠল :

ম'মদোখুড়োর বোনের ছেলে
গেল আলেপ্পোতে
আড়াই ডলার খরচ করে
বউ কিনেছে ভাই.
হো-হো বউয়ের নামটা কী
সেটা আস্ত এক ডাইনি
হাড় মটমট চিবিয়ে খায়
নঝুম নিশিরাতে
হো-হো গেল আলেপ্পোতে
· হোঃ হোঃ হো হো! হোঃ হোঃ হো হো।

কোমর দুলিয়ে নাচ জুড়ে দিল সবাই। দেখা গেল, গিয়েসেপ্পোও নাচছে। এত আনন্দের কারণ কী? তাহলে কি বেনজেল্লো ওদের নক্সাটার খবর দিয়ে ফেলেছে?

হ্যারি উসখুস করছিল। এবার চমৎকার সুযোগ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। কিন্তু হ্যাস বাধা দিল, এখনও সময় হয়নি।

বিষণ্ণ হয়ে হ্যারি বসে রইল। ওদিকে নাচ-গান তুমুল চলেছে। কতক্ষণ পরে নাচগান থামল। তিনজন ধপাস করে বসে পড়ল। বোঝা গেল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গিয়েসেপ্পো ঘড়ি দেখে বলল—আর দশমিনিট পরে আমরা বেরোব। তোমরা আমাকে বোটে করে উমব্রিয়ায় পৌঁছে দেবে। কাছাকাছি বোট নিয়ে অপেক্ষা করবে। সোনার ইঁটগুলো আমি বয়ে নিয়ে বোটে পৌঁছে দেব। আরেকজন ডুবুরি পেলে ভাল হ'ত। যাক্‌গে কাজটা করতে হবে, উপায় কী? তারপর চলে আসব এই গুহায়। বেনজেল্লোবুড়ো, শোন, ইঁটের ভেতর নক্সাটা না বেরোয়, আজ তোমার দফারফা হবে; এখনও বলছি।

কথাটা শেষ হতেই হ্যাস ফিস ফিস করে বলল—তোমরা আমার সঙ্গে চলে এস শিগগির।

টম, হ্যারি, ডিক ওকে অনুসরণ করল। হ্রদের ধারে গিয়ে হ্যাস বলল হ্যারি, ডিক, বোটটা নিয়ে এসে যেখানে ছিল সেখানে রেখে দাও। জলদি···ওরা এসে পড়ল বলে।

টম বলল—কী সে!

—যা বলছি করো। হ্যারি, আর সময় নেই।

হ্যারি গোঁ ধরে বলল—না, ওরা কি আমাদের বড় কুটুম্ব?

ডিক রেগে গিয়ে বলল—আমার বোট ওদের দেব? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? এই বোট কিনতে আমার বউয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ হয়েছিল।

হ্যাস বলল—আঃ! বুঝতে পারছ না তোমরা? ওদের দিয়েই আমরা কাজ বাগাব।

অমনি টম বুঝে ফেলল। হ্যারি ও ডিকও অবশ্য বুঝল। কিন্তু খুঁতখুঁতে মন নিয়ে ওরা এগোল।

টম বলল—নাঃ, তোমার বুদ্ধি আমাদের চেয়ে ঢের বেশি, হ্যাস-ভায়া।

একটু পরে মোটরবোটটা টানতে টানতে নিয়ে এল হ্যারি ও ডিক সেটা আগের জায়গায় একইভাবে আটকে রেখে তক্ষুনি আড়ালে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টর্চের আলো দেখা গেল সুড়ঙ্গপথের মধ্যে। তারপর আলোটা হ্রদের জলে বোটের ওপর পড়ল। ওরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে এসে বোটে চেপে বসল একে-একে। তারপর বোটটা আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল।

তখন হ্যাস বলল—এখন আমরা গুহায় যাব না। যতক্ষণ ওরা না ফেরে চুপচাপ এখানে বসে অপেক্ষা করব, তারপর কী করতে হবে বলে দেব।

॥ এগার ॥

মহাপ্রলয়ের পরে

রাত তখন দশটা। বসে থাকতে থাকতে ওদের শরীরে ব্যথা ধরে গেল। তবু গিয়েসেপ্পোদের ফেরার নাম নেই। এতক্ষণ ধরে কী করছে ওরা? হ্যাস বলল—তবে কি গিয়েসেপ্পো অধৈর্য হয়ে ইঁটগুলো বোটে বসেই ভাঙতে শুরু করেছে নক্সার লোভে?

টম বলল—তাই মনে হচ্ছে! নক্সা হাতিয়ে গ্যাসের সেলগুলো জাহাজের কোথায় আছে খুঁজে বের করবে। সেটাই তো সুবিধে, দু'বার হয়রান হতে হবে না।

হ্যাস একটু ভেবে নিয়ে বলল—তাহলে বরং চলো, আমরা পশ্চিম-পাড়ের উঁচু পাহাড়টায় গিয়ে বসি কোথাও। বোট এলে দেখতে পাব।

—সেই ভাল। বলে, টম উঠে পড়ল।

চারজনে উত্তর দিকটা ঘুরে হ্রদের পশ্চিমপাড়ে উঠতে শুরু করল। এখন টর্চ জ্বালার অসুবিধে নেই।

পাহাড়টা এদিকে ঢালু। দৌড়েই ওঠা যায়। বড় জোর একশো ফুট মাত্র উঁচু। চূড়োয় পৌঁছে টম বলল—হুঁ, বোটটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওই দেখ, আলো জুগজুগ করছে।

হ্যাস কী বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। আচমকা পশ্চিম দিগন্তে সম্ভবত উমব্রিয়ার ওখানে একটা বিশাল আগুনের গোলা সমুদ্র থেকে লাফিয়ে উঠল। মনে হল, যেন অসময়ে পশ্চিমে সূর্য উঠছে! এ কি কোন মহাপ্রলয়ের সূচনা? তারপর আবার একটা প্রকাণ্ড লাল গোলা জল থেকে উঠে আগের গোলাটার সঙ্গে মিশে গেল। তারপর আবার···আবার···একটা করে গোলা উঠছে আর ক্রমে সারা দিগন্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারপরই জেগে উঠল একটা প্রচণ্ড

আওয়াজ। যেন হাজার হাজার বাজ পড়ল এবং মেঘ ডাকতে থাকল। এতদুর থেকেও সেই আওয়াজে কানে তালা ধরার উপক্রম হল এদের। টম বলে উঠল—ও কী! ও কিসের আগুন? কিসের শব্দ?

কেউ জবাব দিল না। আগুনের ছটায় সারা সমুদ্র ঝলমল করে উঠেছে। আর সেই বিশাল লাল গোলার মাথায় চাপচাপ কালো মেঘ পাহাড়ের মতো আকাশে উঠতে শুরু করেছে। এরা রুদ্ধশ্বাসে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকল সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়ের দৃশ্য।

তারপর হঠাৎ কোত্থেকে আগুনের হল্কার মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রচণ্ড ঝড়। গায়ে ফোস্কা পড়তে থাকল যেন। হ্যাস লাফিয়ে উঠল—পালাও, পালাও। উমব্রিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটেছে! শিগগির গুহার দিকে চল সব।

চারজনে দৌড়ে নামতে শুরু করল। মোটামানুষ ডিক গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে গিয়ে পড়ল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—হ্যারি! আলো দেখাও, আলো!

ওকে ধরে ওঠাল টম। তারপর হ্রদের উত্তর পাড় হয়ে দৌড়ে চলল। ঝড়টা তখন হু-হু করে প্রণালীর পথে হ্রদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। জলে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে।

সুড়ঙ্গ পথে পৌঁছবার সময় হ্যারি ঘুরে আলো ফেলল হ্রদের দিকে। সবাই থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্যে। হ্রদের জল ফুলে ফেঁপে পাড়ে উঠে পড়েছে। আবার দৌড়তে থাকল ওরা। গুহা অনেক উঁচুতে। কিন্তু তাহলেও বলা যায় না, সমুদ্রের জল ঠেলে হ্রদে ঢুকছে। বন্যায় দ্বীপটা তলিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

ফোঁকর গলিয়ে আগে ঢুকল হ্যাস। হ্যাসাগটা জ্বলছিল। প্রথমে সে পকেট থেকে ছুরি বের করে বেনজেল্লোর কেটে দিল। তারপর বলল—ক্যাপটেন চলে আসুন। বান আসছে। গুহাটা ডুবে যেতে পারে! টম, হ্যারি, ডিক! তোমরা যে যা পারো, তোমাদের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। গুহার ওপরকার পাহাড়ে গিয়ে

আশ্রয় নাও! আমি ক্যাপটেনকে নিয়ে যাচ্ছি!

ওরা সাধ্যমত জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে রাখল। তারপর পালা করে ওপরে নিয়ে গেল। হ্যাস ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে ধরে আস্তে আস্তে এগোল। বেচারাকে যথেষ্ট মার দেওয়া হয়েছে আবার। পা বাড়াতে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

হ্যাস যা ভেবেছিল তাই। হ্রদের জল হু-হু করে সুড়ঙ্গপথে চলে আসছে।

ওপরে গিয়ে ওঠার পর দেখা গেল, পশ্চিমের সমুদ্রে সেই টকটকে লাল আগুনটা এখন ফিকে হয়ে গেছে। তবে উৎকট গন্ধ আসছে কিসের? ঝড় কিছুটা কমেছে। কিন্তু সমুদ্রের কল্লোল আরো বেড়ে গেছে। বিস্ফোরণের চাপে চারদিকের জল ফেঁপে উঠেছিল। শান্ত হতে দেরি হবে। আকাশে তারাগুলো ঢেকে সেই বিশাল মেঘটা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হ্যাসাগের আলোটা ওপরে আনা হয়েছে। তার আলোয় দেখা গেল, ক্যাপটেন বেনজেল্লো নিঃশব্দে হাসছে। হ্যাস বলল—ওই বিস্ফোরণ কিসের ক্যাপটেন?

বেনজেল্লো পাথরের ওপর লিখে বলার ইশারা করল। খড়িটা গুহাতেই পড়ে আছে। তখন ডিক একটুকরো পাথর কুড়িয়ে দিল ওর হাতে। লালরঙের এই পাথরগুলো আসলে প্রবাল-কীট জমে তৈরী হয়েছে। কতকটা শুকনো লাভার মতো। বেনজেল্লো লিখতে শুরু করল:

পাপী গিয়েসেপ্পো তার শাস্তি পেল। এ চক্রান্ত আমারই। ইঁটের মধ্যে দুটো নক্সা ছিল। একটা নক্সার উল্টোপিঠে অদৃশ্য কালিতে আরেকটা নক্সা আঁকা ছিল। যেটা দৃশ্য-নক্সা, সেটায় মারাত্মক জায়গায় গিয়ে পড়ার হদিস আছে। সেখানে গিয়ে একটা আংটা টানাটানি করলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। আর অদৃশ্য নক্সায় মিথেনের শেল যে কুঠুরিতে আছে, সেখানে যাবার আংটা কত নম্বর তা লেখা রয়েছে। এই আংটা টানলে একটা দরজা খুলে যাবে।

গিয়েসেপ্পোকে ইচ্ছে করলে অনেক আগেই এভাবে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারতুম। দিইনি। তার কারণ, আমি চেয়েছিলুম, ওই গ্যাসের শেলগুলো নষ্ট হওয়ার চাইতে মানুষের উপকারে লাগুক। এমন কাকেও ওই হদিস দিতুম, যে ডাকাত বা বদমাস নয়, হ্যাসের মতো একজন মানুষ। হ্যাসকেই আমি খোঁজ দিতুম। তার আগেই গিয়েসেপ্পো এসে পড়ল। আমার ওপর অত্যাচার শুরু করল। তখন রাগের বশে ভাবলুম, ও ধ্বংস হয়ে যাক।

হ্যাস বলল—কিন্তু কতকগুলো রহস্যের সমাধান হল না ক্যাপটেন। দুটো কংকাল, মাস্তুলের নাচ, অট্টহাসি, সমুদ্রের জলে তোলপাড়, প্রচণ্ড গর্জন, আর একটা কালো পাঁচিল—এগুলো কী? তাছাড়া নীল সব আলো জ্বলতেও দেখেছি। সেগুলো কিসের?

বেনজেল্লো আগের লেখা মুছে দিয়ে লিখল:

...সব গিয়েসেপ্পোর কারসাজি। ও নিজে ছিল পাকা ডুবুরি। খুব মাথাওলা কারিগরও বটে। আমাকে সব বলেছিল সে। ওগুলো করার কারণ, ট্রিমব্রিয়ার শেলগুলো হাতাতে কেউ সাহস পাবে না এবং ভূতের গল্প ছড়াবে। কংকাল দুটোর মধ্যে স্প্রিং রয়েছে। জাহাজের ডেকে কেউ ডুবে গিয়ে রেলিঙে হাত রাখলেই একটা কংকাল লাফিয়ে উঠে সামনে আসবে। আর অন্যটা রেখেছিল নাকি এঞ্জিনরুমের তলায়, ইঁটগুলোর খোঁজ সে পায় নি। এবার বলছি, গর্জনটা কিসের? ভেসে থাকলে গর্জন কিন্তু শোনা যাবে না। কতকগুলো বিশেষ কজায় কেউ পা রাখলেই চাপ পড়বে এবং একটুকরো লোহার পাত গিয়ে পড়বে একটা ক্যানাস্তারার ওপর। জলের ভেতর সেই চাপা আওয়াজ কাছ থেকে শুনলে ভুল হয়। আসলে কংকালটা দেখেই ডুবুরির মনে আতঙ্ক ঢুকে গেছে তো। এরপর যে-কোন আওয়াজ শুনলে আতঙ্কের ঘোরে ভুতুড়ে মনে হয়। তারপর ওই অট্টহাসি। ওটা মিথেন গ্যাসের বুজকুড়ির শব্দ। জাহাজের গায়ে আটকানো একটা তার আছে। সেটা গ্যাসের সেলের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। দড়িতে কোনোরকম চাপ পড়লে গ্যাসের শেলের মুখ খুলে যায়।

তখন বুজকুড়ি উঠতে থাকে প্রচণ্ড রকমের, তাছাড়া জলের চাপ বেড়ে যায় গ্যাসের দরুণ। সেই চাপে মাস্তুল দুলতে থাকে। জলের রঙও ঘোর কালো হয়ে যায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায়। ডুবুরি ভাবে, কালো একটা কী এগিয়ে আসছে। এবার নীল আলোর কথা বলি! সেও গ্যাসের একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া জলের সংস্পর্শে এসে সামুদ্রিক ফসফরাসের স্বাভাবিক মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। তখন আগুনের শিখা দেখা দেয়।

টম বলল—অদ্ভুত ঘোড়েল লোক তো গিয়েসেপ্পো!

ডিক বলল কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হল না।

হ্যারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আমাদেরও হ— না। এখন ঘরের ছেলে পোড়ামুখ করে ঘরে ফিরে যাই চলো।

ডিক বলল – কিন্তু যাবে কী করে? পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে?

হ্যাস বলল—দেখ, এই বিস্ফোরণের নিশ্চয় তদন্ত হবে। আগামী কাল আশা করছি. ব্রিটিশ সরকার সুদান থেকে বিজ্ঞানীদল পাঠাবেন। তাঁদের প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই।

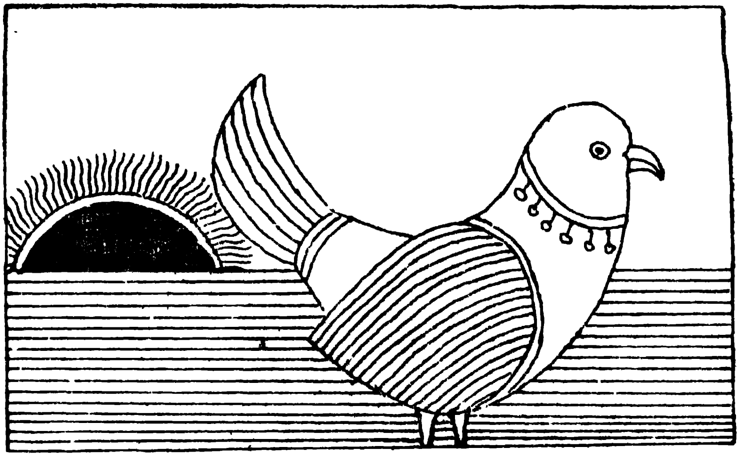
আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে ওরা শুয়ে পড়ল খোলা আকাশের নিচে। দূরে পশ্চিমের সমুদ্রে তখনও আগুনের ছটা দেখা যাচ্ছিল।...

ভোরে প্রচণ্ড বিউগলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল হ্যাসের। টম উঠে দাঁড়িয়ে গাল ফুলিয়ে তার বিদঘুটে বিউগলটা বাজাচ্ছে। ডিক, হ্যারি ধেই-ধেই করে নাচছে।

উত্তর-পূর্বে সমুদ্রে একটা মোটরবোট। মোটরবোটটা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

হ্যাস বলল, ম্যাকফার্সন আসছে আমার খোঁজে।

ক্যাপটেন বেনজেল্লো চুপ করে বসে আছেন। চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। উনিশ বছর পরে মুক্তি এল আশ্চর্য সুন্দর এক প্রত্যূষে।



এক

তিতি ও একটা বাজপাখি

নীলু চুপিচুপি খিড়কির দরজা খুলে বেরুতে যাচ্ছে, মা পিছু ডেকে বললেন—ও কী রে নীলু! আবার দুপুরবেলা বেরুনো হচ্ছে?

নীলু ধরা পড়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল—বেরুচ্ছি কোথায়? উঁকি মেরে দেখছি, মা!

—কী দেখছিস শুনি? মা হাসি চেপে মিথ্যে করে চোখ রাঙিয়ে বললেন—বলেছি না, দুপুরবেলা কোথাও যাবে না, চুপচাপ বসে পড়াশুনো করবে।

নীলু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—এখন আমার ছুটির মাস না?

- ছুটির মাস বলে পড়াশুনো বারণ? দাঁড়া, তোর বাবা আসুন, দেখাচ্ছি মজা!

মায়ের শাসানি শুনে নীলু আরও ভড়কে গেল। কিন্তু তার মন তখন বাইরে মল্লিকদের বাগানে চলে গেছে। ওই যে বাজপড়া ন্যাড়া

নারকেল গাছটা ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথায় বসে আছে একটা সাদা ছোট্ট পায়রা। পায়রাটার নাম তিতি।

তিতিকে সে এতটুকুন থেকে পুষে মানুষ করেছে। হ্যাঁ, মানুষ করেছে বৈকি! ওই যে তিতি কখন নীলুর অজানতে জানলা গলে পালিয়েছে, আর ছোট্ট সাদা ডানাদুটো মেলে উড়ে গিয়ে বসে আছে কন্ধকাটা নারকেল গাছের ডগায়, অথচ নীলু তিতি বলে ডাকলেই মানুষের মত সাড়া দেবে। পায়রাটা নীলুর কথা মানুষের মতোই বুঝতে পারে!

কিন্তু মাঝেমাঝে বড্ড দুষ্টুমিও করে। সেই হয়েছে নীলুর মাথাব্যথা। মাঝেমাঝে কখন চুপিচুপি কেটে পড়ে। আর কেন কে জানে, ওই ভূতুড়ে নারকেল গাছটা ওর ভারি পছন্দ।

নীলু বারবার উঁকি মারছে দেখে মা এবার হাসতে হাসতে বললেন —বুঝেছি! তিতি পালিয়েছে বুঝি? ভালই হয়েছে। পড়াশুনো ফেলে খালি তিতিকে নিয়ে দিন কাটাও। তিতি পালালে তোমার পড়াশুনো হবে? পালাক্, পালাক্।

নীলু অমনি রাগ দেখিয়ে বলল—তিতি পালালে আমি পড়াশুনো করবই না।

—সে কী রে! তবে কী করবি?

—জানিনে, যাও! বলে, নীলু কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ওর চোখ তিতির দিকে। খালি ভয় হচ্ছে, মল্লিকদের হুলো বেড়ালটার পাল্লায় আবার না পড়ে বোকা তিতিসোনাটা! হুলোটা ভীষণ পাজী। সে কিসের মতলবে মাঝেমাঝে এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করে বেড়ায়, নীলু কি তা জানে না? তাছাড়া হুলো গাছে চড়তেও ওস্তাদ…সেই যা ভয়।

তবে নীলু ওই নারকেল গাছটায় হাত বুলিয়ে দেখেছে, খুব পেছল। ওগাছে হুলো কি চড়তে পারবে?

এইসময় নীলুর মা খিড়কির দরজায় এলেন। হাসিমুখে উঁকি মেরে তিতি কোথায় আছে দেখে নিলেন। তারপর নীলুর চিবুক

ধরে আদর করে বললেন—নাঃ, এই রোদ্দুরে ঘোরে না। ঘরে যাও, তিতি এক্ষুনি ফিরে আসবে।

ওদিকের ঘর থেকে নীলুর দাদু অঘোরবাবুর সাড়া এল—ও নীলু! কোথায় তুই?

দাদুর সঙ্গে নীলুর খুব ভাব। সত্যি বলতে কী, পায়রাটা পোষার পেছনে ওঁর আসকারা বড় কম নেই। নীলু দাদুর ডাক শুনে খুশি হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—দাদু! ও দাদু! তিতি আবার পালিয়েছে! মল্লিকদের সেই নারকেল গাছে বসে আছে।

অঘোরবাবু বললেন—সর্বনাশ! এক্ষুনি আবার বাজপাখির পাল্লায় না পড়ে।

নীলুর অমনি মনে পড়ে গেল সর্বনেশে বাজপাখিটার কথা। সত্যিকার বাজপাখি সে দেখেনি, কিন্তু দাদুর কাছে তার কত ভয়ংকর গল্প শুনেছে—ছবিতেও দেখেছে। কি বিচ্ছিরি রাক্ষুসে চেহারা!

সে চমকখাওয়া চোখে আকাশ খুঁজতে থাকল। বুক ঢিপঢিপ করে কাঁপছে। তিতিটা কেন যে ছাই ওই গাছটাই ভালবাসে! আকাশ থেকে বাজপাখি একবার তাকালেই ওকে সহজে দেখতে পাবে। তাছাড়া বাজপাখি নাকি অনেকদূর অব্দি দেখতে পায়।

আকাশে আজ কোথাও একচিলতে মেঘ নেই! গাঢ় নীল হয়ে আছে। বাতাস বইছে না একটুও। শরৎকালের ঝকমকে শোনা-গলা রোদে সবুজ গাছপালার রূপ খুলে গেছে। এমন সুন্দর আকাশ — পৃথিবীতে এই ভয়ংকর বাজপাখি কেন যে থাকে?

হঠাৎ নীলুর চোখে পড়ল, কী একটা কালো পাখি মল্লিকদের বাগানের ওপর অনেক উঁচুতে চক্কর দিচ্ছে। অমনি নীলু চেঁচিয়ে উঠল—দাদু, দাদু! দেখে যাও না, ওটা বাজপাখি কিনা?

অঘোরবাবু বারান্দায় বেরিয়ে বললেন—আমার চোখে কি আর নজর আছে? তুই ডাক না তিতিকে। ওকে তো ডাকলেই তোর কাছে চলে আসবে।

নীলু চেরা গলায় চেঁচিয়ে ডাকতে থাকল—তিতি-ই-ই-ই-ই…
তিতি-ই-ই-ই-ই!

তিতি যেন শুনতেই পাচ্ছে না। চুপচাপ বসে আছে। কালো ন্যাড়া নারকেল গাছের মাথায় পায়রাটা যেন সাদা একমুঠো ফুলের মতো ফুটে রয়েছে।

নীলু এবার ছিটকে বেরিয়ে গেল। খিড়কির দরজার ওপাশে একটা পুকুর। পুকুরের পাড়ে শাকসব্জী, ফলের ক্ষেত, আর ঝোপঝাড়। তারপর মল্লিকদের বিরাট বাগান। নীলু ফের ডাকতে থাকল—তিতি-ই-ই ই! তিতি-ই-ই-ই!

বাজপাখিটা চক্কর দিতে দিতে অনেকটা নেমে এসেছে। নীলু আরও ভয় পেয়ে প্রায় কেঁদে ফেলল। তারপর সে মরীয়া হয়ে ছুটল বাগানের ভেতর।

আম, লিচু, কাঁটাল, কত রকমের ফলের গাছ বাগানে। ঘন ছায়া ছমছম করছে। নিঃঝুম হয়ে আছে চারদিক। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকাটা যেন ভারি মজা পেয়ে ডাকছে। বড্ড কুচুটে ওই ঝিঁঝিঁ পোকাটা। এতক্ষণ বাগানে কত পাখ-পাখালি ডাকছিল। আকাশের ওই ভয়ংকরের ভয়ে তারা চুপ করে গেছে এখন।

ওপরে গাছপালার আড়ালে আকাশ ঢাকা পড়েছে বলে নীলু কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। একবার কানে এল, মা তাকে ডাকছেন, কিন্তু গ্রাহ্য করল না নীলু। সে নারকেল গাছটার দিকে দৌড়চ্ছিল।

নারকেল গাছটার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ আরেক বিপদ এসে পড়ল।

মল্লিকদের একটা প্রকাণ্ড কুকুর আছে। সেটা দিশী কুকুর। তার নাম ভুলো। হঠাৎ একসময় ভুলোর গর্জন শোনা গেল।

ভুলোও বড় বদমাস, হুলো বেড়ালটার মতোই। কিন্তু হুলোকে নীলু ভয় পায় না। বরং হুলোই তাকে দেখলে গা-ঢাকা দিতে দেরি করে না। ভুলোটা কিন্তু তার উল্টো। একেবারে বাঘের মতো হাঁক মেরে দাঁত বের করে ছুটে আসে।

নীলু ভুলোর সাড়া পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। একটু পরেই ভুলোকে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে বিকট ভংগিতে আসতে দেখল সে।

নীলু ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল —দাদু! দাদু! ভুলো আসছে যে!

অমনি মাথার ওপর আকাশে প্রচণ্ড একটা শব্দ হল —দুড়ুম! কানে তালা ধরে গেল নীলুর।

তারপর একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটতে দেখল সে।

সামনে ফাঁকা জায়গাটায় এসেই ভুলো ওই দুড়ুম্ আওয়াজে থমকে দাঁড়াল। আর ঠিক তক্ষুনি কী একটা ওপর থেকে তার সামনে ঝুপ করে পড়ল।

ভুলো সঙ্গে সঙ্গে সেই আকাশ থেকে পড়া জিনিসটার ওপর ঝাঁপ দিল। সেটাকে কামড়ে ধরল। নীলু অবাক হয়ে দেখল, ওটা একটা পাখি। দেখতে চিলের মতো। ডানার রঙ ছাইয়ের মতো একটু বাদামী ছিটে আছে।

তক্ষুনি নীলু টের পেল, ওটা বাজপাখি ছাড়া কিছু নয়।

—নীলু! নীলু! ফিরে আয়।

দাদু তাকে ডাকছিলেন। নীলু ব্যাপারটা দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এখন তার তিতির কথা মনে পড়ল। সে দাদুর ডাকে সাড়া দিয়ে বলল —যাই-ই-ই!

খিড়কির দরজার কাছে দাদু দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে বন্দুক। নীলুকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন—তিতিকে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যিস আমার বন্দুকটার সঙ্গে দূরবীণ লাগানো আছে। নৈলে বুড়ো চোখে বাজপাখিটা দেখতেই পেতুম না।

নীলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তিতি! তিতি ফিরেছে?

অঘোরবাবু বললেন—তাকিয়ে দেখ তো, নারকেল গাছে হয়তো এখনও বসে আছে।

নীলুর মা বললেন—বেচারী ব্যাপার-স্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেছে। ওই তো, এখনও চুপটি করে বসে আছে।

নীলু চেরা গলায় ডেকে উঠল—তিতি-ই-ই-ই! তিতি-ই--ই-ই!

এবার তিতির যেন হুঁশ হল। সে এদিকে ছোট্ট মুখটা ফিরিয়ে ডাকটা শুনল। তারপর সাদা ডানাদুটো মেলে উড়ে এল।

নীলুর কাঁধে এসে বসে পড়ল সে। নীলু তাকে খপ করে ধরে বলল—মেরে ফেলব, তিতি! ফের যদি এমন করবি, ভাল হবে না বলছি! বল্, আর কখনও পালাবি?

অঘোরবাবু হাসতে হাসতে বললেন—আহা, থাক্, থাক্! আর বকে না।

তিতিকে নিয়ে নীলু খুশিতে ডগমগ হয়ে নাচতে নাচতে তার ঘরে ঢুকল। পেছন পেছন অঘোরবাবুও এলেন।

নীলুর হাত থেকে পায়রাটা উড়ে গিয়ে আলমারির মাথায় গিয়ে বসল। তারপর নিজের ভাষায় বলল—বক্‌বকম্! বক্‌বকম্!

অঘোরবাবু বন্দুকটা খাটে ঠেস দিয়ে রেখে বললেন—কী বলছে বুঝতে পারছিস তো নীলু? বলছে, আর বকে না! আর বকে না! খুব হয়েছে, আর কক্ষনো এমন করব না!

নীলু চোখ পাকিয়ে বলল—এই তিতি! দাদুকে প্রণাম কর দাদু তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন না? আয়, ঠিক এভাবে প্রণাম কর! বলে, নীলু দাদুর পায়ে টিপ করে প্রণাম করল।

আশ্চর্য, পায়রাটাও তক্ষুনি উড়ে এসে অঘোরবাবুর পায়ে এসে ঠোঁট ঠেকাল।

নীলুর মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিলেন। বললেন তিতি নিশ্চয় আগের জন্মে মানুষ ছিল! একেবারে মানুষের মতো বুদ্ধি!

অঘোরবাবু হাসতে হাসতে তিতিকে হাতে তুলে নিলেন। আদর করতে করতে বললেন—আসলে কী জানো বউমা? এক জাতের পায়রা আছে, তারা খুব বুদ্ধিমান। একসময় তাদের দিয়ে মানুষ খবরাখবর পাঠাত নানা জায়গায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বেতার-যন্ত্র ছিল না, তখন পায়রা দিয়ে যুদ্ধের খবর পাঠানো

হ'ত। তাছাড়া পায়রা গুপ্তচরের কাজও করত। পায়রার গোয়েন্দা-গিরির অনেক ঘটনাও আমি জানি।

নীলু বলল—তিতিকে গোয়েন্দা করব, দাদু।

অঘোরবাবু বললেন—তিতি গোয়েন্দা হয়েই জন্মেছে। দেখবে, কত অদ্ভুত কাণ্ড সে করবে! তবে ওকে আরও ভালভাবে ট্রেনিং দিতে হবে।

নীলু নাচতে নাচতে বলল—ও দাদু, দাও না ওকে ট্রেনিং! তুমি তো পুলিশের গোয়েন্দা ছিলে, না দাদু?

ছিলুম একবার ডাকাত ধরেছিলুম পায়রার সাহায্যে, জানিস!

নীলু দাদুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। পায়রাটা তার কাঁধে এসে বসল। যেন গপ্পোটা শুনবে। কিন্তু অঘোরবাবু বললেন—এখন আর গপ্পো নয়। পড়াশোনা করো কিছুক্ষণ। তারপর বিকেলে নদীর ধারে যখন বেড়াতে যাব, তখন সে-গপ্পো শোনাব। কই, বই-খাতা বের করে বসো তো এখন।

অঘোরবাবু চলে গেলেন নিজের ঘরে। দুপুরবেলাটা তিনি বইপত্তর পড়ে কাটান। নীলু আজ দাদুর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাই ভালছেলের মতো বই নিয়ে বসল।

তিতি তার বইয়ের কাছে টেবিলের ওপর চুপচাপ বসে রইল। একবার সে বইয়ের দিকে তাকাচ্ছে, একবার নীলুর মুখের দিকে। নীলু অঙ্কের খাতা খুললে তিতি যেন বেজার মুখে সরে গেল আলমারির ওপর। চোখ বুজে ঘুমোতে শুরু করল।

অঙ্ক কষতে-কষতে নীলু একবার দেখল তাকে। আহা, বেচারা! খুব ধকল গেছে আজ। বোঝা যায়। আতংকে এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যে বাজপাখিটার কবল থেকে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারেনি। ভাগ্যিস দাদুর দূরবীণ লাগানো বন্দুক আছে!

তিতির বয়স মোটে মাস পাঁচেক। জষ্ঠি মাসে একদিন রাতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। তিতি দালানের কার্নিশের নীচে

ঘুলঘুলিতে বাস করত মা-বাবার সঙ্গে। ঝড়-বৃষ্টির পর ভোরবেলা হঠাৎ জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই নীলুর চোখে পড়েছিল তিতিকে। সবে ডানা গজাচ্ছে। এতটুকুন পাখিটা। খড়কুটোর বাসাসুদ্ধু পড়ে গেছে ঘুলঘুলি থেকে। ভাগ্যিস নিচে একটা ঘন ডালপাতায় ছাওয়া জবাফুলের ঝোপ ছিল। তার মাথায় বাসাটা আটকে যায়। তাই হয়তো আঘাত লাগে নি।

কিন্তু ঠিক সেই সময় মল্লিকদের হুলোটাও এসে পড়েছিল। তাক করছিল ঝোপের তলায়। নীলু তাকে দেখামাত্র তাড়া করেছিল। তারপর তিতিকে নিয়ে এসে পুষতে শুরু করেছিল।

কিছুদিন পরে তিতিকে দেখে অঘোরবাবু বলেছিলেন —ও নীলু, এ যে দেখছি খুব ভাল জাতের পায়রা। আমি চিনি। একসময় এ জাতের পায়রাকে ট্রেনিং দিতুম, জানিস। এদের যা শেখাবি, শিখে ফেলবে।

নীলু বলেছিল—তাই শেখাও না, দাদু!

সেই থেকে তিতি অঘোরবাবুর ট্রেনিং পেয়েছে। নীলু তাকে নিয়েই দিন কাটায়।…

দুই

রাত দুপুরে ভয়ংকর

দিনে দিনে তিতি বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে। তার ডানা ও পালকের রঙ ঝকঝকে সাদা। গলায় একটা লাল রেখা আছে মালার মতো। ঠোঁটও টুকটুকে লাল। চোখ দুটোও লালচে। মাথার ওপর একটুখানি ধূসর রঙের ছিটে, বুকের তলা থেকে লেজঅব্দি টানা তেমনি একটা ধূসর ছোপ।

দাদু ও নাতি বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে যায়। তিতি থাকে নাতি নীলুর কাঁধে। ছোট্ট শহর বকুলপুরের সবাই তিতিকে চিনে

ফেলেছে এখন। মাঝেমাঝে তিতি নীলুকে লুকিয়ে আকাশে চক্কর দিয়ে আসে। ডিগবাজি খায় নীল শূন্যে। বকুলপুরের লোকেরা দেখলেই বুঝতে পারে, ওই পাখিটা তিতি। তিতির গুণের কথা সবাই জেনে ফেলেছে।

নদীর ধারে সুন্দর পার্ক। পার্কে বসলে দেখা যায় রেলস্টেশনটা। রেললাইনে সাঁকো আছে। তার ওপর অদ্ভুত শব্দ করে চলে যায় রেলগাড়ি। আর রেলগাড়ির সেই শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিতি নেচে নেচে বলে--বক্‌বকম্! বক্‌বকম্।

নীলু বলে—এই তিতি! তোর বুঝি ট্রেনে চাপতে ইচ্ছে করছে?

তিতি বলে—বক্‌বকম্! বক্‌বকম্!

একদিন অঘোরবাবু, নীলু আর তিতি পার্কের বেঞ্চে বসে আছে। বিকেলের পড়ন্ত সূর্য ওপারে রেলস্টেশনের পিছনে বড় বড় শালগাছের মাথায় ঝুঁকে পড়েছে। এমন সময় একটা গুঁফো নাদুস-নুদুস চেহারার ভদ্রলোক এসে বেঞ্চের কোণায় বসলে তিতি তার দিকে তাকিয়ে বললে বক্‌বকম্!

ভদ্রলোকের পরনে স্যুট-টাই খুব রাশভারি গড়ন। তিতিকে দেখতে দেখতে বললেন—বাঃ! এ যে দেখছি 'এ্যামবাসাডার' পায়রা! ও খোকা, কোথায় পেলে ওকে?

নীলু কিছু বলার আগেই অঘোরবাবু বললেন—ঠিক বলেছেন। এ জাতের পায়রাকে 'এ্যামবাসাডার' অর্থাৎ রাষ্ট্রদূত বলা হয়। আপনি পায়রা চেনেন দেখছি!

—অল্পস্বল্প চিনি। মানে, একসময় আমার পায়রা পোষার সখ ছিল!

—তাই বুঝি? তা, এর আগে তো বকুলপুরে আপনাকে দেখিনি। কোথায় থাকেন?

ভদ্রলোক মিঠে হেসে বললেন—আমি কলকাতায় থাকি। সম্প্রতি এখানে বেড়াতে এসেছি. আমার ভাগ্নে নকুলকে হয়তো চেনেন।

—খুব চিনি! নকুলের মামা আপনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম ভবশংকর দত্ত। মশাইয়ের পরিচয়?

অঘোরবাবু ভদ্রতা করে বললেন—আমার নাম অঘোর মিত্তির। দু'জনে পরস্পরকে নমস্কার করলেন। তারপর ভবশংকর বললেন—এই ছেলেটি কে?

—আমার নাতি, নীলকুমার। আমরা ওকে নীলু বলি!

—পায়রাটা নিশ্চয় শ্রীমান নীলুর।

—তা আর বলতে। বলে, অঘোরবাবু নীলুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

নীলু আড়চোখে ভবশংকরকে দেখছিল। ভবশংকর হাত বাড়িয়ে হঠাৎ খপ্ করে তার কাঁধ থেকে তিতিকে ধরে ফেললেন। তিতি ডানা ঝটপট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। নীলু মনে মনে রেগে গেল।

ভবশংকর তিতির পিঠে একটা হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—এ্যামবাসাডার পায়রাকে ট্রেনিং দিলে অনেক কাজ করতে পারে। আমার একটা ছিল। জানেন, বেচারাকে বাজপাখিতে মেরে ফেলল।

অঘোরবাবু বললেন—হ্যাঁ, ওই এক ভয়। তিতিও কতবার বেঁচে গেছে।

—এর নাম বুঝি তিতি?

—নীলু ওকে তিতি বলেই ডাকে।

ভবশংকর খালি-হাতটা বাড়িয়ে নীলুকে কাছে টানলেন। তারপর বললেন—খুব ভাল ছেলে। তা, তোমার তিতিকে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করছ না কেন, নীলু?

নীলু বলল—দাদু ওকে কেন ট্রেনিং দিচ্ছেন না বুঝি? দাদু তো পায়রার ট্রেনিং···

অঘোরবাবু নাতির কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—একটু-আধটু জানতুম! মানে, একসময় আমারও আপনার মতো এ সখ ছিল!

ভবশংকর খুশি হয়ে বললেন—বাঃ! তাহলে তো খুব ভাল

কথা! তা মিস্তিরমশাই, কতটা ট্রেনিং হল তিতির? যেমন ধরুন, আমি যদি বলি, তিতি! যাও তো বাবা, ওই উঁচু গাছের ডগা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে আনো, আনবে?

নীলু বলল —আনবে না মানে? আমি বললেই আনবে।

—আর কেউ বললে আনবে না?

—না নীলু হাসল।

ভবশংকর মিটিমিটি হেসে বললেন—যদি ঠিকঠাক ট্রেনিং পেয়ে থাকে, তাহলে ও সবার কথা শুনবে। দেখবে?

বলে, ভবশংকর তিতির পিঠে হাত বুলিয়ে শিষ দিলেন তিনবার। তারপর আঙুল তুলে বললেন- ওই গাছের ডগা থেকে একটা পাতা চাই! যাও!

তারপর মুখ দিয়ে অদ্ভুত শি শি শব্দ করতে থাকলেন। সেইসঙ্গে তিতির ডানার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে খোঁচা দিলেন। আর অবাক কাণ্ড, তিতি উড়ে চলে গেল সেই উঁচু গাছটার দিকে।

একটু পরে, তিতি একটুকরো ছেঁড়া পাতা ঠোঁটে নিয়ে ফিরে এল। ভবশংকরের কোলে এসে বসল। ভবশংকর চোখ নাচিয়ে বললেন —দেখলে তো নীলু!

নীলু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তিতির ওপর তার রাগও হয়েছে। তুই তো ভারি অকৃতজ্ঞ তিতি! একটা অজানা লোকের হুকুম তামিল করে বসলি? লজ্জা করে না তোর? তুই আমার, না ওই লোকটার?

অঘোরবাবু বললেন —আপনি তো দেখছি পাকা ট্রেনার মশাই!

ভবশংকর বললেন—আসলে কী জানেন? কতকগুলো ইশারা আছে, যা এই জাতের সব পায়রা বোঝে। এই ইশারাগুলো জানা চাই। বললুম না, আমি একসময় পায়রা নিয়ে কতরকম পরীক্ষা করেছি।

নীলু আর চুপ করে থাকতে পারল না। হাত বাড়িয়ে তিতিকে ভবশংকরের হাত থেকে কতকটা কেড়েই নিল। ভবশংকর হো-

হো করে হেসে ফেললেন। অঘোরবাবুও হাসতে হাসতে বললেন—পায়রাটা নীলুর প্রাণ!

এবার নীলু করল কী, তিতিকে ধরে নিয়ে হনহন করে চলতে শুরু করল। অঘোরবাবু বললেন—ও নীলু! কোথায় যাচ্ছিস?

নীলু জবাব দিল না। একদৌড়ে একেবারে বাড়িতে পৌঁছে গেল।

তারপর তিতিকে একচোট খুব বকে দিল—তুই তো বড্ড নেমকহারাম! ওই লোকটার কথা শুনলি তুই? আমি বুঝি তোর কেউ না?

তিতি বলল—বক্‌বকম্‌। বক্‌বকম্‌

নীলুর মা বললেন—কী রে নীলু, ওকে অত বকছিস কেন?

নীলু জবাব দিল না সে কথার। শুধু বললে—মা! আমায় একটা খাঁচা কিনে দাও না!

—কেন? খাঁচা কী হবে? আবার একটা পাখি পুষবি নাকি?

—না, তিতিটাকে খাঁচায় পুরে রাখব।

—সে কী রে!

—হ্যাঁ মা। ও খুব নেমকহারাম। ওকে আর কোথাও বেরুতে দেব না।

কিছুক্ষণ পরে অঘোরবাবু বাড়ি ফিরলেন। সঙ্গে সেই ভবশংকর বাবু। নীলু উঁকি মেরে দেখে গুম্‌ হয়ে গেল। ঘর থেকে বেরুল না।

দাদু ওই লোকটাকে অত খাতির করছেন দেখে তার রাগ হচ্ছিল। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তিতি চুপটি করে উঁচু তাকে তার ঘুমোবার জায়গায় চলে গেছে। নীলু পড়তে বসল। মাস্টার-মশাই আসার সময় হয়েছে।

নীলুর আর কোনো ভাই বা বোন নেই। তাই মা তাকে সব সময় কাছে রাখতে চান। কিন্তু তাঁর বাবা প্রশান্তবাবু বলেন, ওতে ছেলেপুলেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা পায় না। বড্ড ভীতু হয়ে যায়। ওর ডানপিটে হওয়া দরকার। আর একটা কথা পই-পই

করে বলে দিচ্ছি, ওকে কখনো ভূতের গল্প শোনাবে না। যদি শোনাও, শেষে বুঝিয়ে দেবে, ভূতটুত কিচ্ছু নেই···মনের ভুল।

নীলুর মা সুলতা কিন্তু ভূত বিশ্বাস করেন। এই যে নীলু ক্লাস এইটে ওঠার পর একা এঘরে শুচ্ছে, তাতে সুলতার তো রাতে ঘুম হয় না। প্রশান্তবাবু ছেলেকে সাহসী করে তুলতে চান। কিন্তু সুলতার ভারি ভাবনা, যদি রাতবিরেতে একটা ভূতপ্রেত এসে জানলায় উঁকি মারে এবং দাঁত খিচিয়ে ভয় দেখায়, তাহলে বাছা নীলুর কী হবে?

তাই রাতের বেলা যতবার ঘুম ভাঙে, সুলতা কান পেতে থাকেন ছেলের ঘরের দিকে। কখনও উঠে এসে দরজার সামনে ঘুরে যান।

নীলু কিন্তু সত্যিই বড্ড সাহসী ছেলে···ওর দাদু অঘোরবাবুর মতোই। সে দিব্যি ঘুমোয়। কোনো রাতে মিছে ভয় পেয়ে চেঁচামেচি তো আজ অব্দি করে নি। তার একটা এয়ার-গান আছে। সে বলে, ভূত এলে দুম্ পট্টাস করে এক গুলিতে মেরে ফেলব না!

সে-রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সুলতার। কী একটা চাপা খসখস শব্দ হচ্ছে কোথাও। কান পেতে শুনতে থাকলেন, শব্দটা কোথায় হচ্ছে।

শব্দটা খিড়কির ওদিকে হচ্ছে কি? নাকি ঘরের পেছন দিকটায় দেয়ালে কোনো জানোয়ার গা ঘষছে? কী জানোয়ার হতে পারে? বকুলপুরের নদীর ওপারে একসময় বাঘ ছিল শোনা যায়। আজকাল নাকি বাঘের টিকিও দেখা যায় না।

তাহলে নিশ্চয় খাটাল থেকে গোয়ালাদের মোষ এসে দেয়ালে গা ঘষছে। মোষের এ অভ্যেস আছে।

সুলতা কান পেতে আছেন। কিন্তু শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। নিঃঝুম রাত। মাঝে মাঝে দূরে নদীর ওপারে রেলইয়ার্ডে ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্ বেজে উঠছে। কখনও রেলগাড়ি চলে যাওয়ার শব্দও।

সুলতার চোখে আবার ঘুম নেমে এল।

নীলুর ঘরে তখন নীলুর ঘুম ভেঙে গেছে। তিতি এসে তার বুকে বসে কেন কে জানে, চিবুকে বেজায় সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। নীলু যতবার হাত তুলে ঘুমের ঘোরে তিতিকে সরাতে গেছে, তিতি ডানা ঝটপট করে একটু সরে গেছে। তারপর ডেকেছে বক্ বকম্! বক্ বকম্।

তার মানে, ও নীলু, ঘুমিও না···ওঠ তো!

নীলু ওর কথা বুঝতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘুম ভেঙে গেছে। হাত বাড়িয়ে টেবিলবাতির সুইচ টিপে আলো জেলে ধমক দিল—কী রে তিতি? রাতদুপুরে জ্বালাচ্ছিস কেন? তুই ভারি পাজি হয়েছিস তো? তিতি, তোকে বলেছি না, কক্ষনো রাতের বেলা বিছানা ছেড়ে উঠবিনে। দেখছিস না, ফ্যান ঘুরছে। অন্ধকারে ফ্যানে টোক্কর খেলে হাড়গোড় ভেঙে যাবে বলে দিচ্ছি!

তিতি বলল—বক্ বকম্। বক্ বকম! তা কি আর জানিনে?

এই সময় হঠাৎ জানলার বাইরে চাপা শিসের শব্দ শোনা গেল। অমনি নীলু চমকে উঠল। এই শিস তার এত চেনা লাগছে কেন?

সে বিছানা থেকে কাত হয়ে জানলার দিকে তাকাল। টেবিল-বাতির ছটা গিয়ে পড়েছে জানলায়। তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একটা কালো মুখ। সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে রয়েছে। বিটকেল চোখদুটো যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মাথায় দুটো শিঙের মতো কিছু রয়েছে।

নীলু সাহসী ছেলে। কিন্তু ওই ভুতুড়ে ভয়ংকর মুখ দেখে তার বুক হিম হয়ে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠতেও ভুলে গেল। মুখে কথা সরল না।

ওই সাংঘাতিক রাক্ষুসে মুখ থেকে ফের শিস শোনা গেল।

এবার তিতি হঠাৎ নড়ে উঠল। সে নীলুর বালিশে বসেছিল। বালিশ থেকে খাটের মাথায় লাফ দিল।

অমনি নীলু খপ করে তিতিকে চেপে ধরল তারপর চেঁচিয়ে উঠল—দাদু! দাদু!

ওপাশের ঘর থেকে অঘোরবাবুর সাড়া পাওয়া গেল প্রথমে।

—নীলু! নীলু! ভয় নেই, যাচ্ছি!

তারপর পাশের ঘর থেকে প্রশান্তবাবু আর সুলতা দেবী চেঁচামেচি করে উঠলেন। বাড়ির চাকর আচমকা ঘুম ভেঙে বাজখাঁই গলায় চেঁচাতে থাকল—ওরে বাবা রে! ডাকাত পড়েছে রে! মেরে ফেললে রে!

সে এক তুলকালাম কাণ্ড! বাইরের রাস্তায় বেরিয়েছিল দু'জন সেপাই। তারা বন্ধুক ছুঁড়ে ফেলল বেগতিক দেখে। পাড়াসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গেছে হট্টগোলে। সবাই চ্যাঁচাচ্ছে—ডাকাত! ডাকাত! রাস্তায় ভিড় করে বেরিয়েছে যুবকেরা। হাতে লাঠি, বল্লম, দা। কারুর হাতে ইটপাটকেল। বকুলপুরে রাতদুপুরে ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ জানে না, ডাকাত পড়েছে কোন্ বাড়িতে।

ততক্ষণে জানালা থেকে ভয়ংকর মুখটা উধাও। নীলু তিতিকে ছাড়ে নি। দরজা খুলে দিয়েছে, দাদু, বাবা, মা ঘরে ঢুকেছেন। বলছেন—কী হয়েছে রে, নীলু? কী হয়েছে?

নীলু হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটনাটা বলল। প্রশান্তবাবু হেসে বললেন—স্বপ্ন দেখেছিলি! তা, স্বপ্ন দেখে কক্ষনো ভয় পাবিনে। স্বপ্ন ইজ স্বপ্ন!

সুলতা বললেন—স্বপ্ন কেন হবে? যা দেখবার তাই দেখেছে!

প্রশান্তবাবু বললেন—তার মানে বুঝি ভূত? খবর্দার! ওসব ভূত-টুত ওর মাথায় ঢুকিও না বলে দিচ্ছি! ভূত নেই!

সুলতা রেগে গিয়ে বললেন—নেই বললেই হল। নেই যদি নীলু তাহলে কী দেখল?

তর্কাতর্কি থামিয়ে দিয়ে অঘোরবাবু বললেন—চুপ, চুপ। শুয়ে পড়ো গিয়ে। আমি সব দেখছি।

প্রশান্তবাবু বারান্দায় গিয়ে কান পেতে বললেন—সর্বনাশ! অত চেঁচামেচি হট্টগোল হচ্ছে কেন বাইরে?

অঘোরবাবু হাসতে হাসতে বললেন—জগার কীর্তি! জগা ডাকাত পড়েছে বলে চেঁচাচ্ছিল শুনলে না? তাই শুনে পাড়াসুদ্ধু জেগে উঠেছে! সেপাইরা বন্দুকও ছুঁড়েছে! জগাটা বড্ড ভীতু যে!

চাকর জগা বুড়োকর্তার ধমক খাবার ভয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মিছিমিছি নাক ডাকতে শুরু করল।

প্রশান্তবাবু ও সুলতা চলে গেলেন ঘুমোতে। অঘোরবাবুই আসলে বাড়ির কর্তা। তাঁর কথা না মানলে রক্ষে নেই। তাছাড়া নীলুর কাছে অঘোরবাবু যখন রয়েছেন, তখন নীলুর গায়ে আঁচড় কাটে কে? ভূত কেন ভূতের কর্তাবাবার সাধ্যি নেই আর যে আনাচে-কানাচে এসে ওৎ পাতে। অঘোরবাবু একসময় পুলিশের গোয়েন্দা দফতরে বড়কর্তা ছিলেন। কে না জানে এ কথা!

বাইরে ততক্ষণে সবাই চুপ করেছে। কেউ কোনো হদিশ পায় নি। কোথায় ডাকাত পড়ল, কিংবা সাংঘাতিক কিছু ঘটল, কেউ বলতে পারল না। তখন সেপাই দুটোকেই সবাই বকল খুব। কেন ওরা মিছিমিছি বন্দুক ছুঁড়ে ঘুম ভাঙিয়েছে সবার?

সেপাই চৌবেজী আর মর্দন সিং গতিক বুঝে কেটে পড়েছে। চৌমাথার গোলপার্কের বেঞ্চিতে বসে খৈনি খাচ্ছে আর বলাবলি করছে—ইয়ে সব বাংগালি বাবুলোক বহত ডরতা হ্যায়! কাহে এত্তা চেল্লাচেল্লি?

নীলুর ঘরে তখন অঘোরবাবু নীলুর কাছে ঘটনাটা শুনছিলেন। সব শুনে টর্চ আর বন্দুক নিয়ে জানলার বাইরেটা দেখে এলেন অঘোরবাবু। তারপর বললেন—হুম্! নীলু, তোর পায়রাটার ওপর কারুর বেজায় লোভ হয়েছে, বুঝলি?

নীলু বলল—দাদু! শিষ দিয়ে তিতিকে ডাকছিল ভূতটা। কাল বিকেলে নদীর ধারে সেই গুঁফো লোকটাও তো এমনি শিষ দিচ্ছিল।

অঘোরবাবু বললেন—হুম্! বুঝেছি, ভবশংকরের কীর্তি। মুখোশ পরে এসেছিল।

নীলু লাফিয়ে উঠল—হ্যাঁ দাদু, ঠিক বলেছ। ওটা মুখোশ ছাড়া কিছু নয়!

—তিতিকে চোখে-চোখে রাখিস, অঘোরবাবু বললেন—মনে হচ্ছে, ভবশংকর তিতিকে চুরি করতে চায়। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, একি শুধু তার পায়রার শখ—নাকি, পেছনে অন্য মতলব আছে? আচ্ছা, তুই ঘুমো। আমিও তোর কাছে শুচ্ছি। এবার এলে বাছাধনের মুণ্ডুটি উড়িয়ে দেব।

নীলু তিতিকে মাথার পাশে বসিয়ে রেখে শুল। তিতি ভাল ছেলের মতো চুপচাপ আর শান্ত। কালই নীলু একটা খাঁচা কিনে আনবে ····

তিন

মামাভাগ্নের চক্রান্ত

জগার সঙ্গে নীলু বাজারে খাঁচা কিনতে গিয়েছিল।

তিতি আজ সকাল থেকে মনমরা হয়ে আছে। পায়রা হলে কি হবে? সে সব বুঝতে পারে যে! নীলু তা টের পেয়ে বলে গেছে, বেশিদিন তোকে আটকে রাখব না তিতি! ওই গুঁফো লোকটা বকুলপুর ছেড়ে চলে গেলেই আবার তোর ছুটি।

কিন্তু তিতির কি মন মানে? নীল আকাশে রোজ দুবেলা বার দুই চক্কর মেরে না এলে মন তেতো হয়ে যায় না বুঝি? আর ওই যে মল্লিকদের উঁচু ন্যাড়া নারকেল গাছটা রয়েছে, নীলু তো জানে না, তার সঙ্গে তিতির কত ভাব।

অঘোরবাবু যেমন নীলুর দাদু, নারকেল গাছটা তেমনি তিতির দাদু। অঘোরবাবুর মাথায় টাক পড়ে গেছে। নারকেল গাছটার মাথায় ওটাই টাক। রোজ দুপুরবেলা গাছটা নিরিবিলি তিতিকে কত গল্প শোনায়—নীলু তো জানে না।

বাজারে বেশ বড়সড় একটা খাঁচা কিনল নীলু। বাঁশের খাঁচা। কিন্তু ভারি চমৎকার গড়ন, গম্বুজের মতো। কাঠিগুলো নিটোল আর চিকন।

তিতির জন্য কিছু শস্যদানাও কিনল নীলু, তারপর খুশিতে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরল। যাক্, গুঁফো লোকটা আর তিতিকে বাগে পাবে না। খাঁচাটা সে বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখবে। মল্লিকদের হুলোও আর বাগে পাবে না তিতিকে।

বাড়ি ঢুকে নীলু আগে দাদুকে খাঁচাটা দেখাল। অঘোরবাবু খুব তারিফ করলেন খাঁচাটার। হুম্! তিতি হাত-পা ছড়িয়ে দিব্যি বেড়াতে পারবে ভেতরে।

নিজের ঘরে ঢুকে নীলু ডাকল—তিতি, আয়! এই ছাখ্, তোর জন্যে কেমন সুন্দর ঘর এনেছি!

তিতির সাড়া নেই। এখন তার আলমারির মাথায় থাকার কথা। নীলু ধমক দিল—এই তিতি, ফাজলামি হচ্ছে? আয় বলছি। খাঁচাকে এত ভয় কিসের শুনি?

তবু তিতির সাড়া নেই। নীলু ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে দেখল, তিতি নেই। নাকি লুকিয়ে আছে খাটের তলায়?

নীলু আদর করে ডাকতে থাকল—তিতিসোনা, এস না গো! না, না, আর কখনো বকব না তোমায়। এস শিগগির।

কিন্তু কোথায় তিতি? নীলু কাঁদোকাঁদো গলায় চেঁচিয়ে বলল—মা, ও মা! তিতিকে দেখেছ?

রান্নাঘর থেকে সুলতা বললেন—কীরে, নীলু, কী হয়েছে?

নীলুর পিত্তি জ্বলে গেল। খালি রান্না! বলে গিয়েছিল না, তিতির দিকে লক্ষ্য রাখতে। নীলু রেগে গিয়ে বলল—তিতি! তিতি কোথায়?

সুলতা বেরিয়ে হাসিমুখে বললেন—এক্ষুনি তো ছিল দেখলুম, খাঁচা দেখে লুকিয়েছে কোথাও। তোর কথা তো শোনে। ডাক্ না।

নীলু ডাকাডাকি শুরু করল—তিতি! তিতি! তিতি-ই-ই-ই!

তিতির পাত্তা নেই। নীলু হন্তদন্ত হয়ে খিড়কির দরজা খুলে বেরুল। নিশ্চয় তিতি মল্লিকদের নারকেল গাছে গিয়ে বসে আছে!

কিন্তু কই? গাছটার মাথায় ঝকঝকে রোদ খেলছে। তিতি তো ওখানে নেই। টাকপড়া বুড়ো নারকেল গাছটা যেন দুষ্টুমি করে মিটিমিটি হাসছে।

নীলু দৌড়ে মল্লিকদের বাগানে গিয়ে ঢুকল। ভুলো কুকুরটার কথা একেবারে ভুলেই গেল সে। ডাকতে থাকল—তিতি-ই-ই! তিতি-ই-ই!

মল্লিকদের বাড়ির ঝুনু বাগানে শিউলিতলায় ফুল কুড়োচ্ছিল। নীলুর ডাক শুনে সে এগিয়ে এসে বলল—কী হয়েছে নীলু?

নীলু ব্যাকুল হয়ে বলল—আমার তিতিকে দেখেছিস ঝুনু?

ঝুনু বলল—হুঁউ। একটু আগে ওই ন্যাড়া নারকেল গাছের ডগায় বসেছিল। তারপর···

—বল্, বল্, শিগগির বল্! তারপর কী হল?

ঝুনু চোখ বড়ো করে বলল—তারপর একটা লোক এল। সে এসে···

—কেমন লোক? তার গোঁফ আছে?

—মস্ত গোঁফ আছে রে! দেখে আমার খুব ভয় করছিল। সে এসে শিষ দিয়ে তোর তিতিকে ডাকল, আর তিতি নেমে এসে ওর কাঁধে বসল। তারপর লোকটা ধুপ ধুপ করে দৌড়ে চলে গেল! লোকটা কে রে নীলু?

নীলু গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে! সর্বনাশ! যা ভয় করেছিল তাই হল। তিতিটা যত বোকা, তেমনি নেমকহারাম!

ঝুনু বলল—ও নীলু, কী হল তোর? অমন করছিস কেন?

নীলু কোন জবাব না দিয়ে দৌড় দিল। বাগান পেরিয়ে ছোট্ট পাঁচিল—সেই পাঁচিলে মরীয়া হয়ে উঠে পড়ল সে। তারপর এক লাফে রাস্তায় নামল।

রায়বাবুদের কাঠগোলা পেরিয়ে খাল। খালে সাঁকো আছে। সাঁকো পেরিয়ে সোজা সে নকুলদের বাড়ির কাছে পৌঁছল।

নকুলদের বাড়ির সামনে ফুলবাগিচা, পেছনের দিকটায় ঘন ঝোপঝাড় আর গাছপালায় জঙ্গল হয়ে আছে। তার ওপাশে রেললাইন।

নীলু একটু দাঁড়িয়ে বুদ্ধি আঁটল। দাদু তাঁর গোয়েন্দাগিরির অনেক গল্প শুনিয়েছেন। নীলু ঠিক করল, সেইরকম গোয়েন্দাগিরি করবে আজ।

কিন্তু হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল নকুল।

নকুলের বয়স নীলুর বয়সের দু-গুণ তো হবেই। কবে স্কুল ছেড়েছিল অংকের স্যারের ঠ্যাঙানি খেয়ে। আর পড়াশুনোর কাছে ঘেঁষেনি। তার বাবা বেঁচে নেই। মা বুড়োমানুষ। তার দাদারা এ শহরে ব্যবসা করেন। নকুল খালি টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেবেলা থেকে তার বেজায় বদনাম। কতবার নাকি চুরি-চামারি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গেছে। তার দাদারা বলে-কয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। এ সব কারণে নীলুর নকুলকে বড্ড ভয় করে। নকুল অবশ্য তার সঙ্গে যেচে কথা বলে। মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করে—কী নীলু, কোথায় চললে? ভয়ে ভয়ে একটা জবাব দিয়ে সে কেটে পড়ে।

আজ যে নীলু নকুলদের বাড়ি এসেছে। সেটা শুধু তিতির তাগিদে। তিতির জন্যে নীলু প্রাণ দিতে পারে।

এখন আচমকা নকুলের সামনে পড়ে সে মরীয়া হয়ে উঠল। নকুল গেট খুলে বেরিয়ে তাকে দেখতে পেল। একগাল হেসে বলল —নীলু যে! কোথায় চললে?

নকুলের চেহারাটাও বড্ড বিচ্ছিরি। থ্যাবড়া নাক, কুতকুতে চোখ। কতকটা চীনাদের মতো দেখতে। আজ নকুল খুব সেজে-গুজে আছে। গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি। পরনে নীলরঙা পাতলুন। গায়ে গাব্দা বুট। এমন পোশাকে নকুলকে কখনো দেখেনি নীলু!

কী নোংরা সেজে থাকত সে ভাবা যায় না !

নীলু তাকে দেখছিল। চমক খেয়ে বলল নোকুদা, আমার তিতিকে দেখেছ গো ?

নকুল ভুরু কুঁচকে বলল—কে ? তিতি ? সেটা আবার কে ?

নীলু বলল—আমার পায়রা, নোকুদা ! বলো না, দেখেছ নাকি ?

—পায়রা ! তুমি পায়রা পুষতে শিখেছ এ বয়সে ? নকুল বাঁকা মুখে বলল—ছ্যা ছ্যা ! আর কি তোমার পড়াশুনো হবে ভেবেছ ?

নীলু বিরক্ত হল। নকুল তাকে পড়ার কথা বলছে ! নিজে কী করেছে ? নীলু বলল—দেখনি তিতিকে, নোকুদা ?

নকুল ভারিক্কিচালে বলল—আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোমার পায়রা দেখব। যাও, যাও ! বাড়ি গিয়ে পড়তে বসো গে ! পায়রা পোষার নেশাটা বড্ড বাজে।

হঠাৎ নীলুর চোখে পড়ল, নকুলদের বাড়িতে একটা জানলার পর্দা সরিয়ে সেই গুঁফো ভবশংকর তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

নীলু বলল—হ্যাঁগো নকুদা, তোমাদের বাড়ি উনি কে এসেছেন ?

নকুল ঝটপট জবাব দিল—কেউ আসে নি। যাও, বাড়ি যাও।

—না নোকুদা ! কাল বিকেলে আমাদের সঙ্গে আলাপ হল ! নদীর ধারে আমি ছিলুম, দাদুও ছিলেন। বলো না বাবা, কে এসেছেন !

নকুল রাগ দেখিয়ে বলল—কেউ না, বাড়ি যাও বলছি !

নীলু দমল না। একটু হেসে বলল—তোমার মামা, তাই না নোকুদা ? তোমার কলকাতার মামা !

নকুল থাপ্পড় তুলে বলল—ফের বকবক করে, দেব এক থাপ্পড়।

নীলুর ভেতরটা রাগে-দুঃখে জ্বলে গেল। কিন্তু সে দাদুর মতো গোয়েন্দা না হয়ে ছাড়বে না আজ। তাই মুখে হাসি ফুটিয়ে দৌড়ে চলে এল।

কিছুটা আসার পর রাস্তার বাঁকে সে থমকে দাঁড়াল। বাঁদিকে

একটা পোড়ো জায়গা। ঝোপঝাড় রয়েছে। কয়েকটা ভাঙা মোটরগাড়ি পড়ে আছে সেখানে। তার আড়ালে সাবধানে সে চলতে থাকল। একবার উঁকি মেরে দেখল, নকুল বাড়ির ভেতর ঢুকে গেছে।

জঙ্গলের ভেতরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে নীলু নকুলদের বাড়ির পেছনে পৌঁছল। তারপর একটা জানলার নিচে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের ভেতর মামা-ভাগ্নে খুব হাসাহাসি করছে। নকুল বলল—থাপ্পড় তুলতেই লেজ তুলে পালিয়েছে খুদে ছোকরাটা। তুমি ভেবো না মামা, আর এ তল্লাটে ওর আসার সাহস হবে না।

ভবশংকর বললেন—ওর দাদু লোকটা পুলিশের গোয়েন্দা ছিল। হাঙ্গামা বাধাবে না তো?

নকুল বলল—না, না। তার আগেই আমরা ভোঁ-কাট্টা হয়ে যাব।

ভবশংকর বললেন—ট্রেন কটায় খবর নিয়েছ নকুল?

—তা আর নিই নি! বিকেল পাঁচটা দশ-এ। নকুল বলল—চক্রডিহি কখন পৌঁছব মামা?

—চক্রডিহি পৌঁছতে সকাল নটা বেজে যাবে। তবে আমরা আগের স্টেশন গাড্ডুতে নেমে যাব।

—কেন মামা?

—বলা যায় না, অঘোর মিত্তির পুলিশের গোয়েন্দা ছিল তো! পুলিশমহলে এখনও প্রভাব থাকতে পারে। যদি হঠাৎ···

নকুল কথা কেড়ে নিয়ে হাসতে লাগল—তোমার মাথা খারাপ মামা? একটা সামান্য পায়রার জন্যে থানা-পুলিশ করবে নাকি?

ভবশংকর চাপা গলায় বললেন—করতে পারে। কারণ, পায়রাটা সামান্য নয়। নেহাত কপালগুণে হঠাৎ এমন একটা পায়রার খোঁজ পেয়ে গেছি। তুই দেখিস না, কী কাণ্ড করব এবার! আমরা কোটিপতি হয়ে যাব!

নীলু অবাক হয়ে শুনছিল। সে এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে

পারছিল না। তিতিকে পেয়ে লোকটা কোটিপতি হবে? কোটিপতি মানে যার কোটি টাকা আছে···বলে কী!

নকুল বলল—গাড্ড্‌তে নেমে গুরুড়ি যাব কীভাবে?

—বাস আছে। ভাবিস নে, মাইল বিশেক পাহাড়ী পথ মাত্র। জঙ্গল আছে।.

—ওরে বাবা! তাহলে বাঘ-ভালুকও তো আছে!

—তা আছে বইকি!

—কিন্তু ও মামা! পায়রাটা কীভাবে সঙ্গে নেবে?

—আমার কাঁধে একটা ব্যাগ থাকবে। ব্যাগের ভেতর রেখে দেব। পায়ে শক্ত নাইলনের সুতো বেঁধে আটকে রাখব।

এ পর্যন্ত শুনে নীলু আর সহ্য করতে পারল না। তার মনে হল, বুক ফেটে যাচ্ছে। সে চুপিচুপি ঝোপঝাড় গাছপালার ভেতর দিয়ে পালিয়ে এল। রাস্তায় পৌঁছে সে যখন দাঁড়াল, তখন তার দুচোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকল সে। দাদুকে বললে এক্ষুনি দাদু পুলিশ নিয়ে নকুলদের বাড়িতে হামলা করবেন। কিন্তু বদমাস ভবশংকর ধরা পড়ার ভয়ে যদি তিতিকে মেরে পুঁতে ফেলে!

দাদুকে বলে কাজ নেই। এতটা গোয়েন্দাগিরি যখন করতে পেরেছে, তখন আর একটু সাহস করে এগুতে সে পারবে। ওদের পেছনে-পেছনে যাবে। ভিড়ের মধ্যে কোন এক ফাঁকে ভবশংকরের ঝোলায় হাত ভরে তিতিকে তুলে আনবে। তখন ওরা চেঁচামেচি করলেই বরং নীলুর পক্ষে ভাল। সবাই টের পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি স্টেশনের ভিড়ে মামা-ভাগ্নেকে খুঁজে না পায়? তখন দেখা যাবে।

নীলু চুপিচুপি তার ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। অনেক কথা ভাবল। মা তখনও রান্নায় ব্যস্ত। দাদু নিজের ঘরে কাগজ পড়ছেন। নীলু খাতার একটা কাগজ ছিঁড়ে দাদুকে চিঠি লিখতে থাকল।

মামাভাগ্নের চক্রান্তের সব কথা লিখে শেষে লিখল: আমার জন্য

ভেবো না দাদু, আমি তিতিকে উদ্ধার না করে বাড়ি ফিরব না।

তারপর কাগজটা ভাঁজ করে দাদুর ঘরে গেল। দাদু কাগজের আড়ালে। নীলু ভাঁজ করা চিঠিটা চুপিচুপি দাদুর বালিশের তলায় ঢুকিয়ে রেখে এল ....

চার

গাড্ডুর জঙ্গলে

ঘুম ভেঙে কিছুক্ষণ নীলু বুঝতে পারল না কোথায় শুয়ে আছে। নিচে কোথায় প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। আর খুব ঝাঁকুনি টের পাচ্ছে। শরীরেও বড্ড ব্যথা।

তারপর নীলুর সব মনে পড়ল। সে ট্রেনের বাংকাকে শুয়ে আছে। কী ঘুমই না পেয়েছিল! একটুখানি মাথা তুলে সে উঁকি মেরে দেখল, নিচে বেঞ্চে লোকেরা বসে ঢুলছে। কেউ মেঝেতেই বিছানা পেতে গড়িয়ে পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে রাত অনেক হয়েছে। রাতের ট্রেনের একরকম মজা আছে। যেন অন্ধকার ঘুমের দেশ পেরিয়ে চলেছে স্বপ্নের দেশে।

নীলুর এবার ভয় করল চেকারের কথা ভেবে। বকুলপুর স্টেশনে আজ বড্ড ভিড় ছিল। ভিড়ের মধ্যে মামা-ভাগ্নের কাছে ঘেঁষতেই পারেনি। শেষে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ওরা যে-কামরায় চেপেছিল, তার পাশের কামরায় উঠে পড়েছিল সে। তারপর খুশি হয়েছিল দেখে, ওপাশের কামরাটা এ কামরার সঙ্গে জোড়া দেওয়া রয়েছে। মাঝখানে একটা করিডোরের মুখে দরজা আছে। দরজায় উঁকি মেরে দেখেছিল, ভবশংকর আর নকুল একটা জানলার ধারে বসে আনন্দে গল্প করছে। ভবশংকরের কাঁধের ব্যাগটা তখন কোলের ওপর রাখা। নীলু ঠিক করেছিল, রাতে নিশ্চয় ওরা ঘুমিয়ে পড়বে। তখন সে চুপিচুপি গিয়ে তিতিকে বের করে নেবে। তারপর যেখানে ট্রেন দাঁড়াবে, সেখানেই টুপ করে নেমে পড়বে।

কিন্তু সন্ধ্যের মুখে কী একটা জংশনে চেকার উঠেছিল, তখনই নীলুর মনে পড়েছিল, ওই যাঃ! টিকিট কাটা হয় নি!

তার চেয়ে বড় কথা, টিকিটের টাকাকড়িও তো নেই! সে কি জানত, তাকে শেষ অব্দি ট্রেনে চাপতে হবে! অতটা ভাবেনি নীলু। এ কামরায় এক ভদ্রলোক সপরিবারে যাচ্ছেন। স্ত্রী, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটি নীলুর বয়সী। তাকে ওঁরা তপু বলে ডাকছিলেন। তপুর বোনের নাম বুবু, তাও জানতে পেরেছে নীলু।

পুরো একটা বেঞ্চ দখল করে পরিবারটি ঘুমোচ্ছে। নীলু আস্তে আস্তে নামল বাংকার থেকে। ভবশংকর আর নকুলও নিশ্চয় এখন নাক ডাকিয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে।

সে সাবধানে মেঝেয় শোয়া লোকেদের ডিঙিয়ে করিডোরের দরজায় গেল। তারপর উঁকি মারল।

ও কামরার অবস্থাও তেমনি। সবাই ঘুমোচ্ছে। ট্রেন একটা নদীর সাঁকো পেরুচ্ছে। কিন্তু তখন ঝমর-ঝম ঝমরৎঝম সুন্দর শব্দ। নীলু দেখল, মামার কাঁধে ঢলে পড়েছে ভাগ্নে। এই তো সুযোগ।

সে পা বাড়াল, কিন্তু হঠাৎ নকুল ট্রেনের ঝাঁকুনিতে গড়িয়ে পড়ে গেল। ভবশংকর উঠল। নকুল ঘুমজড়ানো গলায় বলে উঠল—উঁহু হু হু হু! গেছি রে বাবা, গেছি!

ভবশংকর কি ঘুমোচ্ছিল না? চোখ বুজিয়ে রেখেছিল শুধু? চোখ খুলে ধমক দিল—অত ঘুম কিসের? এ্যাঁ! অত ঘুম কিসের?

নকুল উঠে বেঞ্চে বসল। সঙ্গে সঙ্গে নীলু সরে এল নিরাশ মুখে। সে ফের সেই বাংকারে উঠে শুয়ে পড়ল। রাতে ট্রেনের দুলুনিতে ফের তার চোখের পাতা বুজে এল।

স্বপ্ন দেখছিল নীলু!

মল্লিকদের বাগানে ন্যাড়া নারকেলগাছটা কেমন করে যেন একটা বুড়ো ঢ্যাঙা মানুষ হয়ে গেছে। আর তার কাঁধে তিতি বক-বকম করছে। হঠাৎ ভুলো নামে কুকুরটা আর হুলো নামে

বেড়ালটা এসে নাচ জুড়ে দিল। সেইসময় বিকট মুখোশপরা ভবশংকর এসে নীলুর গলা টিপে ধরে কানের কাছে শিষ দিতে শুরু করল। উঃ, কানে তালা ধরে যাচ্ছে নীলুর! হুলোটা আর ভুলোটা তাই দেখে মানুষের মতো হাসছে! এদিকে দম আটকে যাচ্ছে নীলুর। আর কানে প্রচণ্ড শিষের শব্দ।

—ও খোকা! এই যে, ও খোকা, শুনছ?

নীলু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। ট্রেনটা হুইসল দিচ্ছে। ভীষণ দুলছে। সকাল হয়ে গেছে। সেই ভদ্রলোক—তপু ও বুবুর বাবা তাকে ডাকছেন—ও খোকা! কোথায় যাবে তুমি?

নীলু উঠে বসল, আস্তে বলল—গাড্ডু।

—গাড্ডু তো এসে গেল। না ডেকে দিলে তো শুকুডি জংশনে চলে যেতে। ভদ্রলোক হাসলেন।

নীলু এক লাফে নামল দরজার দিকে এগোল। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। স্বপ্ন দেখছে না তো? চারদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। কোথাও পাহাড়ের গায়ে সুন্দর জনপদ। অনেক নিচে রূপোলী ফিতের মতো নদী বয়ে যাচ্ছে। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

তপুর বাবা বললেন- ওখানে দাঁড়িও না, খোকা! পড়ে-টড়ে যাবে। এখানে এস।

এইসময় তপু উঠে এসে নীলুর পাশে দাঁড়াল। তার বাবা তাকেও ডাকলেন বারকতক। কিন্তু তপু কানে নিল না। নীলুর কাঁধে হাত রেখে বলল—ওখানে একটা ঝর্না আছে জানো। ট্রেনটা আর একটু গেলেই দেখতে পাবে। আমরা গুমাসে ওখানে পিকনিক করেছিলুম। কী মজাই না হয়েছিল।

নীলু তাকাল তার দিকে, কিন্তু কিছু বলল না।

তপু বলল—সন্ধেঅব্দি থাকলে আরও মজা হত। কিন্তু জানো তো? ওখানে বুনো হাতি আছে, বাঘ আছে, ভালুক আছে।

নীলু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল—যাঃ।

তপু রেগে গেল—আমি মিথ্যে বলছি। এই বুবু শোন, এদিকে আয়।

বুবু তার কাছে এসে বলল—কী দেখছিস রে তোরা?

তপু নীলুকে দেখিয়ে বলল—এ বলছে, ঝর্নাতলার জঙ্গলে হাতি নেই। বাঘ-ভালুক কিচ্ছু নেই।

বুবু নীলুকে বলল—তুমি কখনও গেছ ঝর্নাতলার জঙ্গলে?

নীলু জোরে মাথা দুলিয়ে বলল—নাঃ, আমি তো এই প্রথম গাড্ডু আসছি।

—তাই বুঝি? বুবু চোখ বড় করে বলল—তুমি গাড্ডুতে থাকবে কোথায়?

নীলু মাথা নেড়ে একটু হাসল—জানি না!

—জানো না? বুবু চেঁচিয়ে উঠল। মা-বাবার দিকে ঘুরে ফের বলল—ও বাবা, ও গাড্ডুতে কোথায় থাকবে জানে না বলছে।

তপুর বাবা অবাক হয়ে বললেন—সে কী! তাহলে গাড্ডু যাচ্ছে কেন?

তপুর মা বললেন—হুঁউ। আমি তখন থেকে বলছি না, ছেলেটা বাড়ি পালিয়ে এসেছে। নৈলে সঙ্গে কিচ্ছু নেই, অমন করে কেউ আসে? আর অতটুকু ছেলে।

তপুর বাবা বললেন—ও খোকা, এখানে এস, শোন।

নীলু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তপু অবাক হয়ে তাকে দেখতে দেখতে বলল—তোমার নাম কী?

নীলু জবাব দিল না। তখন বুবু চোখ টিপে হেসে বলল—তুই কারুর সঙ্গে ভাব করতে জানিস নে তপু! দেখবি, আমি জিগ্যেস করলে ও জবাব দেবে।

বলে, বুবু নীলুর চোখে চোখ রেখে আদুরে গলায় বলল—তোমার নাম কী বলো না লক্ষ্মীটি?

নীলু ফিক করে হেসে ফেলল। বলল—নীলু!

বুবু হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। তপু ভেংচি কেটে বলল—

নীলু আবার নাম…নী-লু!

নীলু রেগে গেল—আমার নাম নীলকুমার মিত্র।

বুবু বলল—কোন্ ক্লাসে পড়ো বলো না?

—ক্লাস এইট।

বুবু চেঁচিয়ে উঠল—তপু, তোর ক্লাসে! আমি কোন্ ক্লাসে পড়ি বলো তো?

নীলু বলল—সেভেন।

বুবু আবার নেচে উঠে হাততালি দিল—বাঃ! কেমন করে বলতে পারলে? তুমি হাত গুনতে জানো বুঝি? এই, আমার হাতটা একবার দেখ না। নিশ্চয় তুমি গুনতে জানো।

নীলু মুখ টিপে হেসে বলল—উঁহু, জানি।

তপু আগে হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাত সরিয়ে বুবু বলল—আমারটা আগে। তুই সর তো তপু! খালি ঝগড়া করতেই জানিস। ভাব করতে তো জানিস না কারুর সঙ্গে।

বাঁক পেরিয়ে ট্রেন এখন সিগন্যালের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তপুর বাবা জিনিসপত্র দরজার কাছে এনে বললেন—ওকে কি সত্যিই গণকঠাকুর পেলি তোরা? সরে আয় সব। কুলি ডাকতে হবে!

তপুর মা বললেন—হ্যাঁগো! জিপগাড়িটা দেখতে পাচ্ছ তো স্টেশনে? তোমাদের যা বিদঘুটে গাড়ি! যখন তখন তো বিগড়ে বসে থাকে। এবার বিগড়ে থাকলে কেলেংকারি।

তপুর বাবা বললেন—না-না, ভেবো না। ওই তো মঙ্গল সিং এসে গেছে গাড়ি নিয়ে।

ট্রেন থামল গাড্ডু স্টেশনে। নীলু ওদের পেছন-পেছন নামল। আরও যাত্রীরা নামছে। সে এই ভিড়ের আড়ালে দাঁড়াল। ওপাশের কামরা থেকে লোকেরা নামছে। মামা-ভাগ্নে যদি না নামে!

না, নামছে। ইস্, আর একটু হলেই নকুল তাকে দেখে ফেলেছিল আর কি!

মামা-ভাগ্নে হনহন করে প্ল্যাটফর্মে হাঁটতে-হাঁটতে গেটে গেল।

তারপর গেটের ওপাশে ভিড়ে অদৃশ্য হল। সঙ্গে সঙ্গে নীলুর যেন জ্ঞান হল। সে মরিয়া হয়ে দৌড়ল।

কিন্তু গেটে টিকিট নিচ্ছে যে! সে থমকে দাঁড়াল। তার কান্না পাচ্ছে এতক্ষণে। ওপাশে বড় একটা চত্বরে ঘোড়ার গাড়ি, বাস, কার, জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই তো মামা-ভাগ্নে একটা বাসে উঠে বসল!

তপুর বাবা এসে গেছেন এতক্ষণে। বললেন—কী নীলু! অমন করে দৌড়ে এলে কেন?

নীলু করুণ মুখে বলল—আমি টিকিট কাটিনি!

—তা তো বুঝতেই পারছি! তপুর বাবা হাসতে লাগলেন। কই, এস আমার সঙ্গে। ওগো, তুমি এগোও ওদের নিয়ে। আমি যাচ্ছি।

নীলুকে নিয়ে তিনি স্টেশনের ভেতরে গেলেন। একজন চেকারকে সব বুঝিয়ে বলার পর হাফটিকিটের ব্যবস্থা হল। টাকা মিটিয়ে নীলুর হাত ধরে গেট পেরোলেন। চত্বরে বাসটা ভাগ্যিস দাঁড়িয়ে আছে: ওপাশে একটা জিপের কাছে তপুরা দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের নামই বুঝি মঙ্গল সিং। সে একগাল হেসে সেলাম দিল তপুর বাবাকে।

উনি নীলুকে বললেন—জিপে ওঠ। তারপর তোমার ব্যবস্থা হবে! তোমার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে খবর দেব। এতটুকু ছেলে! এমন করে বাড়ি পালাতে শিখেছ?

নীলু বলল—না-না! আমি বাড়ি পালিয়ে আসিনি! আমি···

—ঠিক আছে। চলো, বাসায় গিয়ে সব শুনব!

নীলু প্রায় কেঁদে ফেলল এবার—আমার পায়রা! তিতি নামে পায়রাটা ওরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে! ওই বাসে চেপেছে ওরা।

তপুর বাবা অবাক হয়ে বললেন—তার মানে? ব্যাপারটা খুলে বলো তো শুনি!

নীলু ঝটপট ব্যাপারটা বলল। ততক্ষণে বাসটা স্টার্ট দিয়েছে। তপুর বাবা দৌড়ে গেলেন—এই, রোখ্‌কে! রোখ্‌কে!

কিন্তু বাসটা থামল না। গুরুডি যাবে বাসটা। সময় হয়ে গেছে। ঢালু পাহাড়ী রাস্তায় বাসটা প্রচণ্ড জোরে নামতে শুরু করেছে।

তপুর বাবা বললেন—শিগগির জিপে ওঠ নীলু! মঙ্গল সিং, বাসটার পেছন পেছন চলো! দেখ, কোথাও পাশ কাটিয়ে বাসটার সামনে যেতে পারো নাকি। বাসটাকে দাঁড় করিয়ে লোকছুটোকে পাকড়াও করব!

নীলু জিপের সামনের দিকটায় তপুর বাবার পাশে বসল। জিপ ছুটল প্রচণ্ড বেগে।

এই পাহাড়ী এলাকার রাস্তা তত চওড়া নয়। মাঝে-মাঝে কোথাও একটুখানি চওড়া জায়গা আছে। সেখানে সামনের গাড়িকে পার করানোর ব্যবস্থা আছে। রাস্তার একধারে খাড়া পাহাড়, অন্য-ধারে অতল খাদ। খুব বিপজ্জনক রাস্তা।

মঙ্গল সিং প্রতিটি জায়গায় গিয়ে বাসটাকে পেরুবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু একগুঁয়ে বাসটা জোরে চলেছে। পেছনের হর্ন গ্রাহ্যই করছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে দুই কোণে চলে গেছে। সেই মোড়ে এসে মঙ্গল সিং বলল—আব ক্যা হোগা স্যার? বাস তো ভাগলবা!

নীলু ছটফট করে বলল—আমাকে নামিয়ে দিন এখানে!

—পাগল হয়েছ! গুরুডি এখান থেকে পনের মাইল দূরে। পরের বাস সেই বিকেলে। তপুর বাবা বললেন—বরং এক কাজ করো। আমাদের ওখানে গিয়ে বিশ্রাম করো। তারপর আমি তোমাকে নিয়ে বেরুব। গুরুডি যাব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।

ডানদিকের রাস্তা গেছে গুরুডির দিকে। বাঁ দিকে একটু তফাতে গাড্ডুর বাজারটা দেখা যাচ্ছিল। নীলু চুপ করে বসে রইল। বাঁদিকের রাস্তায় জিপ চলতে থাকল।

বাজার ছাড়িয়ে কতদূর চলার পর দুধারে শুধু জঙ্গল। নীলু বলল—গাড্ডু ছাড়িয়ে এলুম যে! আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

পেছন থেকে তপু হেসে উঠল। বুবু বলল—আমরা ফরেস্ট বাংলোর কাছে থাকি যে! একেবারে বনের পাশে! রাত্তিরে কত ভুতুড়ে শব্দ না শুনতে পাবে। চলোই না!

নীলু একটু চমকে উঠেছিল। কিন্তু কী আর করবে? তপুর বাবা তো আশা দিয়েছেন।...

পাঁচ

তিতি হল পিংকু

তপুর বাবা অজয়বাবু বন দফতরের অফিসার। কলকাতায় বাড়ি। গাড্ডু ফরেস্ট অফিসে আছেন অনেক বছর। এলাকায় সবাই তাঁকে চেনে। জঙ্গলের আদিবাসীরাও তাঁকে খুব ভক্তি করে।

গাড্ডু থেকে গুরুডি পর্যন্ত বিশমাইল লম্বা আর প্রায় পনের মাইল চওড়া এলাকা জুড়ে গাড্ডু ফরেস্ট-রেঞ্জ। গুরুডির ওপাশেই নেপালের সীমানা। গুরুডি ছোট্ট পাহাড়ী শহর। ওখানে একটা সুন্দর লেক আছে।

সেদিনই বিকেলে অজয়বাবু একা গুরুডি গিয়েছিলেন জিপে। মঙ্গল সিং জিপের ড্রাইভার। কাজেই সে সঙ্গে ছিল। কিন্তু নীলুকে সঙ্গে নেননি অজয়বাবু।

নীলুকে দেখতে পেলে ভবশংকর ও নকুল টের পাবে সব। তাই একা অজয়বাবু তাদের আস্তানা খুঁজতে গিয়েছিলেন।

বিকেলবেলায় তপু আর বুবুর সঙ্গে নীলু জঙ্গলের রাস্তায় একটু ঘোরাঘুরি করেছে। ছোট্ট পাহাড়ের ধারে ছুটোছুটি করে রঙীন পাথর কুড়িয়েছে। নীলুর মনে কিন্তু সুখ নেই। খালি তিতির ভাবনা। তপুর সঙ্গে তার এখন বেজায় ভাব হয়ে গেছে! তপু বলেছে, বাবা কী করছেন, দেখা যাক্ নীলু। তারপর আমি তো

আছিই। তুমি ভেবো না।

বুবু বাঁকা হেসে বলেছে—ইস্! কতবড় বীর তুই! প্যাঁচার ডাক শুনেই ভিরমি যাস।

তপু রেগে গিয়ে বলেছে—দেখিস না, কী করি শেষে। নীলু, ওসব কথায় কান দিও না! এস, আমরা টিপ করি।

নীলু বলেছে—তোমার এয়ার-গান নেই? আমার একটা আছে।

তপু বলেছে—আমারও আছে। আনব?

কিন্তু জঙ্গলে আর পাহাড়ে সূর্য টুপ করে লুকিয়ে পড়ে শিগগির। ঘন ছায়া ঘিরে কুয়াশা ঘনিয়ে ওঠে। আর এই সময় নিচের উপত্যকা থেকে একটা হিমেল হাওয়া উঠে আসে। ঝড়ের মতো বইতে থাকে। হাড়অব্দি কেঁপে যায় হিমে।

তার ওপর জন্তুজানোয়ারের ভয়ও আছে। সব চেয়ে ভয় ভাল্লুকের। এ সময় একরকম ফল ধরে গাছে। সেই ফল খেতে আসে। সামনে পড়লে রক্ষে নেই।

তাই ওরা ফিরে এল বাংলোবাড়িতে। এসেই দেখল, অজয়বাবু ফিরে এসেছেন। বললেন—সে এক কাণ্ড! গুরুড়ি থানায় পুলিশ অফিসার রামনরেশ শর্মা আমার বন্ধু। তাঁর সাহায্যে বদমাস ভুটোর খবর নিলুম। ওরা উঠেছে সূর্য হোটেলে। পুলিশ নিয়ে গিয়ে ওদের ঘর সার্চ করলুম। কিন্তু পায়রা-টায়রা কিচ্ছু নেই।

নীলু বলল—নেই?

—না। তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। ভবশংকর উল্টে শাসাল, আমার নামে মানহানির মামলা করবে বলে। সে নাকি একজন ব্যবসায়ী। কলকাতা থেকে জিনিসপত্র চালান দেয় নেপালে। গুরুড়িতে তাই মাঝেমাঝে আসে। গুরুড়ি হয়েই জিনিসপত্র কাঠমানডু যায় কিনা।

নীলু করুণ মুখে বলল—ওর ঝোলাটা খুঁজে দেখেছেন কাকু?

অজয়বাবু বললেন—হুঁউ সব খোঁজা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, পায়রাটা যে ভাবেই হোক ওর হাত ফসকে পালিয়ে গেছে! হয়তো

ট্রেনে আসতে-আসতে ঝোলা খুলেছিল কোনো কারণে, পায়রাটা জানলা গলে পালিয়েছে।

এবার নীলুর কান্না পেল। তাই যদি হয়, তাহলে তিতি তো বিদেশবিভুঁয়ে পড়ে আর বাড়ির পথ খুঁজেই পাবে না! তাছাড়া মল্লিকদের হুলো বেড়াল কিংবা সেই বাজপাখির মতো কতো বদমাস ওৎ পেতে আছে সবখানে! তিতি যদি তাদের পাল্লায় পড়ে!

অজয়বাবু বললেন—যাক্ গে। ও নিয়ে আর ভেবো না। তোমার বাড়িতে খবর দিচ্ছি…

নীলু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—না, না! তিতিকে না পেলে আমি আর বাড়িই ফিরব না।

অজয়বাবু ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন—তুমি তো ভারি জেদী ছেলে!

বুবু বলল—বারে! পায়রাটা এমনি-এমনি হারিয়ে যাবে? নীলু তুমি ভেবো না, আমরা ঠিক খুঁজে বের করব ওকে।

তার মা রমা বললেন—শুনছ মেয়ের কথা! তোরা কোথায় খুঁজে বের করবি?

—দেখবে'খন। বলে, বুবু তপুর দিকে চোখ টিপল। তপু ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

রাতে খাওয়ার পর তপু, বুবু, আর নীলু একসঙ্গে আলাদা ঘরে শুল। তিনজনে চুপিচুপি পরামর্শ করতে থাকল।

তপু বলল—দেখ নীলু, পায়রা লুকিয়ে রাখা খুব সোজা। পায়রাটা নিশ্চয় ওরা হোটেলের ঘরে ঘুলঘুলিতে লুকিয়ে রেখেছিল। তাই ওটাকে দেখতে পায়নি কেউ।

নীলু বলল—ঠিক বলেছ তপু!

বুবু বলল—তপু, তুই মঙ্গলদাকে দলে টানতে পারবি?

তপু বলল—তার মানে?

—মঙ্গলদাকে চুপিচুপি বলবি, বাবা যখন আপিসের কাজে ডুবে থাকবেন, তখন জিপে করে আমাদের গুরুডি নিয়ে যাবে।

—তারপর ?

—মঙ্গলদা কাছাকাছি কোথাও থাকবে। আমরা চুপিচুপি··· বলে, বুবু একটু থামল। তারপর ফের বলল—এই! হোটেলে চুপিচুপি ঢোকা যাবে তো ?

নীলু কান খাড়া করে শুনছিল। মাথা তুলে বলল—আমরা বলব, হোটেলের একটা ঘরে আমাদের মামা এসেছেন। আমরা দেখা করতে এসেছি! তারপর···

কথা কেড়ে নিয়ে তপু বলল—নীলুর বুদ্ধি আছে, ঠিক বলেছে। এখন ঘুমিয়ে পড়ো সব। সকালে মঙ্গলদাকে আমি ম্যানেজ করে ফেলব। ভেবো না।

বুবু বলল—কিন্তু মঙ্গলদা যদি বাবাকে বলে দেয়।

তপু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল—চুপ! দেয়ালের কান আছে।

তিনজনে চুপ করে রইল। বাইরে একটু দূরে নীচের উপত্যকায় নদীর জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝেমাঝে কী সব অদ্ভুত চিৎকার! জন্তুজানোয়ার আর রাতচরা পাখির ডাক। নীলুর ভয় করছিল। সে তপুর গা ঘেঁষে রইল। তপুটা বেজায় ঘুমোতে পারে।

সকালে অজয়বাবু বেরিয়ে গেছেন। জঙ্গলের ভেতর অনেক আদিবাসীদের গ্রাম আছে। একটা গ্রামে নাকি ইদানিং চিতাবাঘের হামলায় অনেক গরু-বাছুর প্রাণ হারিয়েছে। চিতাটাকে মেরে ফেলার হুকুম এসেছে সরকার থেকে। অজয়বাবু নিজে পাকা শিকারী। বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই।

মঙ্গল সিং জিপে করে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে মাঝপথে। তারপর আর জিপ চলার রাস্তা নেই। বিকেলে ফের গিয়ে খবর নেবে। যদি চিতাটা বিকেলের মধ্যে মারা পড়ে, অজয়বাবুর ফেরার কথা। নৈলে রাত্তিরে জঙ্গলে কাটাবেন। চিতা রাত্তিরেই শিকার করতে ভালবাসে। ওইসময় তাকে ছাগলের টোপ দিয়ে লোভ দেখানো সোজা।

মঙ্গলের ফিরতে দশটা বেজেছে। তপু তাকে সব কথা বললে সে একটু দোনামনার পর রাজী হল। কিন্তু বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে গুরুডি থেকে। কারণ তাকে ফের অজয়বাবুর কাছে যেতে হবে।

খাওয়াদাওয়ার পর তপু মাকে বলল - মা! আমরা মঙ্গলদার সঙ্গে বেরুচ্ছি। নীলুকে একটু ঘুরিয়ে আনি।

রমা খুশি হয়ে বললেন—যাও। ওকে ঝর্না দেখিয়ে আনো বরং। তবে সাবধান, কেউ জঙ্গলের ভেতর ঢুকো না।

একটু পরে মঙ্গলের জিপ গুরুডির দিকে এগিয়ে চলল প্রচণ্ড বেগে।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে সোজা একটা রাস্তা আছে। কিন্তু রাস্তাটা কাঁচা। আবার জায়গায় জায়গায় নিছক নামেই রাস্তা। তবে জিপগাড়ি তো জঙ্গল-পাহাড় খানা-খন্দ ডিঙিয়ে ছুটতে ওস্তাদ। তার ওপর মঙ্গল সিং খুব পাকা ড্রাইভার।

এই সোজা নাক-বরাবর কাঁচা রাস্তায় গেলে গুরুডি মোটে সাত-আট মাইলের বেশি নয়। কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই হয়ে জিপটা গরগর করে এগোচ্ছিল। শরৎকালের ঘন সবুজ গাছপালায় পাখির মেলা বসেছিল। জিপের শব্দ পেয়ে দুধারে পাখিগুলোর পালানো দেখার মতো! তপু আর বুবু তো হেসে খুন পাখিগুলো কী বোকা! কী বোকা!

নীলু গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে ময়ূর দেখা যাচ্ছে। কখনও ছোট্ট নদীর ধারে জল খেতে আসা একপাল হরিণ জিপের শব্দ পেয়ে ছবির মতো স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এসব নদীতে জলের চেয়ে পাথর বেশি। মঙ্গল সিং পাথরের ওপর দিয়ে জিপটাকে গড়িয়ে দিচ্ছে আশ্চর্য দক্ষতায়। যেন যাদুমন্ত্রের জোরে গাড়িটা হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে।

একসময় মঙ্গল সিং বলল—গুরুডি আ গেয়া! উও দেখো!

তিনজনে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে দেখল, সামনে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ছবির মতো ঘরবাড়ি। গুরুডিতে এর আগে তপু আর

বুবু বাবা-মায়ের সঙ্গে অনেকবার এসেছে। কিন্তু রাস্তাঘাট ভাল চেনে না।

তাতে ক্ষতি নেই। মঙ্গল সিং সব চেনে। আর সেই সূর্য হোটেল কোথায়, তাও সে চেনে। কাল বিকেলেই তো অজয়বাবুকে নিয়ে এসেছিল এই জিপে···সূর্য হোটেলেই তো এসেছিল।

সূর্য হোটেল পাহাড়ের গায়ে। কিন্তু সেখানে ঘিঞ্জি বাজার। অজস্র দোকানপাট রয়েছে। জিপ গাড়িটা পাশেই একটা পেট্রোল পাম্পে ঢুকিয়ে মঙ্গল সিং হাসিমুখে নিজের ভাষায় বলল—আমি এখানে গাড়িতে তেল পুরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। যাও, ঝটপট ঘুরে এস হোটেল থেকে। আর শোনো খোকাবাবুরা, শোনো দিদিমণি! যদি কোনো বিপদে পড়ো, জলদি খবর দেবে। আমি আছি, ভয়ডর কোরো না।

তিনজনে জিপ থেকে নেমে রাস্তায় গেল, তারপর থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণে তিনজনের মনেই কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব। যতটা উৎসাহ নিয়ে আসছিল, এখন তা মিইয়ে পড়েছে। লোক-জনের ভিড় আছে। সামনেই সূর্য হোটেল—তিনতলা কাঠের বাড়ি। কতকালের তৈরি কে জানে? কেমন যেন পোড়ো বাড়ির চেহারা। পেছনে বড়বড় দেবদারু আর পাইন গাছের জঙ্গল। হোটেলের সামনে গেট আছে। ফুলের বাগানও আছে। আর আছে কিছু ফলের গাছ। দরজার ভেতরে ম্যানেজারের কাউণ্টার দেখা যাচ্ছে। লাল কতকগুলো সোফা সাজানো রয়েছে। কারা সব বসে আছে লাউঞ্জে। নেপালী দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। একটা লাল ছেঁড়াখোঁড়া ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে। কিন্তু সেটা দুধারে গুটোনো বলেই ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নীলু বলল—শোনো, আমি আগে একা গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা। তোমরা এখানে থাকো!

তপু মাথা দোলাল। বুবু বলল—এই নীলু! তোমাকে যদি গুঁফো লোকটা মারতে আসে?

নীলু বলল—ইস ! মারলেই হল।

তপু বলল—ওকে কামড়ে দিও নীলু ! বলে, খুব হাসতে লাগল সে।

নীলু ভারিক্কি চালে বলল—আমি কুকুর নাকি যে কামড়ে দেব। দেখবে, কী করি ?

বুবু বলল—শিগগির ফিরে এসো কিন্তু !

নীলু হনহন করে এগিয়ে গেল। গেট পেরিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বলল—দারোয়ানজী, আমার মামা কি বেরিয়ে গেছেন ?

দারোয়ান ভুরু কুঁচকে তাকাল। তারপর আঙুল দিয়ে ভেতরে ম্যানেজারকে দেখিয়ে দিল। নীলু সটান ভেতরে ঢুকে ম্যানেজারের সামনে গিয়ে বলল—আমার মামা এই হোটেলে আছেন। উনি কি বেরিয়ে গেছেন স্যার ?

হয়তো স্যার শুনেই রোগা সিড়িঙে চেহারার ম্যানেজার খুশি হলেন। বললেন—মামা ! তোমার মামা কৌন আছে খোকাবাবু ? নাম তো বোলো !

নীলু বলল—ভবশংকরবাবু।

ম্যানেজার ফিকফিক করে হেসে বলল—ভবশংকরবাবুর কেত্তো ভাগনা আছে ? এক ভাগনা তো সঙ্গে এসেছে। তুমি এখন আসছ ! তুমি ছোট ভাগনা আছে ?

নীলু হাসল—হ্যাঁ। যে ভাগ্নে এসেছে, ও তো আমার দাদা।

—যাও। উপরমে দোতলায় যাও। রুম নম্বর এগারো ! মামাকে ভি দেখবে, তোমার দাদাকে ভি দেখবে।

নীলু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে উঠে গেল। দোতলায় লম্বা করিডোর একেবারে ফাঁকা। কাঠের দেয়ালে কত ছবি আঁকা রয়েছে। সব ছবিই ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কেমন একটা পুরনো পুরনো গন্ধ। মেঝে ছেঁড়া কারপেটে মোড়া।

করিডোর দিয়ে এগিয়ে এগারো নম্বর ঘরের সামনে সে দাঁড়াল। কান পাতল দরজায়। শুনল, ভেতরে ভবশংকর বলছে—নোকো ! তাহলে তুই এক্ষুনি চলে যা। গিয়ে রঘুনাথজীকে খবর দে, আমি

আসছি। উনি যেন টাকাকড়ি গেড়ি রাখেন। আমি বেশিক্ষণ থাকব না ওখানে। পুলিশের নজর পড়েছে।

নকুলের গলা শোনা গেল—কেল্লাবাড়িতে যাবে না মামা?

—নিশ্চয় যাব···রঘুনাথজীর ওখান থেকেই যাব। ভবশংকর বলল। খুব নিরাপদ জায়গা কেল্লাবাড়ি। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না কিছু।

—কিন্তু মামা, ওখানে নাকি ভূতপেরেত আছে?

—কে বলল তোকে এই আজগুবি কথা?

—কেন, ম্যানেজারবাবু বলছিল না?

ভবশংকর হাসতে লাগল ওটাই তো রটানো হয়েছে। তা না হলে নিরাপদে থাকা যাবে না। বুঝলি নোকো? ওটাই হবে আমাদের পাকা আস্তানা। ওখান থেকে মজার সুখে কাজকারবার চালিয়ে যাব। থাক্ গে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, তুই এগো।

ভেতরে কাঠের মেঝে বলে নকুলের আসার মচমচ শব্দ শোনা গেল। অমনি নীলু পা টিপে টিপে সোজা করিডোরে এগিয়ে শেষ দিকটায় চলে গেল। তারপর ওদিকের বারান্দায় দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল।

সে উঁকি মেরে দেখল, নকুল বেরিয়ে যাচ্ছে। আহা! কী সেজে-গুজে না বেরুচ্ছে নকুল! নীল প্যান্টের বদলে সাদা ধপধপে ঢোলা পাতলুন, আর গায়ে চকরা-বকরা শার্ট। মাথায় সাদা ক্যাপ। কাঁধে একটা কিটব্যাগ ঝুলছে। ওর ভেতর তিতিকে লুকিয়ে রাখে নি তো?

মনে হয় না। ভবশংকর তিতিকে নিজের কাছেই রেখেছে নিশ্চয়। নকুলটা বরাবর বোকা, বকুলপুরের সবাই তা জানে। যত বদমাস, তত বোকা!

কিন্তু এবার কী করবে নীলু? সে ফের পা টিপে টিপে এগারো নম্বরের দরজায় গেল। ফের কপাটে কান পাতল।

ভেতরে খুটখাট কী সব শব্দ হচ্ছে। নীলু অনেক আশা নিয়ে কান পাতল, যদি তিতির কোনো সাড়া পায়!

কতক্ষণ সে কান পেতে আছে। তারপর ভেতরে ভবশংকরের গলা শোনা গেল—এই ললিছেলে!

অমনি নীলু চমকে উঠল। তাকে কি দেখতে পেয়েছে গুঁফো বদমাসটা? কিন্তু কীভাবে দেখতে পাবে? দরজা তো বন্ধ।

ফের ভবশংকরের হাসি আর কথা শোনা গেল—হুঁ! বড় ললিছেলে তুমি! যা বলব, সব শুনবে? কেমন?

বলে, ভবশংকর শিষ দিতে থাকল। তারপর তিতির সেই সুন্দর 'বক্‌বকম্' ভেসে এল নীলুর কানে। দুঃখে আবেগে নীলু অস্থির, অভিমানে তার চোখে জল এসে যাচ্ছে। তার কত প্রিয় আর আদরের পাখিটা এই বিদেশ-বিভুঁয়ে এক পাজি বদমাসের আদর নিচ্ছে! তিতি, এত নেমকহারাম তুই!

ভবশংকর শিষ দিতে দিতে বলল- তোমাকে এবার নতুন নাম দিচ্ছি শোনো। তুমি আজ থেকে হলে পিংকু। কেমন? পিংকু নামে তোমার মতোই একটা সুন্দর পায়রা ছিল আমার। সেবার এই বর্ডার এলাকাতেই বেচারা বেঘোরে মারা পড়েছিল। তাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলুম। ফেরার পথে হঠাৎ খুব ঝড় উঠল। তারপর খুব শিল পড়ল। ব্যস্‌, হতভাগা পিংকু মারা পড়ল। তাকে পাহাড়ের মাথায় একটা পাথরের খাঁজে খুঁজে পেলুম পরদিন। মরে কাঠ। কাজেই সাবধান পিংকু!

তিতি বলল—বক্ বকম্! বক বকম্···আমি অত বোকা নই!

—হুঁ। সে আমি তোমাকে প্রথম দেখেই বুঝেছিলুম। যাক্ গে, শোনো পিংকু! তুমি বর্ডার পেরিয়ে রোজ যাওয়া-আসা করবে। খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে তোমার পথ! কিন্তু সাবধান, ওখানে ভয়ংকর পাহাড়ী ঈগলের উপদ্রব আছে। নীচের জঙ্গলে আছে ভীষণ বাজপাখি। নজর রেখে চলবে। বেগতিক দেখলে কোনো গুহার মধ্যে ঢুকে পাথরের খাঁজে লুকোবে।

—বক্ বকম্···বক্ বকম্! থাক্ থাক্! আর বলতে হবে না।

—আর শোনো পিংকু! পাহাড় পেরিয়ে যেতে যেতে একখানে

দেখবে গাছের মাথায় বাঁশ বাঁধা রয়েছে। তাতে একটা সাদা পতাকা উড়ছে। ওই হল তোমার নামবার জায়গা। ওখানে নেমে নজর করে দেখবে, একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমার মতো দেখতে। সে হাততালি দেবে। তখন তুমি ওর সামনে টুপ করে ভাঁজকরা কাগজটা ফেলে দেবে। খবরদার, কক্ষনো ওর হাতের নাগালে যাবে না।

—বক্ বকম্···বক্ বকম্! লোকটা ধরে ফেলবে বুঝি?

—হুঁ। তোমার দাম ও জানে। এবার শোনো, কী করতে হবে? কাগজটা খুলে দেখার পর সে আরেকটা ভাঁজকরা কাগজ ছুঁড়ে দেবে তোমার দিকে। তুমি সেটা শূন্যে লুফে নেবে ঠোঁটে। তারপর ফিরে আসবে। কেমন?

—বক্ বকম্···বক্ বকম্! সব বুঝলুম। ভেবো না।

নীলু কাঠ হয়ে শুনছিল। সে ওসব কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিল না। ওভাবে চিঠি পাঠানো আর নিয়ে আসার মানেটা কী? চিঠিতে কিসের খবর থাকবে?

নীলু একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণ।

সেইসময় আচমকা পেছনে পায়ের শব্দ হল। নীলু ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, একজন হিংস্র চেহারার লোক জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটাকে দেখে চীনা বলে মনে হচ্ছে। ভুটানী কিংবা তিব্বতীও হতে পারে।

লোকটা অজানা ভাষায় গলার ভেতর কী বলে উঠল। তারপর দুহাত বাড়িয়ে নীলুকে ধরতে এল।

নীলু পালানোর জন্য পা বাড়াতেই সে খপ করে তার একটা হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নীলু ওর হাতে প্রচণ্ড কামড় বসাল।

লোকটা আর্তনাদ করে নীলুর হাত ছেড়ে দিয়েছে। নীলু সিঁড়ির দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে শুনতে পেল, ভবশংকরের ঘরের দরজা সশব্দে খুলে গেছে এবং ভবশংকর হেঁড়ে গলায় বলছে—কে রে?

ওটা কে পালাচ্ছে রে ?

নীলু যখন সিঁড়িতে নামছে, তখন ওপরে ভবশংকর চেঁচিয়ে উঠেছে ফের—পাকড়ো ! পাকড়ো ! তাই শুনে নীচে ম্যানেজার লাফিয়ে উঠেছে। তারপর সেও 'পাকড়ো পাকড়ো' বলে চেঁচাতে লাগল। লাউঞ্জ পেরিয়ে নীলু এক ধাক্কায় দারোয়ানকে কুপোকাৎ করে বেরিয়ে গেল।

রাস্তার ওপারে পেট্রোল পাম্পে মঙ্গল শিং জিপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তপু আর বুবু উদ্বিগ্নমুখে তাকিয়ে আছে সূর্য হোটেলের দিকে। নীলু একলাফে জিপের পেছনে গিয়ে উঠল।

মঙ্গল সিং বলল—ক্যা হুয়া খোকাবাবু ? হুয়া ক্যা ?

তপু আর বুবু বলল—কী হয়েছে নীলু ?

নীলু শুধু ঠোঁটে আঙুল রেখে ইসারায় বলল—চুপ্।

হোটেলের সামনে তখন ভিড় করে লোকেরা চেঁচাচ্ছে—পাকড়ো ! পাকড়ো !···

ছয়

পথ হারিয়ে জঙ্গলে

নীলু যে এই পেট্রোল পাম্পে জিপের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে, ওরা টের পায়নি। ওরা ভেবেছে, রাস্তা দিয়েই দৌড়ে পালিয়েছে ছেলেটা। ভবশংকর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ম্যানেজারকে খুব হম্বি-তম্বি করছে দেখা যাচ্ছিল।

একটু পরে গণ্ডগোল থামলে নীলু সব কথা বলল। মঙ্গল সিং বলল—লেকিন, আর তো এখানে থাকা যাবে না, খোকাবাবু। বড়াসাবকে আনতে যেতে হবে টিহরি জঙ্গল থেকে। এখনই গাড্ডু না ফিরলে বহুত দের হয়ে যাবে।

বুবু বলল—এই তপু ! এখান থেকে বাস যায় না গাড্ডুতে ?

তপু বলল—যায় তো ! গতবার আমাদের জিপ খারাপ হয়ে গেলে আমরা বাসে চেপে বাড়ি ফিরেছিলুম না ? যাঃ, তোর বড্ড ভুলো মন।

বুবু আসলে ভোলেনি। শুধু মত যাচাই করে নিচ্ছিল এদের, বাসে যেতে চাইবে কিনা। কিন্তু মঙ্গল বাধা দিয়ে বলল—না, না। সাব ঔর মেমসাব আমাকে খুব বকবেন। তোমাদের জন্য বহত শোচ করবেন। এ বাত ছোড়ো।

তপু বরাবর গোঁধরা ছেলে। বুবুও তাকে সায় দিল। আর নীলু তো মনে মনে তাই চাইছে। ভবশংকরের পাকাপাকি ডেরাটা কোথায় আগে জানা খুব দরকার।

অগত্যা মঙ্গল সিং চলে গেল। বলে গেল, সে সোজা টিহরি জঙ্গলে যাবে। বড়া সাবকে সব কথা জানাবে। নৈলে মেমসাবের মুখোমুখি হতে পারবে না সে। মাইজী মেমসাব তার হাতেই না এদের সঁপে দিয়েছেন!

জিপ চলে গেলে তিনটিতে পাম্পের মোটর গাড়িগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে নজর রাখল হোটেলের দিকে। একটু পরে দেখা গেল, ভবশংকর আসছে হোটেল থেকে। তার সঙ্গে রয়েছে নকুল। নকুল ইতিমধ্যে কখন ফিরেছিল তাহলে? মামা-ভাগ্নে রাস্তা ধরে হনহন করে হাঁটতে থাকল। নীলু বলল—এস। এবার ওদের ফলো করি আমরা।

তিনটিতে মামা-ভাগ্নের অনেকটা পেছনে হাঁটতে শুরু করল। রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে তখন। রাস্তায় ভিড় বাড়ছে আরও। সেই ভিড়ে ওদের অনুসরণ করতে অসুবিধা হল না ওদের। নকুল যেন নাচতে-নাচতে হাঁটছে মামার পাশে। হাত-মুখ নেড়ে কী সব বলে চলেছে অনর্গল। বোঝা যায়, খুব খুশিতে আছে নকুল।

বাজার শেষ হয়ে এল। এদিকে ভিড়টা কম। তাই আরও তফাত রেখে তিনটিতে সাবধানে এগোল। বস্তী এলাকা ছাড়িয়ে রাস্তা একেঁবেঁকে নেমে গেছে। হঠাৎ থেমে তপু ভয়-পাওয়া গলায় বলে উঠল—এই! আমরা রাস্তা চিনে বাসস্ট্যাণ্ডে ফিরতে পারব তো? যদি হারিয়ে যাই।

বুবু বলল—যাঃ! কাউকে জিগ্যেস করে নেব'খন, ভাবিস নে!

এইসময় নীলু চাপা গলায় বলে উঠল—এই! ওরা যে রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকছে!

তপু বলল—সরে এস, সরে এস। দেখে ফেলবে। আমরা উঁচুতে আছি যে।

গাছপালার ভেতর নেমে গেছে একফালি পায়ে চলা পথ। পথটায় অজস্র পাথর। পড়ে গেলে হাড়গোড় ভেঙে যেতে পারে। তিনটিতে একটু দোনামোনা করছিল। শেষে নীলু বলল—বরং তোমরা দুজনে ফিরে যাও। গিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করো। আমি ওদের ডেরাটা দেখে আসি একবার।

বুবু ও তপু একসঙ্গে বলল—না, আমরাও যাব।

ফের তিনজনে সাবধানে পা বাড়াল। নিচে ভবশংকরের টাক আর নকুলের সাদা টুপিটা দেখা যাচ্ছে। ওরা নিচে বলেই অনুসরণ করতে অসুবিধে হচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পরে একটা সমতল জায়গায় পৌঁছল ওরা। সামনে ঘন জঙ্গল। এখনই চারিদিকের পাহাড়ের ছায়া এসে জঙ্গলকে প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছে। একটু পরে ওরা মামা-ভাগ্নেকে হারিয়ে ফেলল। জঙ্গল আরও ঘন হয়ে উঠেছে। তিনজনে থমকে দাঁড়াল।

সবাই সবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। এতটা আসার পর সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? নীলু সামনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল—ওই পাহাড়টার মাথায় একটা পুরনো বাড়ি দেখছ?

তপু দেখতে দেখতে বলল—পাঁচিল কত উঁচু! ওখানে কে থাকে?

বুবু বলল—এই, আমার বইয়ে ওইরকম বাড়ির ছবি আছে। ওটা ফোর্ট নয় তো!

তপু বলল—ফোর্ট? তার মানে দুর্গ!

নীলু লাফিয়ে উঠল—দুর্গকেই তো কেল্লা বলে। দিল্লিতে লাল-কেল্লা যেমন। তপু! বুবু! ওটাই তাহলে কেল্লাবাড়ি। ভবশংকর আর নকুল কেল্লাবাড়ির কথা বলছিল বটে।

তপু বলল—নীলু, দেখ দেখ! ওই তো মামা-ভাগ্নে পাহাড়ে উঠছে!

তিনটিতে দেখতে থাকল। পাহাড়ের গায়ে তখনও রোদের ছটা রয়েছে। কেল্লার মাথায় তো লালচে রোদ দেখা যাচ্ছে। তাই ভবশংকর ও নকুলকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তারা পাথরের ধাপে পা ফেলে আস্তে আস্তে উঠছে।

এখানে জঙ্গল ঘিরে তখন ক্রমশ পাহাড়ী কুয়াশা জমেছে। পোকামাকড় ডাকতে শুরু করেছে। কেল্লাবাড়ির ওপর থেকে রোদটা ময়লা হয়ে যাচ্ছে। ভবশংকর ও নকুল পাঁচিলের আড়ালে মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

নীলু বলল—আমার ফিরতে ইচ্ছে করছে না। তোমরা চলে যাও বরং। আমি তিতিকে উদ্ধার না করে ফিরব না।

বুবু খপ করে ওর হাত চেপে ধরে বলল—যাঃ! বাবা-মা ভাববেন না তোমার জন্যে? আমাদের বকবেন যে! এস, চলে এস।

তপুও বলল—না নীলু! সন্ধে হয়ে আসছে যে! এখন জঙ্গলে কত জানোয়ার বেরুবে। আমাদের এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না। শিগগির চলো!

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দূরে আচমকা বাঘের ডাক শোনা গেল। আ-উ-উ-ম্! ঔ-উ-উ-ম্।

তিনটিতে চমকে উঠে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালো। বাঘটা সমানে ডেকে চলেছে ঔ-উংঘ্! ঔ-উংঘ্! ঔংঘ্রা—আঃ! ঔংঘ্রাঃ!

ক্রমশ বাঘটা যেন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনজনে হাত ধরাধরি করে দৌড়াতে শুরু করল।

জঙ্গলের ভেতর কুয়াশা ও অন্ধকার ঘন হয়েছে। কাঁটাঝোপে তিনজনের পোশাক আর হাত-পা ছিঁড়ে ফালা-ফালা হচ্ছে। একবার তপু টোক্কর খেয়ে পড়েও গেল। তাকে দু'জনে টেনে ওঠাল। তারপর ফের ঝোপজঙ্গল ভেঙে দিশেহারা হয়ে এগিয়ে চলল।

কিন্তু সেই পায়েচলা রাস্তাটা কোথায় গেল? এখনও সেখানে

পৌঁছানো যাচ্ছে না কেন? বাঘটা আর ডাকছে না। অন্ধকারে সে হয়তো ওৎ পেতে আছে আশেপাশে। আচমকা হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ে। তিনজনের মনেই এই আতংক জেগে উঠছে।

বুবু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল—ও তপু! ও নীলু! আমরা কি পথ হারিয়েছি?

তপু বলল—চুপ। আমরা ঠিক পথেই যাচ্ছি মনে হচ্ছে।

নীলু বলল—না তপু। বুবু ঠিকই বলেছে, আমরা পথ হারিয়েছি। কিন্তু হারিয়ে গেলে তো চলবে না। জঙ্গল থেকে বেরুতেই হবে।

হঠাৎ তপু বলল—এই নীলু! ও কিসের শব্দ বলো তো?

তিনজনে কান পাতল। দূরে কীসের একটা শব্দ হচ্ছে বটে। খস্‌খস্‌ মট্‌মট্‌ মড়াৎ ঝপ্‌ঝপ্‌

ঝোড়ো হাওয়ায় গাছপালা দুলছে তারই শব্দ! ঝড় আসছে নাকি? নীলু আকাশ দেখার চেষ্টা করল। গাছপালার ঘন ছাদ মাথার ওপর। তারই ফাঁকে কোথাও নক্ষত্র জ্বলছে দেখতে পেল। বলল—মেঘ করেনি। ঝড় এলে তো মেঘ করবে। তাই না?

বুবু ফিসফিস করে উঠল—না নীলু, ঝড় নয়। আমার মনে হচ্ছে

ওর কথা ফুরুবার আগে দূরে বিকট চিৎকার করে উঠল কোন জানোয়ার আঁ-ই-ক্! হোয়াক্! আঁ-ই-ই-ক্!

অমনি তপু বলল সর্বনাশ! বুনোহাতি ডাকছে! পালিয়ে চলো এখান থেকে।

তিনজনে উল্টোদিকে এগোল। বুনোহাতির পাল কোথায় গাছপালা তছনছ করে বেড়াচ্ছে। বুবু বলল—বাবার কাছে শুনেছি, বুনোহাতি অনেকদূর থেকে মানুষের গন্ধ পায়। না রে তপু?

তপু বলল—এতক্ষণ গন্ধ পেয়ে গেছে। আয়, আমরা দৌড়ে চলি।

নীলু বলল—না তপু! দেখছ না, কত পাথর পড়ে আছে। আছাড় খেয়ে মরব যে!

বুবু এই বিপদের মধ্যেও হাসবার চেষ্টা করে বলল—নীলুর জঙ্গলে বেড়ানো অভ্যেস নেই তো!

অভ্যেস নেই বলেই বুঝি এতক্ষণে পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ল। তপু ও বুবু তাকে দুপাশ থেকে টেনে ওঠাল। তপু বলল—লাগল নাকি নীলু?

নীলুর লেগেছিল বাঁ পায়ে। যন্ত্রণা চেপে বলল—না, একটুও লাগেনি।

বুবু বলল—এই, এবার যেন আমরা নামছি। তাই না?

তপু বলল—তাই তো! আমরা নামছি দেখছি। আর খালি পাথর এখানটায়। কেন বল্ তো?

বুবু বলল—ও তপু! আসার সময় যে নদীটা পেরিয়ে এলুম, সেই নদীটা নয় তো?

নীলু কান খাড়া করে কী শুনে বলল—হুঁ, জলের শব্দ হচ্ছে।

তিনজনে সামনে তাকাল। অন্ধকারে সামনের স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না; আবছা বোঝা যাচ্ছে, জায়গাটা অনেকদূর অব্দি খোলা-মেলা। নিচের দিকে ঝরঝর করে জল বয়ে যাচ্ছে কোথাও। তপু বলল—সাবধানে পা বাড়াও।

নীলু চঞ্চল হয়ে উঠল হঠাৎ—ওই তো জল দেখা যাচ্ছে! ওই দেখ, ঝিকমিক করছে!

হ্যাঁ, জলের স্রোতের ওপর তারার আলোর ছটা খেলছে। বুবু খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—নদী! নদী! সেই নদীটা!

তপু ধমক দিয়ে বলল—চুপ! অত চেঁচাবার কী আছে?

বুবু বলল—তখন মঙ্গলদা বলল না, এই নদীটাই গাড্ডুর পাশ দিয়ে আমাদের বাংলোর নিচ দিয়ে গেছে!

নীলু বলল—তাহলে নদীর ধারে-ধারে গেলেই তো পৌঁছে যাব!

তপু বলল—যাঃ! নদীর ধারে-ধারে হাঁটা যাবে নাকি? দুধারে পাহাড় আর এমনি সব পাথুরে জায়গা। তাছাড়াও কত জঙ্গল আছে না? বরং নদীর মধ্যে দিয়ে হাঁটব।

নীলু অবাক হয়ে বলল—নদীর মধ্যে দিয়ে হাঁটা যায় নাকি? ডুবে যাব যে!

ভাই-বোন ওর অজ্ঞতায় হাসতে লাগল। তপু বলল—পাহাড়ী নদী এটা। যদ্দূর গেছে, খালি পাথর আর পাথর। বুঝলে? পাথরগুলোর ফাঁক দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। তবে বৃষ্টিবাদলা নামলে কিন্তু ভারি বিপদ!

নীলু বলল—কেন?

তপু বিজ্ঞের মতো বলল—পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই প্রচণ্ড বান আসে নদীতে। সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পাথরগুলো জলে ডুবে যায় তক্ষুনি। ধস নামে দুধারের পাহাড়ে। সে এক ভীষণ কাণ্ড।

নীলু বলল—আকাশ পরিষ্কার। বৃষ্টি হবে না। এস, আমরা নামি। বলে, সে পা বাড়াতেই পিছলে গেল। তারপর গড়াতে-গড়াতে একেবারে নিচে গিয়ে পড়ল। ভাগ্যিস খানিকটা জল আর বালির ওপর পড়েছিল। তক্ষুনি সে উঠে দাঁড়াল। প্যান্ট-শার্ট ভিজে ভীষণ শীত করতে লাগল।

ওপরে তপু চেঁচিয়ে উঠেছিল—নীলু, নীলু!

নীলু এবার সাড়া দিল—এই যে এখানে।

—তোমরা সাবধানে পা ফেলবে কিন্তু। খুব পেছল হয়ে আছে পাথরগুলো।

তপু বলল—আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না। আমাদের অভ্যেস আছে।

কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে সেও পা পিছলে গড়াতে গড়াতে নীলুর কাছে এসে পড়ল। বুবু ওপর থেকে বলল—ও তপু! তোরা কোথায়?

নীলু বলল—এই তো! তুমি পা দুটো ঝুলিয়ে দাও। আমরা তোমাকে নামাচ্ছি।

জল থেকে উঠে তপু বলল—ইস্! আমার যে বেজায় শীত করছে!

বুবু পা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারে ঠাহর করে ওরা দু'জনে তাকে নামতে সাহায্য করল। তারপর তপু বলল—এস, এবার সাবধানে পাথরে ওঠা যাক। দেখবে, ফাঁকে পা গলে যায় না যেন। নীলু, আমাকে ছুঁয়ে থাকো। আর বুবু, তুই নীলুকে ছুঁয়ে থাকবি!

তখন আছাড় খেয়ে পায়ে ব্যথা লেগেছিল নীলুর। ফের আছাড় খেয়ে ব্যথাটা বেড়েছে। পাথরে উঠতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

একটু পরে তিনটিতে গা ছোঁয়াছুঁয়ি করে পাথরের ওপর সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগল। অন্ধকারে এতক্ষণ কাটিয়ে দৃষ্টি অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। তাছাড়া আকাশের তারাগুলো খুব উজ্জ্বল। তাদের ছটা খেলছে পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে নদীর জলে। জলটা ঝিকমিকিয়ে যেন আলো ছড়াচ্ছে।

দুধারে ঘন জঙ্গল আর পাহাড় কালো দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে-মাঝে শম্বরের ডাক শোনা যাচ্ছে টাঁ-আ-ক্! টাঁ-আ-ক্। কখনও রাতচরা পাখি অদ্ভুত শব্দ করে ডেকে উঠছে। তারপর আবার সব চুপচাপ। কখনও শনশন করে বুকে এসে লাগছে ভুতুড়ে একটা হাওয়া। হাড় হিম করে দিচ্ছে সে-হাওয়া। নীলুর তো কাঁপুনিতে দাঁত ঠকঠক করছে এবার। তার ওপর বাঁ পায়ে যন্ত্রণাটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

কোথাও-কোথাও নদীর বুকে বালির চড়া পড়ে আছে। তপুর যেন সব মুখস্থ। বালির চড়ায় নেমে গিয়ে বলল—এস, একটু জিরিয়ে নিই এখানে।

নীলু কষ্টে বলল আমার হাতটা ধরবে তপু। পায়ে ব্যথা করছে।

বুবু আর তপু নীলুর হাত ধরে বালির চড়ায় নামতে সাহায্য করল। বুবু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল—এই! তুমি আর হাঁটতে পারবে তো?

নীলু আস্তে বলল—পারব।

তপু ভারিক্কি চালে বলল—না পারলে তো চলবে না। এই বনবাদাড়ে পড়ে থাকব নাকি? একটু জিরিয়ে নিয়ে ফের হাঁটব।

হঠাৎ সেইসময় চড়ার ওপাশে কে সাংঘাতিক অট্টহাসি হেসে উঠল, হা হা হা হা হা হা।

নীলুর বুকে ভয়ের হিম থাবা পড়ল যেন। বুবু প্রায় কেঁদে উঠল। চাপা গলায় বলল—ও কী! ও কী রে তপু? এমন করে হাসল কে?

তপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল—এতেই ভয় পেলি? ও তো হায়েনা ডাকছে। রোসো, দেখাচ্ছি মজা বাছাধনকে।

বলে, সে কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে অন্ধকারে ছুঁড়তে শুরু করল। কী একটা জানোয়ার পালিয়ে যাওয়ার শব্দ হল। নীলু তপুর সাহস দেখে লজ্জা পেয়েছিল। তার এত ভয় পাওয়া উচিত হয়নি। সে বলল হায়েনা তো! ছবিতে দেখেছি। ভয় পাবার কিছু নেই বুবু।

বুবু বলল—আর একটু বসবি তোরা তপু? আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

তপু বলল—আমারও।

নীলু বলল—আমারও।

চড়ার পাশে ঝিরঝির করে জল বেয়ে যাচ্ছে। তিনটিতে জল খেতে লাগল তেষ্টা মিটিয়ে।

জল খেয়ে ওরা পা বাড়াতে যাচ্ছে, সেইসময় দূরে নদীর উজানে কোথায় শনশন করে শব্দ উঠল। তারপর ভয়ঙ্কর গর্জন করে মেঘ ডাকল। ওরা আকাশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। কখন আকাশের তারা ঢেকে গেছে ঘন মেঘে। বিজলি চমকাল এবার। ফের মেঘ ডাকল।

তপু বলল—সর্বনাশ! ঝড়বৃষ্টি আসছে যে! আর এখানে থাকা যায় না। চলে এস, পাড়ে ওঠা যাক্।

কিন্তু বিজলির ছটায় দুধারে যা দেখা গেল, ওরা ভরসা পেল

না। নদীর একধারে খাড়া পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে। অন্য ধারে এই বালির চড়ার শেষে এত উঁচু না হলেও প্রকাণ্ড পাথরের তেমনি খাড়া পাঁচিল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নীলু চেঁচিয়ে উঠল—তপু! বুবু! সামনের দিকে কোথাও পাড়ে ওঠার মতো জায়গা পাব। চলে আয় তোরা!

এবার আবেক বিপদের মুখে পড়লেও বারবার বিজলি চমকাচ্ছে। তাই নদীর বুকটা অনেকদূর দেখা যাচ্ছে। ওরা মরিয়া হয়ে পাথরে পা ফেলে-ফেলে চলতে থাকল। ক্রমশ হাওয়াটা বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, পিছনে বুঝি তাড়া করে আসছে হাজার হাজার বুনো হাতির পাল। কড়-কড় কড়াৎ! কানে তালা ধরে যাচ্ছে গর্জনে। পাহাড়ী জঙ্গলে হুলুস্থুল ঘটছে। মড়-মড় করে ডাল ভেঙে পড়ছে। ঝড়টা তুপাশে তু-হাত বাড়িয়ে নীলু, তপু আর বুবুকে যেন ধরে ফেলতে চাইছে।

হঠাৎ একটু দূরে একটা আলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল। তপু চেঁচিয়ে উঠল—আলো! একটা আলো যাচ্ছে। নীলু! বুবু! আয়, আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ডাকি আলোটাকে!

তিনজনে কাঁপা-কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল—এই-ই-ই! এই-ই-ই। এই আলো ও-ও-ও!

উত্তাল ঝড়ের মধ্যে তাদের ডাক কোথায় মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু ফের আলোটা একপলকের জন্যে দেখা গেল। মনে হল, কেউ আলোটা কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে নদী পার হচ্ছে। ঝড়ে আলোটা নিভে যাবে বলেই আড়াল করে রাখছে।

এবার বুদ্ধি করে নীলু চেঁচিয়ে উঠল—বাঁচাও। বাঁ-চা-ও! তপু ও বুবুও তার সঙ্গে গলা মেলাল।

তারপর মনে হল, আলোটা দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ, ফের যেখানে কয়েক পলকের জন্যে দেখা গেল আলোটা, সেখানেই একটু আগে দেখা গিয়েছিল।

বিজলির ছটায় এগিয়ে যেতে অসুবিধে হচ্ছিল না ওদের। ফের আলোটা যখন দেখা গেল, তখন সেটা কাছেই। তারপর কে চেঁচিয়ে উঠল ওখান থেকে—কৌন্ হো-ও-ও!

তিনজনে একসঙ্গে সাড়া দিয়ে বলল—আমরা গাড্ড্ যাব। পথ হারিয়েছি।

—তাজ্জব! আলোওলা লোকটা বলে উঠল।

এবার বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে শুরু করেছে। ঝড় তুলকালাম চলেছে। তিনজনে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লণ্ঠনটা সাবধানে ঝড় বাঁচিয়ে তুলে লোকটা ওদের দেখল। তারপর বলল—আও! আও মেরা সাথ! জলদি আও।

সাত
কেল্লাবাড়ির বন্দী

কী ভয়ংকর রাত! বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে আকাশপাতাল কাঁপিয়ে মেঘ গর্জে উঠছে। কাঠের বেড়ার ঘর একটা। মচমচ করে নড়ছে বারবার। কোণার দিকে আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। সেই আগুন ঘিরে বসে আছে মোংগা সর্দার, তার বউ, তাদের একদঙ্গল ছেলেমেয়ে আর নীলু, তপু, বুবু।

বুড়ো মোংগা এই এলাকার আদিবাসীদের মোড়ল। সে বিকেলে গুরুডির বাজারে মধু বেচতে গিয়েছিল। ফেরার সময় সন্ধ্যাবেলা ঝড়ের মুখে পড়ে যায়। ভাগ্যিস ওর বউ বুদ্ধি করে একটি লণ্ঠন নিতে বলেছিল সঙ্গে। ফিরতে রাত হবার কথা কিনা। আর জঙ্গলের পথে রাতবিরেতে আলো একটা চাই-ই। সর্দারণী বলেছে, সর্দারের সঙ্গে আলোটা না থাকলে নীলুরা বেঘোরে মারা পড়ত।

সর্দারণী ওদের ভূট্টার আটার মোটা-মোটা রুটি আর মধু খাইয়েছে জোর করে। খেতে মন্দ লাগে নি। খিদেও পেয়েছিল প্রচুর।

সর্দার নীলুর বাঁ পায়ের গোড়ালি পরখ করে একটা ওষুধ মালিশ করে দিয়েছে।

ওদিকে ঝড়বৃষ্টি, বাজপড়া সমানে চলেছে।

আগুনের তাপে আরাম লাগছিল। এতক্ষণে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল তিনজনের। সেটা ঠাহর করে সর্দারণী একরাশ শুকনো পাতা বিছিয়ে তার ওপর একটা তালাই পেতে দিল, তারপর শুয়ে পড়তে বলল।

নীলুরা শুলে বুড়ি একটা খসখসে কম্বল চাপিয়ে দিল গায়ে। তপু ফিসফিস করে বলল—ছ্যা! কী বিদঘুটে গন্ধ!

বুবু ধমক দিয়ে বলল—এই পেলি জঙ্গলের মধ্যিখানে, তোর কর্তা-বাবার ভাগ্যি! চুপ করে শুয়ে থাক্।

একটু আগে সর্দার-সর্দারণী গপ্পো করছিল, পাহাড়ের ওপরে ধস না নামে। এমন ঝড়বৃষ্টিতেই তো পাহাড়মুল্লুকে ধস নেমে কত গ্রাম চাপা পড়ে যায়। কত মানুষ আর জন্তুজানোয়ার মারা পড়ে। সেবারকার ধসে গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক লোক মারা পড়েছিল। মোংগা বুড়োর দুটো ছাগল, একটা গরু আর একপাল মুরগি পাথর আর মাটির তলায় চাপা পড়েছিল। সেই বিরাট ধসের তলা থেকে কিছু বের করা অসম্ভব।

নীলুর বুক কাঁপছে তাই। ঘুম আসছে না। বারবার কথাটা মাথায় ভেসে আসছে। তপু আর বুবু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

নীলু যতবার তিতির কথা ভাবতে যাচ্ছে, বাজ পড়ছে, মাটি কাঁপছে আর ধস নামার ভয়টা তাকে নাড়া দিচ্ছে। সে কাত হয়ে দেখল, মোংগা সর্দাররা সবাই কুণ্ডটার চারদিক ঘিরে শুয়ে পড়ল। প্রত্যেকের মাথা আগুনের দিকে! ভারি অদ্ভুত শোয়া তো! চুল পুড়ে যাবে না তাপে?

তারপর কখন নীলু ঘুমিয়ে পড়েছে।

স্বপ্নে তিতিকে দেখল, নীল আকাশে ডিগবাজী দিচ্ছে। নীলু ডাকল—তিতি! খুব হয়েছে। ফিরে আয় বলছি!

ভবশংকর বাজপাখি হয়ে গেল হঠাৎ। নীলু বন্দুক ছুড়ল। গুড়ুম-গুম! আর নকুল মল্লিকদের ভুলো হয়ে তেড়ে আসছে, তার পিঠে হুলোটা বসে আছে।

হুলোটা হঠাৎ ভবশংকর হয়ে গেল। বলল—এই যে নীলু! তোমার তিতি কই?

নীলু ডাকল—তিতি-ই-ই! তুই কোথায়?

ভবশংকর বলল—হালুম! ওরে বাবা, ভবশংকর, না বাঘ? নীলু ভয় পেয়ে পালাচ্ছে আর পালাচ্ছে। কী গভীর বন! কী উঁচু পাহাড়! দৌড়ুনো যাচ্ছে না কেন? দাদু! দাদু! বাঁচাও!

নীলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মোংগা ডাকছিল—খোকাবাবু! খোকাবাবু! ওঠ, ওঠ!

নীলু তাকাল। ভোর হয়েছে। ঝড়বৃষ্টি আর নেই। খোলা দরজার বাইরে ধূসর হয়ে আছে গাছপালা। ঝড়ে কত ডাল ভেঙে গেছে।

শীত করছে খুব! পাহাড়ের দেশে প্রায় বারোমাস কম-বেশি শীত থাকে নাকি। নীলু উঠে পড়ল। মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

তপু ও বুবু কম্বলের তলায় কুঁকড়ে ঘুমোচ্ছে। মোংগা বুড়ো দরজার কাছে বসে কীসব লতা দিয়ে দড়ি তৈরি করছে। নীলু বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

কত উঁচুতে একটা পাহাড়ের গায়ে এই ঘরটা। সামনের দিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ঘন জঙ্গল শুধু। এদিকে-ওদিকে কত পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডানদিকে নিচুতে সেই নদীটা দেখা যাচ্ছে।

তারপর চমকে উঠল নীলু। বাঁদিকে তাকিয়েই চমক খেল।

সেই ন্যাড়াপাহাড়ের মাথায় কেল্লাবাড়িটা!

এত কাছে! একেবারে নাক-বরাবর। উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকলে হয়তো তিনমিনিটও লাগবে না। কেল্লাবাড়ির সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যদিও এখনও কুয়াশা জড়িয়ে আছে বাড়ির গায়ে।

নীলু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল।

আস্তে আস্তে লালচে রোদের ছটা পড়ল কেল্লাপাহাড়ের ওপর। কুয়াশা মুছে গেল। ওই তো পাথরের ধাপগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবার। ভাঙা ফটক। দেয়ালের ফাটলে গাছ গজিয়েছে। তারপর নীলু দেখতে পেল বাড়িটার ছাদে দুটো লোক রয়েছে।

এরা আবার কে? মামা-ভাগ্নেই বটে। একজনের হাতে ছোট্ট কালো কী একটা জিনিস। হুঁ, বাইনোকুলার। ওতে চোখ রেখে সে আকাশে কিছু দেখছে।

তারপর নীলুর বুকে রক্ত ঝিলিক দিল যেন। লোকটা হাত তুলে নাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে··· হ্যাঁ, ওই তো তিতি! সাদা ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল অনেকটা। তারপর ডিগবাজি দিল কয়েকবার।

তারপর সোজা উড়ে চলল। সাদা ডানায় সকালের উজ্জ্বল রোদ। যেন ছোট্ট একটা পরী উড়ে চলেছে রূপকথার দেশে।

নীলু দৌড়ল। পেছনে মোংগা চেঁচিয়ে উঠল—খোকাবাবু! এ খোকাবাবু!

নীলু শুনতেও পেল না।

পায়ে-চলা পাথুরে পথ রাতের বৃষ্টিতে পিছল হয়ে আছে। বাঁ-পায়ের ব্যথাটাও আর টের পাচ্ছে না নীলু।

অনেকটা নিচে খানিকটা সমতল জায়গা। সেখানে পৌঁছে একটু দাঁড়াল সে।

এটা তো একটা কাঁচা রাস্তা। এই রাস্তা দিয়েই বুঝি মঙ্গল সিংয়ের জিপ তাদের কাল গুরুডি নিয়ে গিয়েছিল

রাস্তাটা একলাফে পেরিয়ে ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল কেল্লাপাহাড়ের দিকে।

যতটা কাছে ভেবেছিল, অতটা কাছে নয় কিন্তু। পাহাড় দেখে দূরত্ব ঠিক করা কঠিন। জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। এবার অজস্র ছোট-বড় উঁচু-নিচু পাথর পড়ে রয়েছে। তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে কেল্লা-পাহাড়ের ধাপের কাছে পৌঁছল নীলু।

ধাপের পাশে একটা ভাঙা মন্দির রয়েছে। নীলু মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে মনে মনে বলল—তিতিকে যেন ফিরে পাই! তারপর ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল।

উঠছে তো উঠছেই। ধাপ আর শেষ হচ্ছে না। নীলু হাঁপাচ্ছে। মাঝে মাঝে বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। ফের উঠছে। এমনি করে যখন কেল্লার ফটকের কাছে পৌঁছল, তখন তার গায়ে এতটুকু জোর নেই। সে ধুপ করে বসে পড়ল সেখানেই।

কিন্তু এভাবে বসে থাকলে ওদের চোখে পড়তে পারে। নীলু তাই উঠে দাঁড়াল। তারপর ফটকে উঁকি মারল। বিরাট উঠোনের মতো চত্বরে দেখতে পেল যে, চত্বরের চারদিকে সারবন্দী ঘর। তার মধ্যে ডানদিকের ঘরগুলো বেশ উঁচু। বারান্দায় মস্ত সব থাম।

নীলু পা টিপে-টিপে চত্বর পেরিয়ে বারান্দায় যেই উঠেছে, অমনি তার পাশ দিয়ে দুটো শেয়াল ছুটে বেরিয়ে গেল। নীলু আঁতকে উঠে চোখ বুজেছিল। চোখ খুলে চত্বরে ছুটে পালানো শেয়ালদুটোকে দেখে ভয়টা কাটল।

বারান্দায় সাপের খোলস পড়ে আছে। পড়ে আছে কত জন্তু-জানোয়ারের নাদ। কার্নিশে কত পাখির বাসাও রয়েছে। এমন একটা বিচ্ছিরি জায়গায় ভবশংকররা ডেরা করেছে কেন? অনেক প্রশ্ন মাথায় আসছিল নীলুর।

সে পা টিপে-টিপে এগিয়ে প্রথম ঘরটার দরজায় গেল। দরজায় কোনো কপাট নেই। হয়তো একসময় ছিল। কবে কারা উপড়ে নিয়ে গেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারল নীলু। হুঁ, দুটো বিছানা পাতা রয়েছে মেঝেয়। একটা স্যুটকেসও রয়েছে। নকুলের কিট-ব্যাগটাও আছে। ভবশংকরের কাপড়ের ঝোলাটাও রয়েছে মাথার কাছে। ফ্লাস্ক, টিফিন-কেরিয়ার আরও কত জিনিস ছড়ানো রয়েছে।

পেছনে কোথাও কথাবার্তার শব্দ শুনে নীলু তক্ষুনি ওপাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘাপটি মেরে বসে রইল দরজার পাশে।

মামা-ভাগ্নে ছাদ থেকে নেমে আসছে কথা বলতে বলতে।

ওপাশে কোথাও ছাদে ওঠার সিঁড়ি নিশ্চয় আছে। বারান্দায় ওদের পায়ের শব্দ হচ্ছিল। নীলু কান পাতল।

ভবশংকর বলল—তুই বাবা শিগগির এক ফ্লাস্ক চা নিয়ে আসবি, আর লালাকে বলে আসবি, স্টোভ-কেরোসিন, চাল-ডাল এসব যেন ঝটপট পাঠিয়ে দেয়। ততক্ষণে আমি দুটো পাখি শিকার করে আনি। তুই ফেরার আগেই শিকার হয়ে যাবে।

নকুল খুশি হয়ে বলল—পিকনিক হবে মামা, পিকনিক?

—হ্যাঁ, রোজ দু'বেলা পিকনিক!

ওরা সামনের দিকটায় এলে নীলু চমকে উঠল। ভবশংকরের পিঠে একটা বন্দুক রয়েছে। টোটার মালাও পরেছে সে। কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে গুঁফো বদমাসটাকে।

দুজনে ঘরে ঢুকে পড়ল। নীলু কাঠ হয়ে বসে রইল। পাশের ঘর থেকে ওদের কথাবার্তা ভেসে আসছে আবছা। নীলু বুঝল, তিতিকে কথামতো 'কাজে' পাঠিয়েছে ভবশংকর। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। ছাদে ওরা বাঁশ বেঁধে তার মাথায় সাদা পতাকা টাঙিয়ে এসেছে। তিতি পতাকা দেখে নেমে আসবে।

ফ্লাস্ক নিয়ে নকুল বেরিয়ে গেল বোধ হয়। তার একটু পরে ভবশংকরও বেরুল। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে নীলু বেরুল। সাবধানে চত্বর পেরিয়ে সেই ফাঁকে উঁকি মেরে দেখল, ভবশংকর নেমে যাচ্ছে, নকুলের পাত্তা নেই।

নীলু ওদের ঘরে এসে ঢুকল। গোয়েন্দার মতো ওদের জিনিসপত্র হাতড়াতে থাকল। সন্দেহজনক কিছু পেল না। নকুলের ব্যাগে খালি প্যান্ট, শার্ট এইসব। ভবশংকরের ব্যাগেও তাই। স্যুটকেসে তালা আটকানো। কিছুতেই খোলা গেল না। কিন্তু স্যুটকেসটা এত ভারি কেন? কী আছে ওতে?

এবার নীলু ছাদে ওঠার সিঁড়ি খুঁজতে বেরুল।

বারান্দা যেখানে ঘুরেছে সেখানেই সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে নীলু ছাদে উঠল। ছাদের কিনারা ঘিরে উঁচু পাথরের পাঁচিল রয়েছে।

তার গলাঅব্দি উঁচু। পাঁচিলটায় অজস্র ফোঁকর। এই ফোঁকর দিয়ে বুঝি কেল্লার সৈনিকেরা বন্দুক ছুঁড়ত শত্রুর ওপর।

পাঁচিলের কোণায় একটা লম্বা বাঁশ খাড়া রয়েছে। তার মাথায় সাদা একটুকরো কাপড় টাঙিয়ে রেখেছে। এত উঁচুতে প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে। পতাকাটা পত্‌পত্‌ করে কাঁপছে।

নীলু বড় আশায় ভাবল, এখন যদি তিতি ফিরে আসে তাহলে কত সহজে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবে সে!

নীলু সেই আশায় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিচে দূরে একবার যেন বন্দুকের শব্দ হল কোথাও! ভবশংকর হয়তো পাখি মারল গুলি ছুঁড়ে। ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখিরা উড়ে পালাচ্ছে।

নীলু ফের আকাশে চোখ রাখল। তিতি ফিরছে না কেন? আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, যার কাছে গেছে, সে তিতিকে আটকে রাখল। তাহলে কী হবে? নীলু তো সেই জায়গাটা চেনে না। সে নাকি নেপালে। নেপাল এখান থেকে বেশি দূর নয়। কিন্তু জায়গাটার নাম না জানা থাকলে তিতিকে উদ্ধার করতে যাবে কীভাবে?

তার চেয়ে তিতি ভালোয়-ভালোয় ফিরে আসুক। নীলু ওৎ পেতে রইল। আকাশ উজ্জ্বল নীল। মাথার ওপর একটুও মেঘ নেই। উত্তর দিগন্তে সাদা মেঘের মতো বরফে ঢাকা কত পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। নীলু অজয়বাবুর কাছে শুনেছে হিমালয় ওখানেই। তিতিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে দাদুর কাছে কত গল্প করবে নীলু। ক্লাসের বন্ধুদেরও গর্ব করে বলবে—আমি স্বচক্ষে হিমালয় দেখে এসেছি জানিস?

কিন্তু তাকিয়ে-তাকিয়ে চোখ ব্যথা করছে। তিতি ফিরছে না কেন?

একসময় নীলুর তন্ময়তা কেটে গেল। দূরের আকাশে কালো একটা বিন্দু। বিন্দুটা ক্রমশ সাদা হচ্ছে। তারপর নীলু লাফিয়ে

উঠল। ওই তো তিতি আসছে!

নীল আকাশের পথে সাদা পায়রাটা এগিয়ে আসছে, আরো এগিয়ে আসছে। মাথার ওপর এসে তিতি চক্কর দিতে শুরু করল।

একটু পরে সে পতাকা লক্ষ্য করে নেমে এল। পতাকার মাথায় বসল। অমনি নীলু ডাকল—তিতি! তিতি!

তিতি তাকে দেখতে পেয়েছে। তিতির মুখে একটুকরো ভাঁজ-করা কাগজ। নীলু ফের ডাকল- তিতি, আয়। আমাকে চিনতে পারছিস না তিতি? তিতি! ভাল হবে না বলছি। নেমে আয়। আমি তোকে নিতে এসেছি!

তিতির মুখ বন্ধ। তাই হয়তো বক্‌বকম্ বলতে পারল না। উড়ে এসে নীলুর কাঁধে বসল। নীলু তাকে দু'হাতে ধরে বুকের কাছে এনে বলল— তিতি! আমি তোকে নিতে এসেছি।

নীলুর দু'চোখে জল। সে পায়রাটাকে বুকে রেখে আস্তে ওর ঠোঁট থেকে ভাঁজকরা কাগজটা খুলে নিল। তারপর এক হাতে তিতিকে ধরে কাগজের ভাঁজটা খুলছে, অমনি পেছনে পায়ের শব্দ হল। নীলু ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কেউ তাকে দু'হাতে জাপটে ধরল। নীলুর এক হাতে ছিল পায়রা, অন্য হাতে ছিল কাগজটা। যে ধরেছে সে নকুল। বড়বড় দাঁত বার করে বলল—তবে রে পুঁচকে শয়তান!

আচমকা ওভাবে তাকে চেপে ধরাতে নীলু ভড়কে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ভবশংকর তিতিকে কেড়ে নিল তার হাত থেকে। কিন্তু কাগজটা নীলু চোখের পলকে মুঠোয় লুকিয়ে ফেলেছিল। এবার সে নকুলের পেটে প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি মারল। অমনি নকুল ছিটকে পড়ে গেল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—উ হু হু হু! পিলেটা গুঁড়ো হয়ে গেছে রে বাবা!

নীলু কার্নিশের পাঁচিলে ঝুঁকে ভাঁজকরা কাগজটা ফেলে দিল।

ভবশংকর চেঁচাল—নোকো! নোকো! কাগজটা ফেলে দিল রে! দেখ, দেখ্, কোথায় পড়ল? কুড়িয়ে নিয়ে আয়।

নকুল পেট চেপে ধরে বলল—ও মামা! পিলেটা আর নেই!

ভবশংকর লাথি তুলে তেড়ে গেল—পিলেটা গেছে। এবার লিভারটা আমি গুঁড়ো করে দেব হতভাগা! ওঠ্ বলছি! নিচে কোথায় কাগজটা পড়েছে, খুঁজে আন।

নীলু দাঁড়িয়েছিল কাঠপুতুল হয়ে। যেই ভবশংকর হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেছে, সে সিঁড়ির দিকে ছুটল।

কিন্তু নকুল খপ করে তার ঠ্যাঙ টেনে ধরল। নীলু আছাড় খেল।

নকুল এবার বাগে পেয়েছে নীলুকে। সে ঠাস করে চড় মারল নীলুর গালে। তখন নীলু তার হাতে কামড় লাগাল।

নকুল চেঁচিয়ে উঠল—ও মামা! মামা! কামড়ে দিল যে!

ভবশংকর খপ করে একহাতে নীলুর জামার কলার খামচে ধরে হিড়-হিড় করে টানতে থাকলেন। নীলু তার হাতেও কামড় দিত, কিন্তু নকুল তার দুটো হাত পেছন থেকে ধরে ফেলেছে।

মামা-ভাগ্নে নীলুকে টানতে-টানতে নিচের বারান্দায় নিয়ে এল। তিতি ভবশংকরের হাতের মুঠোয় ছটফট করছে। ভবশংকর বলল—দড়ি বের কর্ নোকো। ছোঁড়াটাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে সাপের ঘরে ফেলে রেখে আয়।

নকুল দড়ি বের করে বলল—সাপের ঘরে মামা! খুব ভাল হবে··· খুব ভাল হবে। পাহাড়ী অজগরটা আজ কার মুখ দেখেছিল গো! কচি মাংস খেতে পাবে।

শুনে নীলুর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।···

আট

অজগরের গুহায়

কেল্লাবাড়ির এদিকটা একেবারে ধসে পড়েছে। তার মধ্যে গুহার মতো একটা ঘর কোনরকমে টিঁকে রয়েছে। ভেতরটা

ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। দরজাও ধসে গিয়ে একটা ফোঁকর হয়ে আছে মাত্র। তার ভেতর দিয়ে নকুল হাত-পা বাধা নীলুকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর হাসিটা তো হাসি নয়, যেন ভাঙা কাঁসির বাজনা।

ভবশংকর ওদিক থেকে বলল—ওখান থেকে শিগগির পালিয়ে আয় না হতভাগা! এই ছোট্ট ছোঁড়াটার চেয়ে অজগরের লোভ তোর ওপরই বেশি হবে।

নকুল আঁতকে উঠে তক্ষুনি পালিয়ে যাচ্ছিল। ভবশংকর ফের ধমক দিয়ে বলল—পাথরটা চাপা দিয়ে আয় দরজার মুখে।

নকুল বলল—খুব ভারি যে মামা! একা ঠেলে নাড়াতে পারব না।

ভবশংকর বলল—দাঁড়া তাহলে, যাচ্ছি!

নীলু আতংকে তাকিয়ে রইল। দরজার ফোঁকরের বাইরে ওদের গতিবিধি দেখতে পাচ্ছে সে! মামা-ভাগ্নে একটা প্রকাণ্ড পাথর ঠেলতে ঠেলতে ফোঁকরটা ঢেকে দিচ্ছে। নীলুর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। গলা শুকনো কাঠ। দেখতে দেখতে পাথরটা ফোঁকর ঢেকে ফেলল। গুহা-ঘর অন্ধকার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বাইরে মামা-ভাগ্নের হাসির শব্দ আবছা শোনা গেল।

গুহা-ঘরে কী একটা বিশ্রী গন্ধ এতক্ষণে টের পেল নীলু। হাত-দুটো আর পা-দুটো শক্ত করে বাঁধা। অতিকষ্টে সে ঘুরে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। তারপর সে অবাক হয়ে টের পেল, ঘরটা সত্যিসত্যি অন্ধকার নয়। উজ্জ্বল রোদ থেকে এসে এতক্ষণ এখানটা অন্ধকার মনে হচ্ছিল। কিন্তু না, ফোঁকরটা পাথর ঢেকে যাওয়ার পর এখন দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতর সব কিছু স্পষ্ট। পেছনে একটু উঁচুতে চওড়া একটা ফাটল রয়েছে। সেখান দিয়ে বাইরের আলো আসছে।

গুহা-ঘরের ভেতর ছোট-বড় ভাঙাচোরা চৌকো আর তেকোণা পাথরের চাঁই পড়ে রয়েছে। কড়ি-বরগা ভেঙে ঝুলছে। কোণার

দিকটায় কিন্তু একদলা অন্ধকার রয়ে গেছে। অজগরটা কি ওখানেই আছে? নীলু কাঠ হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কল্পনায় দেখল, একজোড়া নীল জ্বলজ্বলে হিংস্র চোখ—সে-চোখে পলক পড়ছে না। কারণ সাপের চোখের পাতা থাকে না সে জানে। কল্পনায় ক্ষুধার্ত ভয়ংকর অজগরটার লকলকে জিভটাও দেখতে পেল যেন। ভয়ে নীলু চোখ বুজে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ফের চোখ খুলতে হল। সাপটা কি এগিয়ে আসছে এবার?

বাইরে আকাশে প্লেন যাচ্ছে। তার ঘড়-ঘড় শব্দ হল কতক্ষণ। নীলু সাপটা দেখতে পেল না। অথচ বিশ্রী গন্ধটা রয়েছে। কোথাও লুকিয়ে থেকে সাপটা নিশ্চয় তাকে দেখছে।

নীলুর মনে বাঁচার ইচ্ছেটা এবার তীব্র হয়ে উঠেছে। সে এপাশে-ওপাশে তাকাল। তারপর তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। একটা তেকোণা পাথর কাছেই পড়ে রয়েছে। তার কিনারায় হাতদুটো এগিয়ে বাঁধনটা ঘষতে শুরু করল সে। কিনারাটা ধারালো। দড়ির আঁশ দিব্যি কেটে যাচ্ছে। নীলু জোর পেল মনে। আরও জোরে ঘষতে থাকল।

একটু পরেই হাতের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। এবার সে পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল ঝটপট। তারপর নীলু মুক্ত। উঠে দাঁড়াল।

সেই ফাটলের দিকে তাকাল সে। পাথরের স্তূপের ওপর দিয়ে উঠলে ওখানে পৌঁছানো কঠিন নয়। সে সাবধানে পা বাড়াল। কোণার সেই অন্ধকার জায়গাটার দিকে নজর রাখতে ভুলল না।

ফাটলের কাছে গিয়ে উঁকি মারল নীলু। কিন্তু যা দেখল, তাতে সে হতাশ হয়ে পড়ল। খাড়া নেমে গেছে দেয়াল। দেয়ালের নিচে তেমনি খাড়া পাহাড় অতল খাদের দিকে সোজা চলে গেছে যেন পাতালরাজ্যে। এদিকে পা বাড়ানো মানেই মৃত্যু। হাজার হাজার ফুট নিচে গিয়ে পড়বে এবং ছাতু হয়ে যাবে শরীর।

নিরাশ মনে সেখানে বসে রইল নীলু। একটু দূরে সেই নদীটা

দেখা যাচ্ছে। মোংগা সর্দারের বাড়িটা কোথায় জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে কোথাও মানুষ দেখলে নীলু কি চেঁচিয়ে ডাকবে ?

ডাকলেও কেউ শুনতে পাবে না তার ডাক। এক যদি চোখে পড়ে।

কিন্তু এত উঁচুতে নীলুকে চোখে কি পড়বে কারুর ?

নীলু তক্ষুনি শার্টটা খুলে ফেলল। তারপর সেটা হাতে ধরে অকারণ ফাটলের বাইরে নাড়তে থাকল। যদি দৈবাৎ কারুর চোখে পড়ে।

একে তো শরীর কাল থেকে খুবই কাবু। তার ওপর এতক্ষণ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অজগরের ঘরে প্রাণের ভয়ে কাটাতে হয়েছে। গায়ে জোর বলতে কিছু নেই। একসময় হাত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে শার্টটা ধরে চুপচাপ বসে রইল।

তারপর সে ফের ঘুরে অজগরটাকে খুঁজল। হিংস্র প্রাণীটা নিশ্চয় ওই কোণার দিকেই কোনো খোঁদলে ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভাঙলেই টের পাবে, তার আস্তানায় একটা সুন্দর ছোট্ট মানুষ তারই খিদে মেটাতে অপেক্ষা করছে। তখন প্রকাণ্ড হাঁ করে মাথাটা বাড়িয়ে দেবে এবং টুপ করে গিলে ফেলবে নীলুকে।

হঠাৎ নীলুর চোখ পড়ল, পাথরের স্তূপের ফাঁকে, সামান্য তফাতে। আর ভীষণ আতংকে শিউরে উঠল। ওটা কী চকচক করছে ওখানে ?

সর্বনাশ! ওই তো সেই কালান্তক অজগর সাপটা! দুঃস্বপ্ন নয়, জলজ্যান্ত সত্যি। পাথরের খাঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। মাথাটা কুণ্ডলী থেকে একটু বেরিয়ে আছে। তার খসখসে বাদামী রঙের চামড়ায় ফাটল দিয়ে রোদের ছটা পড়েছে। চকচক করছে।

নীলু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। সাপটা একটুও নড়ছে না। গলার কাছ থেকে পেটের কিছুটা পর্যন্ত অত ফুলে মোটা হয়ে আছে কেন ?

হুঁ, কিছু গিলেছে নিশ্চয়। তাই নড়তে পারছে না। মোংগা সর্দার কাল রাতে গল্প করছিল, এ তল্লাটের পাহাড়ে প্রচুর খরগোস আছে। খরগোসগুলো নাকি হরিণের বাচ্চার মতো বড়ো আর নাদুস-নুদুস। অজগরটা নিশ্চয় সেই খরগোস গিলে ঝিমোচ্ছে। হজম হতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে? তারপব তার ফের ক্ষিদে পাবে। তার আগে কি নীলু এখান থেকে বেরুতে পারবে না?

সে সাবধানে নেমে গেল সেই ফোঁকরের কাছে। পাথরটা দু'হাতে ঠেলতে থাকল। অসম্ভব! একটুও নড়ানো গেল না। সে হতাশ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জামাটা কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে। দরদর করে ঘামছে। গেঞ্জি ভিজে চবচব করছে।

এইসময় বাইরে কারা কথা বলছে শুনতে পেল সে। কান পাতল। এত উঁচুতে প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইছে। আবছা শোনা যাচ্ছে কাদের কথাবার্তা। মনে হচ্ছে, মামা-ভাগ্নে ছাড়া আরও কেউ বা কারা আছে।

কতকগুলো টুকরো শব্দ শুধু শুনতে পেল নীলু।···ট্রাকে করে আনতে হবে···গুরুড়ি···লালাজী···নারায়ণ সিং···জঙ্গলের ভেতর··· পুলিশ···নৌকোর সঙ্গে কাপড়চোপড়···

শব্দগুলো মুখস্থ করে রাখল নীলু। কিছুক্ষণ পরে আর সাড়া-শব্দ নেই। কেল্লাবাড়ির চত্বরে বুঝি বাতাস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শন-শন করে।

নীলু সরে এসে উঁকি মেরে সাপটাকে আবার দেখে নিল। সাপটা তেমনি নিষ্পন্দ।

নীলু ফাটলের কাছে উঠে পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল। মাঝে মাঝে জামাটা নাড়তে থাকল তখনকার মতো। যদি নিচের জঙ্গলে কারুর চোখে পড়ে।

হাতে ক্লান্তি এলে নীলু কিছুক্ষণ জামা নাড়া বন্ধ করে জিরিয়ে নেয়। ফের নাড়ে। এই ভাবে কতক্ষণ সে কাটাল। তারপর চোখের পাতা বুজে এল।

কী যেন স্বপ্ন দেখছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নীলুর। চোখ খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। স্বপ্নটা এখনও দেখছে না তো? কানটা এত সুড়সুড় করছে কেন?

তার কাঁধে বসে আছে তিতি! এ কি স্বপ্ন?

নীলু চেঁচিয়ে উঠেছিল আর কী! চুপ করে গেল। তিতিকে দেখামাত্র ভবশংকর আর নকুলের কথা মনে পড়ে গেছে তার। মনে পড়ে গেছে, সে ওদের পাল্লায় পড়েছিল। এখন এই অজগরের গুহায় বন্দী হয়ে কাটাচ্ছে।

তিতি তার গালে ঠোঁট খুঁটল! তারপর বলল—বক্ বকম্... বক্ বকম্! আমার খুব অন্যায় হয়েছে নীলু, এবারকার মতো ক্ষমা করো।

নীলু দু'হাতে তিতিকে বুকে চেপে ধরল। তার চোখে জল এসে গেছে। চাপা গলায় বলল—তিতি! তোর জন্যে আমার এত কষ্ট।

তিতি বলল—বক্ বকম্! বক্ বকম্। ক্ষমা করে দাও লক্ষ্মীটি। আর কক্ষনো এমন হবে না।

নীলু বলল—আর ওদের কাছে যাবিনে তো?

তিতি বলল—বক্ বকম্। বক্ বকম্! নাক মলছি আবার!

নীলু বলল—বেশ। তাহলে এক কাজ কর তো। একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আয়।

বলে, নীলু ওকে উড়িয়ে দিল ফাটলের বাইরে। তিতি উড়ল আর তারপরই চত্বরের ওদিকে নকুলের চিৎকার শোনা গেল—ওই তো পায়রাটা! মামা! মামা! ওই দেখ তোমার পিংকু!

ভবশংকরের শিষ শোনা গেল এবার। আগের মতো চাপা শিষ নয়। খুব জোরালো হুইসলের মতো তীক্ষ্ণ আওয়াজ।

নীলু উঁকি মেরে লক্ষ্য রেখেছিল তিতির দিকে। তিতি কিন্তু সোজা নেমে চলেছে পাহাড়তলীর দিকে।

ভবশংকর গর্জে উঠে বলল—হারামজাদা নোকো! তোরই জন্যে

পিংকু পালিয়ে গেল !

নকুল বলল—না মামা ! খেতে বসেছি, তখন হঠাৎ উড়ে গেল বদমাসটা, ধরতে পারলুম না। তারপর খুঁজে বেড়ালুম কতক্ষণ। আমার কী দোষ ?

নীলু ভেবে পেল না, ওদের কথাবার্তা এখন এত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কেন ? সে উঁকি মেরে ডাইনে ঘুরতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

কেল্লার খানিকটা অংশ ফাটলের ওপাশে চারকোণা হয়ে বেরিয়ে রয়েছে। অনেকটা ব্যালকনির মতো। হয়তো কেল্লার মালিক কোনো রাজারাজড়া ওখানে বসে বন ও উপত্যকার দৃশ্য দেখতেন। মামা-ভাগ্নে ওখানেই দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

ভবশংকর বলল—যাক্ গে। পালায় তো পালাক। আমার একদফা কাজ তো হয়ে গেছে। নারায়ণ সিং খবর পেয়ে গেছে। ওতেই কাজ হবে। কোটিপতি না হই, আধকোটিপতি তো হবই।

খুশিতে নকুল হাসতে হাসতে বলল—কিন্তু নারায়ণ সিংয়ের সেই চিঠিতে কী লেখা ছিল জানা গেল না মামা ? চিঠিটা ক্ষুদে শয়তানটা কোথায় যে ফেলে দিল খুঁজেই পেলুম না। মামা, যদি লেখা থাকে, আজ ট্রাক পাঠাবেন না, তাহলে ?

ভবশংকর বলল—পাগল ! নারায়ণ সিং দু'কথার মানুষ নয়। টিহরির জঙ্গলে লালাজীর ট্রাক অপেক্ষা করবে। কাপড়চোপড়ের সঙ্গে মালটা আনবে। বোঝাই করে গুরুভি আনা হবে। বুঝলি তো ? তারপর তুই ট্রাকের সঙ্গে কলকাতা রওনা দিবি। আমি যাব ট্রেনে। সাবধান ! পুলিশ যেন সন্দেহ না করে।

নকুল বলল—ভেবো না, আমি এ কাজে খুব পাকা।

—জানি বলেই তো তোকে সঙ্গে নিয়েছি এবার।

—মামা !

—কী রে নোকো ? অমন করে তাকাচ্ছিস কেন ?

—ক্ষুদে শয়তানটার কী হাল হল, দেখব একবার ?

—এতক্ষণে অজগরটা ওকে গিলে ফেলেছে।

—কিন্তু কই ? চেঁচানি তো শুনলুম না ! তুমি শুনেছ নাকি ?

—শুনব কেমন করে ? তখন আমরা নিচের ঝর্নায় নাইতে গেলুম না ! মনে হচ্ছে, তখন গিলে ফেলেছে। তা না হলে এখন সাড়াশব্দ পেতুম !

—না মামা, আমার সন্দেহ হচ্ছে। ছোঁড়াটা বরাবর খুব সাহসী আর ভীষণ চালাক। আমাদের বকুলপুরের ছেলে, আমি চিনি না।

—ঠিক বলেছিস। আয় তো, একবার পাথরটা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি !

নীলু চমকে উঠেছিল। হাত-পায়ের বাঁধন খোলা আছে এবং এখনও অজগরের পেটে যায়নি দেখে মামা-ভাগ্নে এবার কী করে বসবে বলা যায় না।

সে গুহা-ঘরের ভেতর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। ওই অন্ধকার কোণার দিকটায় লুকিয়ে থাকলে ওরা তাকে দেখতে পাবে না।

নীলু সেখানে পাথরের স্তূপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রইল। একটু পরে পাথরটা সরিয়ে দু'জনে উঁকি মারল। তারপর নকুল খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে বলল—নেই, মামা, নেই ! গিলে ফেলেছে।

ভবশংকর বলল—ভাল করে ছাখ্ তো।

—বলছি না, এতক্ষণে হজম হয়ে গেছে পেটে।

—থাম। আমি দেখি।

—সাবধান মামা। অজগরটা তোমাকেও হজম করে ফেলবে।

ভবশংকর হ্যা-হ্যা করে হাসল— ওরে হতভাগা ! অজগর একবার আহার করলে অন্তত দুদিন ধরে তা হজম করে, বুঝলি ! একেবারে নড়তে পারে না।

বলে, সে এগিয়ে গেল ভেতরে। তারপর ফাটল দেখে বলল—ওইখানে সকালবেলা বসে রোদ পোহাচ্ছিল সাপটা। তখনই আমার চোখে পড়ে যায়।

হঠাৎ নকুল বাপরে বলে আঁতকে উঠল—মামা ! মামা ! কী

একটা পালিয়ে গেল পায়ের ফাঁক দিয়ে।

ভবশংকর বলল—দূর বোকা! পাহাড়ী খরগোস ওটা।

নকুল সাহস পেয়ে ফের হেসে বলল—একেই বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, মামা!

ভবশংকর এপাশে-ওপাশে তাকাচ্ছিল। নকুল তার পাশ কাটিয়ে ফাটলের কাছে উঠে গেল। বাইরেটা দেখে বলল—এখান থেকে পড়লে একেবারে অক্কা। তাই না মামা?

—তা আর বলতে। আড়াই হাজার ফুট খাড়া পাথরের দেয়াল নেমে গেছে। পড়লে একেবারে ছাতু। বলেই, ভবশংকর লাফিয়ে উঠল—ওরে বাবা!

নকুল বলল—কী মামা, কী হয়েছে? চমকালে কেন?

—ওই দেখ, অজগরটা ওখানে ঝিমোচ্ছে! পেটটা বস্তার মতো মোটা। বলে, ভবশংকর হ্যা-হ্যা-হ্যা করে খুব হাসতে লাগল।

নকুল সাপটাকে দেখতে দেখতে বলল—নীলুকে গিলেছে, তাই না মামা?

—হুঁউ!

—আচ্ছা মামা, যদি এখন ছোরা দিয়ে পেটটা ফেড়ে দিই, নীলু বেরিয়ে আসবে তো?

—বোকো, তুই একটা আহাম্মক! বেরিয়ে আসবে কী করে, ওতো এখন ছাতু।

নকুল চোখ বুজে কাঁধ নাড়া দিয়ে বলল—মাইরি মামা। ভাবতে গা শিউরে উঠছে। বকুলপুরের মিত্তিরদের নীলু এখন অজগরের পেটে ঢুকে বসে আছে। ওঃ!

—নে বাবা! তোর হলটা কী?

নকুল বলল—হাজার হোক পাড়ার ছেলে তো বটে!

ভবশংকর থাপ্পড় তুলে বলল—ন্যাকামি হচ্ছে। চলে আয় এক্ষুনি। ভারি দয়া দেখানো হচ্ছে। ও জ্যান্ত থাকলে আমাদের কী সর্বনাশ হত ভেবে দেখেছিস?

নকুল যেতে যেতে কয়েকবার ঘুরে সাপটাকে দেখল। তারপর দু'জনে বেরিয়ে গেল। পাথরটা আর আটকাল না দরজার ফোঁকরে। তাই নীলু সাবধানে গুঁড়ি মেরে বেরুল এবং কাটলের কাছে গিয়ে বসল। তিতির অপেক্ষা করতে থাকল। ওকে গাছের পাতা আনতে বলেছে। আনলে তাতে কাঠির আঁচড় কেটে চিঠি লিখে পাঠাবে গাড্ডুতে অজয় বাবুর কাছে।

কিন্তু কোথায় তিতি! দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে। তিতি ফিরছে না।...

নয়

মোংগা সর্দারের ছেলে

মোংগা সর্দারের ছেলে গেনু ভারি ডানপিটে। হবে নাইবা কেন? জঙ্গলে ওর জন্ম। জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় সেই এতটুকু থেকে। এখন বয়সে নীলুর মতো। তপুর মতো। পাখি ধরা ওর নেশা। ফাঁদ পেতে পাখি ধরে গুরুডিতে বেচতে যায়। ওর বয়সী ছেলেমেয়েরা পোষবার জন্যে কেনে।

তবে গেনু রাগীও কম নয়। পাখি যদি ফাঁদ এড়িয়ে ঘোরে, সে শেষ অব্দি গুলতি ছুঁড়ে মারে। তাতে পাখিটা মরে মরুক! মরলে আগুনে ঝলসে রোস্ট করে খাবে। গেনুর বুঝি খিদে পায় না জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে? খিদে পেলে তখন ইচ্ছে করেই গুলতি ছুঁড়ে মারে। পুড়িয়ে মনের সুখে চিবিয়ে খায়! তারপর ঝর্নার জল খেয়ে গাছের তলায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়।

রাতে বাবুবাড়ির তিনটে ছেলেমেয়েকে তার বাবা একরকম কুড়িয়েই এনেছিল জঙ্গল থেকে। সকালে উঠে গেনু তাদের সঙ্গে ভাব করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই ভোরবেলা ফাঁদকাঠির আঠা খুঁজতে বেরিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, একটা ছেলের পাত্তা নেই।

মোংগাসর্দার কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি করেছিল। তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। সকালে নাকি ছেলেটা জঙ্গলের ভেতর দাঁড়িয়েছিল। ডাকলেও মানা শোনে নি। বাঘের পেটে গেছে বলে মোংগা সর্দারের মুখ চুণ। গেনু বলেছিল একটু পরে জঙ্গলে যখন পাখি ধরতে যাবে, তখন ওকে খুঁজে দেখবে।

তারপর কোত্থেকে একটা মোটর গাড়ি এল। গাড়িটা বাকি ছেলেমেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেল। যাবার সময় ড্রাইভার সর্দারের সঙ্গে কীসব কথাবার্তা বলে গেল, গেনু বুঝতে পারে নি। গেনু ড্রাইভারটাকে চেনে। গাড্ডুর মঙ্গল সিংকে কে না চেনে! বনে অনেক রকম পাখি ও জন্তু মারলে সরকারী লোকেরা এসে পাকড়াও করে। মঙ্গল সিংকে গিয়ে ধরাধরি করলে সে বলে-কয়ে ছাড়িয়ে দেয়।

মঙ্গল সিং গেনুকেও বলে গেছে, খুঁজে দেখবি ছেলেটাকে। বড় সাহেব কাল থেকে কোথায় চিতাবাঘ শিকারে গেছেন। ফেরেন নি। এদিকে মেমসায়েব ছেলেমেয়েদের জন্যে কেঁদেকেটে সারা। তাই মঙ্গল সিং বাকি ছেলেমেয়ে দুটোকে বাড়ি নিয়ে গেছে। ফের ওবেলা আসবে হারিয়ে যাওয়া ছেলেটার খোঁজে।

গেনু আজ সারা দুপুর জঙ্গল-পাহাড় চষে বেড়িয়েছে। তারপর বাবার কথা মনে পড়েছে। ছেলেটা হয়তো কেল্লাপাহাড়ে উঠে বসে আছে। সর্বনাশ! ওটা তো অজগরের ডেরা। ভয়ে কেউ ওর আনাচে-কানাচে পা বাড়ায় না। কেল্লাপাহাড়ে নাকি একটা-দুটো নয়, অসংখ্য অজগর আছে।

তা মোংগা সর্দার তো বুড়ো মানুষ। বেশি উঁচু পাহাড়ে আর চড়তে পারে না। গেনু ছেলেমানুষ। সে পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ। সর্দার ছেলেকে বলেছে কেল্লাপাহাড়ে গিয়ে খোঁজ করতে।

তাই গেনু কেল্লাপাহাড়ের আনাচে-কানাচে ঘুরছে কতক্ষণ। কিন্তু অজগরের ভয়ে চড়তে সাহস পায় নি। গেনুর রাগ হয়েছে, শহরের বাবুবাড়ির ছেলেপুলেদের এত সাহস ভাল নয়। নিশ্চয়

ছেলেটার মাথার গণ্ডগোল আছে।

দুপুরে ক্লান্ত গেনুর কিদে পেয়েছিল! গুলতি ছুঁড়ে একটা ঘুঘুপাখি মেরেছিল সে। তারপর আগুন জ্বালানো তো সোজা কাজ। তার ছোট্ট থলেতে দু'টুকরো কাঠ আছে। কাঠদুটোকে ঘষাঘষি করে আগুন জ্বেলেছে শুকনো পাতায়। ঘুঘুটার ছাল ছাড়িয়ে একটা কাঠিতে গেঁথে আগুনে ঝুলিয়ে রেখেছে। রোস্ট করে খেয়েছে। পাহাড়ী মুল্লুকে নুনের বড় অভাব। গুরুডি থেকে ভাগ্যিস সেদিন একটু নুন কিনেছিল গেনু! নুনটা বাবা-মাকে লুকিয়ে পাতার মোড়কে মুড়ে রেখেছে। ছোট্ট থলের মধ্যে সেটা লুকোনো আছে। দেখতে পেলে বাবা-মা ওটা নিয়ে নেবে। ঘুঘু-পোড়া নুন মাখিয়ে খেতে কী অপূর্ব স্বাদ।

ঝর্নার জল খেয়ে গেনুর ঘুম পাচ্ছিল। ঝাঁকড়া গাছটার তলায় ঠাণ্ডা ছায়ায় একটা চওড়া পাথরে চিত হয়ে শুয়েছিল সে। তার চোখের ওপর একটু তফাতে কেল্লাপাহাড়ের খাড়া দেয়াল। একবার দেয়ালের মাথায় কী যেন নড়তে দেখেছিল। অজগর ভেবে আর তাকাতে সাহস পায় নি।

শুধু অজগরকেই তার যত ভয়। বাঘভাল্লুক আসুক না! পরোয়া নেই। পাথর ছুঁড়ে ভাগিয়ে দেবে। কিন্তু অজগরের চোখে যাদুমন্তর আছে। যার দিকে সে তাকাবে, সেই অবশ হয়ে যাবে। একটুও নড়তে পারবে না। আর রাক্ষুসে সাপটা তখন প্রকাণ্ড হাঁ করে তার দিকে এগিয়ে আসবে। গিলে খাবে। চোখের সামনে একদিন গেনু দেখেছিল, একটা হরিণের বাচ্চাকে কীভাবে অবশ করে গিলে খেল একটা অজগর। হরিণের বাচ্চাটা পালাতে পারত সহজেই। পালানোর চেষ্টাও করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সেই ভীষণ দৃশ্য সব সময় মনে পড়ে গেনুর। একটু-একটু করে গিলে খাওয়ার চেয়ে ভয়ংকর আর কিছু নেই।

তা গেনুর মনের তলায় একটা গোপন ইচ্ছে আছে, বড় হয়ে একটা অজগর সে মারবেই।

গেনু চোখ বুজে ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বড্ড আরাম। চোখের পাতায় ঘুম এসে ছুঁয়েছে। সেই সময় হঠাৎ মাথার ওপর গাছের পাতায় বুঝি একটা শব্দ হল। একটা আবছা ঝটপট শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলল গেনু। কেল্লাপাহাড়ের ভয়ংকর অজগর কি তাকে দেখতে পেয়ে চুপিচুপি হাজির হয়েছে?

কিছু দেখতে পেল না বটে কিন্তু ঝটপট শব্দটা হচ্ছে গাছের ওপর। গেনু তড়াক করে উঠে বসল।

তারপর চোখে পড়ল, একটা সুন্দর সাদা পায়রা ডানা নেড়ে এই গাছটার মাথায় উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছে। ডালপালা আর পাতা এত ঘন যে পায়রাটা বুঝি বসার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু ও কী? মনে হচ্ছে পায়রাটার বসার মতলব আদতে নেই। সে ডানাদুটো মেলে রেখেছে এবং কাঁপাচ্ছে। আর পাতার বোঁটায় ঠোক্কর দিচ্ছে। এই গাছটার নাম মেথুগাছ। মেথুগাছের ডাল যেমন শক্ত, পাতা বা বোঁটাও তেমনি শক্ত। সহজে ছেঁড়া যায় না। পাতাগুলো খুব চওড়া, তিনকোণা। খুব পুরু। আর একটা দিক ঘন সবুজ, অন্যদিক ধূসর। জোর হাওয়া দিলে মনে হয় গাছটার অসংখ্য কান আছে এবং সেইসব কান নাড়া দিচ্ছে। পলকে-পলকে সাদা ও সবুজ রঙের খই ফুটছে বুঝি গাছের মাথায়।

পায়রাটা পাতা ছিঁড়ে কী করবে ভেবেই পেল না গেনু। কিন্তু অমনি তার মাথায় একটা মতলব এসে গেল। এমন সুন্দর একটা সাদা পায়রা ধরতে পারলে অনেক পয়সা হবে। গুরুডিতে লালাজী বলে একজন ব্যবসায়ী আছে। তার পায়রা পোষার খুব সখ। ধরতে পারলে তাকেই বেচবে গেনু। হায় হায়! কেন সে বুদ্ধি করে এগাছে ফাঁদটা পাতে নি!

গেনুর হাতের টিপ খুব ভাল। আস্তে আস্তে সে থলে থেকে গুলতি বের করল। পায়রাটাকে প্রাণে না মেরে মাটিতে নামানোর কথা ভাবল। কীভাবে সেটা করা যায় সে জানে। কোনো উড়ন্ত পাখির ডানার ডগায় কিছু আচমকা গিয়ে লাগলেই পাখিটা ভয়

পেয়ে এবং ব্যালান্স হারিয়ে ধুম করে পড়ে যায় মাটিতে। গেনু তা জানে।

এজন্য একরকম গুলি দরকার। গুলিটা পাতাজড়ানো ছাই আর আটা দিয়ে তৈরি। বেশ হাল্কা গুলি। লাগলে তত ব্যথা পায় না পাখিরা!

থলি হাতড়ে একটা সেইরকম গুলি বের করে গুলতিতে গুলি জুড়ল গেনু। এই একটা মোটে গুলি। ফসকালে খুব পস্তাতে হবে।

গেনু সাবধানে পাথরের খাঁজে লুকিয়ে থেকে গুলতি ছুঁড়ল।

গুলতির গুলি পায়রাটার ডানার কোণায় গিয়ে লাগতেই পায়রাটা একটুকরো দলাপাকানো কাগজের মতো টুপ করে এসে সামনে পড়ল। অমনি গেনু খপ করে ধরে ফেলল।

আশ্চর্য, সাদা পায়রাটা একটুও ডানা ঝটপট করছে না কেন? গেনু অবাক হয়ে গেল। তাহলে কি এটা কারুর পোষা পায়রা?

তাহলে সে তো আরও ভাল। বেশি দামে লালাজীকে বেচতে পারবে। বলবে, আমার পোষা পায়রা এটা।

গেনু খুশিতে নাচতে-নাচতে বাড়ি ফিরে গেল। তারপর তক্ষুনি গুরুডি চলল নদী পেরিয়ে। তার মা বলল, সর্দারকে নিয়ে গাড্ডুর সেই বড়সাহেব কোথায় যেন বেরিয়েছে। মোটরগাড়িটা ফের এসেছিল। মঙ্গল সিংও এসেছিল। গাড্ডুর বড়সায়েব নাকি জঙ্গলের মালিক। গেনুর মায়ের খুব গর্ব, গেনুর বাবাকে জঙ্গলের মালিকেরও দরকার হয়। এ কি কম কথা।

বিকেল হয়েছে। গুরুডি থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। সেই ভয়ে গেনু সারাপথ প্রায় দৌড়েই চলল।

গুরুডির লালাজীর দোকানে তখন ভিড় রয়েছে। বাবুলোকেরা কেনাকাটা করছে। কত আজব রঙীন জিনিস, খেলনাপত্তর আর কাপড়চোপড় বিক্রি করে লালাজী।

কোণার দিকে লালাজী বসে আছে। নাদুস-নুদুস প্রকাণ্ড কুমড়োর মতো চেহারা। গেনু একটু ভড়কে গেল। যদি ধমক

দেয় লালাজী? তার মতো একটা জংলী ছেলের কথায় সে কি কান দেবে? শুধু একটা আশা, লালাজীর বাড়ির মাথায় পায়রার 'বোম' আছে। উঁচু বাঁশের ডগায় টং বানানো আছে। পায়রার ঝাঁক সেখানে বসে থাকে।

গেনু চুপটি করে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হাতের মুঠোয় পায়রা।

কতক্ষণ পরে লালাজীর চোখ পড়ল গেনুর ওপর। বলল—কে রে তুই? এখানে কী করছিস? ভাগ, ভাগ!

গেনু আরও ভড়কে গেল। কী করবে ভাবছে, হঠাৎ লালাজী তার হাতের পায়রাটা দেখে ফেলল। বলল—ওটা কী রে? পায়রা! কোথায় পেলি পায়রা? কই, দেখি দেখি!

গেনু এবার সাহস পেয়ে একগাল হেসে এগিয়ে গেল গদীর কাছে। বলল—জঙ্গলে ধরেছি লালাজী। খুব ভাল পায়রা। আপনি এটা নেবেন?

লালাজী খপ করে পায়রাটা ওর হাত থেকে প্রায় কেড়েই নিল, তারপর তার চেহারা কেমন যেন বদলে গেল। গেনু সেটা লক্ষ্য করে খুব অবাক হল। লালাজী পায়রাটা ভাল করে দেখে পাশের একটা লোকের দিকে চোখের ইশারা করল। লোকটার চেহারায় ডাকুর আদল। লোকটার চোখ জ্বলে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

লালাজী চাপা গলায় বলে উঠল—সেই পায়রাটাই বটে! দেখেই চিনেছি।

ডাকু চেহারার লোকটা বলল—কিন্তু এ জংলী ছোঁড়াটা কীভাবে ধরল ওকে? ভবশংকরবাবু বলছিলেন, পায়রাটা পালিয়ে গেছে।

লালাজী বলল—চুপ। ছোঁড়াটা টের পাবে।

গেনু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে ডাকু লোকটা একটু হেসে বলল—ও ব্যাটা জংলী এসব বোঝে না। হ্যাঁ রে ছোঁড়া, কী বলছি আমরা বুঝতে পারছিস?

গেনু একটু হেসে জোরে মাথা দোলাল।

লালাজী বলল—আমার বরাত। কিন্তু ওরে ভৈরব। ভবশংকর যদি টের গায়, ওর পায়রা আমার কাছে আছে, আমাকে খুন করে ও এটা কেড়ে নেবে।

ভৈরব হাসতে হাসতে বলল—জানতে পারলে তো। বরং যদি হুকুম দেন, ভবশংকরবাবুকে পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব, আর ওঁর ভাগ্নেটাকে কেল্লাবাড়ির অজগরের মুখে ফেলে দেব।

লালাজীর কুতকুতে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। বলল—পারবে হে ভৈরব?

—খুব পারব।

—তাহলে তাই করো।

—ওরা কেল্লাপাহাড়ে ডেরা পেতেছে। তাই কাজটা সহজ হবে। কেউ টের পাবে না।

—হ্যাঁ। কিন্তু সন্ধ্যার পর ওরা তো ট্রাকে মাল নিয়ে কলকাতা চলে যাবে বলছিল।

—ভবশংকরবাবু যাবে না। ওর ভাগ্নে যাবে। সকালে স্টোভ আর আনাজপাতি দিতে গেলুম কেল্লাপাহাড়ে, তখন আমাকে বলছিল।

—তাহলে তুমি এখনই চলে যাও ভৈরব। এই নাও, কিছু আগাম দিলাম। কাজ শেষ করে এলে বাকিটা দেব।

পকেট থেকে একগোছা নোট বের করে দিল লালাজী। ভৈরব টাকাগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল। গেন্টুর মনে কথাগুলো তোলপাড় হতে থাকল। কিন্তু মাথামুণ্ডু খুঁজে পেল না। কেল্লাপাহাড়ে কারা যেন আছে। তাদের একজনকে পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। অন্যজনকে অজগরের সামনে ঠেলে দেবে। ওরে বাবা! কী সাংঘাতিক ব্যাপার! গেন্টু শিউরে উঠল।

লালাজী বলল—কী রে জংলী ছোঁড়া! পায়রাটার জন্যে কত দাম নিবি?

গেন্টু কত দাম বলবে ভেবেই পেল না। পায়রাটা যে লোকটার,

তাকে ভৈরব পাহাড় থেকে ফেলতে গেল। নিশ্চয় খুব দামী পায়রা। কিন্তু কত দাম এর?

গেনু তবু ক্যালক্যাল করে তাকাচ্ছে দেখে লালাজী কেমন হাসল, —এটা চুরি করে আনিস নি তো?

গেনু জোরে মাথা দোলাল। বলল—না লালাজী! ঠাকুরবাবার দিব্যি, ওটা কেল্লাপাহাড়ের কাছে ধরেছি।

—হুঁউ। বুঝেছি। এই নে, এক টাকা দাম দিচ্ছি।

এক টাকা! পুরো একটা টাকা! কাগজের টাকা? গেনু কখনও পুরো একটা টাকা পায়নি পাখি বেচে। সে নেচে উঠল। কাগজের টাকা ছোঁয়ার খুব সখ ছিল তার। আজ সে কাগজের টাকার মালিক হতে চলেছে।

লালাজী কাগজের নোট এগিয়ে দিতে সে ভক্তি দেখিয়ে নিল। তারপর চোখ বুজে প্রায় এক দৌড়ে পালিয়ে এল। যদি লালাজী টাকাটা ফেরত নেয়।

বাজারের শেষদিকে একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়াল গেনু। ইচ্ছে করলেই আজ সে বাবুদের মতো ভাল খাবার খেতে পারে। কিন্তু তাহলে যে কাগজের টাকাটা বাবামাকে দেখিয়ে আনন্দ পাবে না গেনু! ভাই-বোনদের দেখাবে। আরও সব জঙ্গলের লোকদের দেখাবে।

বেলা পড়ে আসছে। লোভ দমন করে গেনু পা বাড়াল। জঙ্গলের রাস্তা ধরল। একটু পরেই তার চোখে পড়ল কেল্লাপাহাড়টা জঙ্গলের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

গেনু যেন নেশার ঘোরে কেল্লাপাহাড়ের দিকে পা বাড়াল। ওখানে আজ বড় ভয়ংকর ঘটনা ঘটবে। ভৈরব কিছু করার আগে গেনু যদি চেঁচিয়ে বলে দেয়—বাবুমশাই, আপনাদের ও খুন করতে এসেছে, তাহলে লোক দুটো বেঁচে যাবে।

অজগরের ভয়টা ভুলে গেনু কেল্লাপাহাড়ের দিকে দৌড়ে চলল। ওই পাহাড়ের উল্টোদিকে খুব কাছেই তাদের গ্রাম।

বিকেলে জঙ্গলে পাখপাখালিরা ডাকছে। মাঝে মাঝে দূরে কোথাও বুনোহাতির পাল গাছপালা ভাঙছে, আর বিকট চিৎকার করে উঠছে। একবার কোথায় যেন বাঘের ডাকও শুনতে পেল গেনু। কিন্তু সে তো জঙ্গলের ছেলে। ওসব শুনে-শুনে আর তার ভয় করে না। বুনো হাতি বা বাঘ-ভালুক এড়িয়ে কীভাবে জঙ্গলের পথে চলতে হয় সে জানে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নাক-বরাবর এগিয়ে কেল্লাপাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেল। পাহাড়টার নিচে গাছপালা বড় একটা নেই। অজস্র উঁচু-নিচু পাথরের স্তূপ রয়েছে। তার ভেতর গুঁড়ি মেরে সে এগোল—পাছে ভৈরবের নজরে পড়ে যায়।

কিন্তু ভৈরব কোথায়? এত শিগগির অত উঁচু পাহাড়ে ধাপ বেয়ে উঠে পৌঁছানো সোজা নয়। পাথরের আড়াল থেকে গেনু ভৈরবকে খুঁজতে থাকল।

একটু পরেই সে দেখল, ভৈরব সবে ধাপের নিচে ভাঙা মন্দিরের পেছন থেকে বেরুচ্ছে। গেনু উঁকি মেরে দেখতে লাগল তাকে!

ভৈরব ধাপ বেয়ে এবার কেল্লাবাড়ির দিকে উঠতে শুরু করেছে।

গেনুর মাথায় একটা মতলব খেলল। সে পাথরের আড়াল থেকে হাঁটু গেড়ে বসে গুলতি তাক করল ভৈরবের দিকে।

বাঁটুলের মতো ছোট্ট নুড়িটা ভৈরবের পিঠে লাগল। অমনি ভৈরব থমকে দাঁড়াল। ফের আরেকটা বাঁটুল ছুঁড়ল গেনু। তারপর একটার পর একটা ছুঁড়তে লাগল। ভৈরব তখন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে যেন। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। উঁচু ধাপের ওপর বসে পড়েছে সে।

আরও গোটাকতক বাঁটুল খেয়ে ভৈরব আর স্থির থাকতে পারল না। আচমকা ধাপ বেয়ে পড়ি কী মরি করে নামতে শুরু করল। শেষে টোক্কর খেয়ে একেবারে গড়াতে-গড়াতে নিচে এসে পড়ল। তারপর গেনু শুনল, ভৈরব রাম রাম বলে চেঁচাচ্ছে। চ্যাঁচাতে

চ্যাঁচাতে ভৈরব ঠিক তাড়াখাওয়া খরগোসের মতো পালিয়ে গেল।

গেনু আপন মনে হিহি করে হেসে উঠল। ভৈরব ব্যাপারটা ভূতের কীর্তি ভেবেই পালিয়ে গেল।

গেনু একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ মনে পড়ল কেল্লাপাহাড়ের অজগরের কথা। তখন সে পা বাড়াল। এখান থেকে তাদের বাড়ি বেশি দূরে নয়।

কিন্তু যেই সে ঘুরেছে, তার চোখ পড়ল একটু তফাতে পাথরের ওপর সুন্দর একটা ছেলে চুপচাপ বসে আছে।

দশ

নীলু ও গেনুর কীর্তি

তিতি ফিরল না দেখে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর নীলু দর ার ফোঁকরে উঁকি মেরেছিল। একটু পরে যখন মামা-ভাগ্নে বেরিয়ে গেছে, তখন সেও চত্বরে বেরিয়েছে।

মামা-ভাগ্নে ধাপ বেয়ে নেমে কোথায় গেল কে জানে। তখন নীলু নেমে এল কেল্লাপাহাড় থেকে। তিতি কেন ফিরল না, মাথায় সেই ভাবনা।

কেল্লাপাহাড়ের নিচের জঙ্গলে যেদিকটায় তিতি উড়ে গিয়েছিল, সেখানে এসে মনমরা হয়ে বসে আছে। তিতি নিশ্চয় বাজের পাল্লায় পড়েছে। নীলুর চোখ জলে ভরে গেল। সে ঝর্নার পাশে একটা পাথরের ওপর চুপচাপ বসে রইল। খিদেতেষ্টার কথা ভুলে গেল।

কতক্ষণ পরে সে চমকে উঠেছে। পেছনে খসখস শব্দ করে কী আসছে। ঘুরতেই দেখল, গলায় লাল পুঁতির মালা পরা, মাথায় রঙীন পালক গোঁজা একটা তার বয়সী জংলী ছেলে তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

তক্ষুনি তাকে চিনতে পারল নীলু। এ তো মোংগা সর্দারের ছেলে।

আর গেনুও চিনতে পেরেছে নীলুকে। এ তো সেই হারানো ছেলেটা।

গেনু বলল—তুমি এখানে কী করছ? তোমার জন্যে সবাই খুঁজে সারা হচ্ছে এতক্ষণ।

নীলু শুকনো মুখে বলল—এই! তুমি তো এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আমার তিতিকে দেখেছ?

—তিতি! গেনু অবাক হয়ে বলল, সে আবার কে?

নীলু আকাশ দেখতে দেখতে জবাব দিল—একটা সাদারঙের পায়রা।

অমনি গেনু লাফিয়ে উঠল—সাদা পায়রাটা তোমার নাকি? আমি যে সেটাকে ধরে বেচে এলুম গুরুডির লালাজীর কাছে। আমি কি জানি, ওটা তোমার পায়রা?

নীলু একলাফে পাথর থেকে নেমে গেনুর হাত ধরে বলল—চলো না, আমরা লালাজীর কাছে যাই! তুমি জানো না, তিতিকে একটা লোক ধরে নিয়ে এসেছিল। তার পেছনে-পেছনে আমি এতদূরে চলে এসেছি।

গেনু বলল—টাকাটা এক্ষুনি ফেরত দেব লালাজীকে। পায়রাটা চাইব। এস তো আমার সঙ্গে।

দু'জনে তক্ষুনি জঙ্গল ভেঙে হনহন করে চলতে থাকল।

পথে গেনু যা-যা শুনেছে, সব বলল নীলুকে। নীলুও তার সব কথা গেনুকে বলল। গেনু অবাক হয়ে গেল।

নীলু বলল—টিহরির জঙ্গলটা চেনো তুমি?

গেনু বলল—টিহরি? সে তো ওদিকে। আমি চিনি। পাকা রাস্তা চলে গেছে গাড্ডুব দিকে। মোটরগাড়ি চলে সবসময়।

দু'জনে এভাবে কথা বলতে বলতে গুরুডি পৌঁছুল। তখন দিন ফুরিয়ে এসেছে। সবে রাস্তার ধারে আর দোকানপাটে বাতি জ্বলে

উঠেছে।

লালাজীর দোকানে তখনও কেনাকাটার ভিড়। গেনু নীলুকে দাঁড় করিয়ে রেখে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল।

নীলু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। মনে খুব আশা। সেইসময় একটা বাস এসে ওপাশের স্ট্যাণ্ডে ঢুকল। বাসটার মাথায় লেখা আছে 'গাড্ড্...গুরুডি ভায়া টিহরি।' অনেক লোক নামছে। নীলু ভাবল, তিতিকে পেলে এই বাসে গাড্ড্ ফিরে যাবে। তারপর তপুদের বাড়ি রাতটা কাটিয়ে কাল রেলস্টেশনে যাবে। সেখান থেকে সোজা বকুলপুর।

হঠাৎ সে দেখল, বাস থেকে তপু আর বুবু নামছে।

নীলু চেঁচিয়ে উঠল—তপু! বুবু!

ওরা দৌড়ে এল নীলুকে দেখতে পেয়ে। তপু বলল—তুমি এখানে আছ নীলু? ওদিকে বাবা আর একজন বুড়ো ভদ্রলোক মঙ্গলদার জিপে জঙ্গল খুঁজে বেড়াচ্ছেন! মোংগা সর্দারকেও সঙ্গে নেবার কথা।

বুবু চোখ পাকিয়ে বলল—বুড়ো ভদ্রলোক কী বলছিস তপু? উনি নীলুর দাদু না?

—দাদু! নীলু চেঁচিয়ে উঠল। দাদু এসেছেন নাকি?

—হ্যাঁ। তপু বলল। বাবা! তুমি যা ছেলে, ভাবা যায় না! আমরা ভেবে সারা।

বুবু বলল—থাম্ তো! তোকে গারজেনগিরি ফলাতে হবে না।

নীলু বলল—তোমরা গুরুডি চলে এলে যে? কার সঙ্গে এসেছ?

তপু চোখ টিপে বলল—আমরা মাকে লুকিয়ে চুপটি করে চলে এসেছি।

বুবু বলল—আসব না? তোমার জন্যে ভেবে সারা হচ্ছি না। আমিই তো তপুকে বললুম—চল্ না, আমরা সেই কেল্লাপাহাড়ে গিয়ে খুঁজব।

নীলু একটু হেসে বলল—সন্ধেবেলা কীভাবে খুঁজতে যেতে?

খুব সাহস তো তোমাদের ?

তপু বলল—সাহস বুঝি তোমার একার আছে ?

বুবু বলল—না নীলু, বাসটা রাস্তায় বিগড়েছিল যে। তাই সন্ধে হয়ে গেল। আমরা তো সেই আড়াইটেতে চেপেছি। দু-তিনঘণ্টা ধরে সারাল মিস্তিরি। তবে না ফের স্টার্ট দিল !

তপু বলল—তা, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ ? চলো, বাসটা একটু পরেই ফের গাড্ডু যাবে। আমরা ওতে ফিরব।

বুবু বলল—তার আগে চলো নীলু, কিছু খেয়ে নেবে। খাবারের দোকানে যাই। আমাদের কাছে পয়সা আছে। এস ! তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে ক্ষিদেয়।

নীলু শুকনো হাসল—নাঃ,আমার ক্ষিদে পায় নি।

তপু বলল—ওখানে দাঁড়িয়ে কী হবে ? এস, বাস-স্ট্যাণ্ডে যাই তাহলে।

নীলু বলল—যাব। দাঁড়াও, মোংগা সর্দারের ছেলে ফিরে আসুক।

বলে, সে সংক্ষেপে সব ঘটনা বলতে থাকল। শোনার পর তপু ওর কাঁধে হাত রাখল। বুবু ওর একটা হাত ধরল। দু'জনে একসঙ্গে বলল—খুব বেঁচে গেছ তো !

এইসময় গেনু ফিরে এল। মুখটা চুণ। তিনজনকে একসঙ্গে ফের দেখে সে অবাকও হল। নীলু ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করল—কী বলল লালাজী ?

গেনু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল—দিল না। আমাকে থাপ্পড় মারল। ঠেলে বের করে দিল দোকান থেকে। থামো, আমার নাম গেনু। জঙ্গলের বুদ্ধি খাটাব। পায়রাটা চুরি না করে যাচ্ছি না এখান থেকে।

তপু বলল—কীভাবে চুরি করবে ? কোথায় রেখেছে তিতিকে জানো ?

গেনু চোখ নাচিয়ে বলল—ওই তো দোতলায় পায়রার টং দেখা যাচ্ছে। ওখানেই পায়রার খাঁচা আছে। আমি জঙ্গলে কত উঁচু-

উঁচু গাছে চড়তে পারি। ওই নল বেয়ে দোতালায় চলে যাব, তারপর দেখবে কী করি। তোমরা বরং কোথাও লুকিয়ে থাকো। দেখতে পেলে সন্দ করবে লালাজী।

তপু বলল—লালাজী আমাদের চেনে নাকি? বরং এক কাজ করি। আমরা লালাজীর কাছে যাই। গিয়ে খেলনা কেনার ছলে ওকে ভুলিয়ে রাখি। তুমি সেই সুযোগে পাইপ বেয়ে দোতলায় ওঠ। পেছনে বাগান আছে দেখছি। ওদিকে যাও। কেউ দেখতে পাবে না। ফিরে এসে তুমি শিস দেবে। কেমন?

গেনু তক্ষুনি পাশের গলিটা দিয়ে লালাজীর বাড়ির পেছনের দিকটায় চলে গেল। এরা তিনজনে দোকানে ঢুকল।

লালাজী তিনজনকে দেখে খুব খাতির করে বলল—ক্রিকেট ব্যাট চাই? নাকি ব্যাডমিণ্টন? যাও, যাও খোকাবাবুরা! ওই দেখ, ওখানে কত সুন্দর সুন্দর ব্যাট আর র‍্যাকেট রয়েছে। খুব সস্তায় দেব। আর ছোট্ট দিদিমণি, তোমার কী চাই?

বুবু বলল—লালাজী, আপনার দোকানে ভলিবল নেই?

—আছে বইকি! তুমি ভলিবল খেল বুঝি?

—হুঁউ।

—ওরে, একে ভলিবল দে। যাও ছোট্ট দিদিমণি, ওখানে যাও।

তিনজনে খেলার সরঞ্জাম তো কিনতে ঢোকে নি। লালাজীকে ভুলিয়ে রাখতেই হবে। তাই গদীতে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল।

লালাজী বলল—যাও, ওখানে গিয়ে দেখ সব!

নীলু বলল—লালাজী, আপনার দোকানে এয়ার-গান নেই?

—আছে…তাও আছে। কিনবে একটা?

—কিনব।

তপু বলল—লালাজী, আপনার দোকানে খেলনার ট্রেন নেই?

লালাজী বলল—আছে, আছে, রেল লাইন সুদ্ধ আছে।

বুবু বলল—লালাজী, আপনার দোকানে সেই পুতুল আছে—ঝমর ঝমর করে নাচে, আর হাততালি দেয়?

—আছে। লালাজী এবার বিরক্ত হয়ে বলল। তোমরা কিছু কিনবে, না খালি আমায় বকিয়ে মারবে? তোমরা থাকো কোথায় বলো তো?

তপু ঝটপট বলল—গাড্ডুতে। আমার বাবা ফরেস্ট অফিসার অজয় রায়।

লালাজী চোখ কপালে তুলে বলল—ওরে বাবা! তোমরা অজয়বাবুর ছেলেমেয়ে? বাঃ বাঃ! তোমার বাবা কেমন আছেন? ওরে গঞ্জু সন্দেশ নিয়ে আয়! তা হ্যাঁ গো, তোমার বাবাও এসেছেন? কোথায় তিনি?

বুবু বলল—পেট্রোল-পাম্পে। জিপে ডিজেল ভরতে গেছেন।

লালাজী ব্যস্ত হয়ে উঠল। সন্দেশ আনতে দিল একটা লোককে। তারপর আপন মনে বলল—তুচ্ছাই? ভৈরবটা এখনও ফিরল না কেন?

তিনজনে চোখাচোখি করে হাসছিল। এতক্ষণ গেনু নিশ্চয় ছাদে চড়তে পেরেছে। কিন্তু তিতিকে ওখানেই রেখেছে তো লালাজী?

নীলু আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল—লালাজী, তখন দেখলুম আপনার বাড়ির মাথায় পায়রার টং রয়েছে। আপনি বুঝি পায়রা পোষেন?

লালাজী বলল—হ্যাঁ। বলেই কেমন চোখে তাকাল নীলুর দিকে।

তপু বলল—পায়রা! বাঃ! আমারও পায়রা পুষতে ইচ্ছে করে লালাজী।

লালাজী বলল—এ বয়সে পায়রা-পায়রা করতে নেই!

বুবু হেসে বলল—লালাজী, একজাতের পায়রা আছে,সে নাকি কথা শোনে। সত্যি নাকি লালাজী?

লালাজী যেন চমকে উঠল। তারপর বলল—আমি তেমন পায়রা কখনও দেখিনি ছোট্ট দিদিমণি! ওসব মিথ্যে কথা।

মুখ ফসকে বুবু বলে উঠল—এই নীলুর একটা সাদা পায়রা ছিল…

—হ্যাঁ! বলে লালাজী নড়ে বসল। সাদা পায়রা?

বেগতিক দেখে নীলু বলল—হ্যাঁ। কিন্তু সেটা বাজের মুখে মারা পড়েছে।

তপু ফিক করে হেসে বলল—মারা পড়া কি সোজা? ভেব না নীলু, তোমার পায়রা কবে না কবে ফিরে আসবে।

লালাজীর লোক সন্দেশ এনেছে। প্লেটগুলো এগিয়ে দিয়ে লালাজী বলল—সন্ধেবেলা পায়রা-পায়রা করতে নেই। নাও, খেয়ে ফেল খোকাবাবুরা! ছোট্ট দিদিমণি, নাও। খেয়ে-টেয়ে তোমাদের যা সব পছন্দ, বেছে নাও। ব্যাট, র‍্যাকেট, ভলিবল—যা যা নেবে, নাও: ওগুলো তোমাদের উপহার দেব। বুঝলে তো? তোমরা ফরেস্ট অফিসারের ছেলেমেয়ে! তোমাদের উপহার না দেব তো কাদের দেব?

ধূর্ত লালাজী হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল!

নীলু ও তপু চোখ-তাকাতাকি করছিল—সন্দেশ খাওয়া উচিত হবে কি? কিন্তু বুবু চোখ টিপে হেসে খেতে শুরু করল। দেখাদেখি ওরাও মুখে তুলল। আর নীলুর পেট তো খিদেয় চোঁ-চোঁ করছিল!

সন্দেশ খেয়ে জল খেয়ে তিনটিতে এবার উঠবে ভাবল। এতক্ষণ গেনু তিতিকে নিয়ে নিশ্চয় অপেক্ষা করছে বাইরে।

কিন্তু সেই সময় বাড়ির ভেতর দিক থেকে একটা হট্টগোল শোনা গেল। তারপর কারা পেছনের দিকটায় চেঁচিয়ে উঠল—চোর! চোর! চোর!

লালাজী লাফিয়ে উঠেছিল। একটা লোক পাশের দরজা থেকে বেরিয়ে বলল—লালাজী! লালাজী! আপনার পায়রা চুরি করতে ঢুকেছিল চোর! তাকে ধরে ফেলেছি!

লালাজী গর্জে উঠলেন—নিয়ে আয় চোর ব্যাটাকে! আমার সামনে নিয়ে আয়, দেখাচ্ছি মজা!

দোকানের খদ্দেররা এদিকে দৌড়ে এসেছে। রাস্তায় লোকও জমে গেছে চেঁচামেচি শুনে। নীলু, তপু, বুবু বেগতিক দেখে দৌড়ে

রাস্তায় নেমেছে। সর্বনাশ! বোকা জংলী ছেলেটা ধরা পড়ে গেল তাহলে! এদিকে লালাজীও নিশ্চয় এবার টের পেয়েছে, নীলুরা কেন তার কাছে আড্ডা দিচ্ছিল! তপু বলল—চলো, পালাই! বাসে গিয়ে উঠি। এরা দেখতে পাবে না।

নীলু গোঁ ধরে বলল—না।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওরা দেখল, গেনুর হাতে তিতি রয়েছে। লালাজী তার কান মলছে, থাপ্পড় মারছে—তবু পায়রাটা কেড়ে নিতে পারছে না।

নীলু বলল—এস তপু!

বলেই, সে দৌড়ে ফের দোকানে ঢুকল। তার পেছন-পেছন ঢুকল তপু আর বুবুও। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লালাজীর ওপর।

সে এক কাণ্ড! লালাজীর ভুঁড়িতে বুবু কাতুকুতু দিচ্ছে, আর লালাজী হ্যা হ্যা হ্যা করে হাসতে-হাসতে কোণের দিকে সরে যাচ্ছে। কখনও বলছে, ওরে বাবা! মরে যাব! মরে যাব! খুব হয়েছে!

আর লালাজীর লোকেরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এবার বুবুর দিকে যেতেই তপু একজনের পেটে ঢুঁ মারল। নীলুর অন্য অস্ত্র আছে। দাঁত, হ্যাঁ স্রেফ দাঁত।

সে সামনে যাকে পাচ্ছে কামড়ে দিচ্ছে। লোকগুলো বাপরে গেছিরে করে রাস্তায় গিয়ে নেমেছে! বাইরের ভিড় ব্যাপার দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

গেনু সেই ফাঁকে পায়রাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় ডেকে গেল—চলে এস সবাই! শিগগির!

লালাজী ময়দার বস্তায় গিয়ে পড়েছে কাতুকুতুর চোটে! সারা গা-মাথা-মুখে ময়দা মেখে গেছে! চোখ পিটপিট করে চেঁচাচ্ছে—মরে গেলুম! মরে গেলুম! পুলিশ ডাকো! পুলিশ!

তপু চেঁচিয়ে উঠল—চলে আয় বুবু! নীলু! কাম অন!

তিনজনে রাস্তায় নামল! ভিড়ের লোকেরা তখনও বেজায় লুটোপুটি খাচ্ছে হাসির চোটে। তিনটি ক্ষুদে মানুষের হাতে লালাজী আর তার লোকগুলোর এমন লাঞ্ছনা দেখে তারা ভারি মজা পেয়েছে।

নীলু চেঁচিয়ে ডাকল—গেন্নু! গেন্নু!

একটু তফাতে অন্ধকার থেকে সাড়া এল—এখানে চলে এস তোমরা।

কিছুক্ষণ পরে চারজনে ফিরে চলেছে তিতিকে নিয়ে।

অন্ধকার ঘন হয়েছে কিন্তু এ রাস্তা গেন্নুর খুবই চেনা। বরাবর এই রাস্তায় সে পাখি বেচতে আসে গুরুডিতে।

ওরা মনের আনন্দে কথা বলতে বলতে ফিরে চলেছে।

একসময় হঠাৎ পেছন থেকে টর্চের আলো এসে ওদের ওপর পড়ল। তারপর কারা চেঁচিয়ে উঠল—ওই তো সেই ক্ষুদে বজ্জাত গুলো! পাকড়ো! পাকড়ো।

ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটল যে দৌড়ে পালানোর কথা ভুলেই গেছে চারজনে। আলোয় যেন আটকে গেছে।

চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন লোক। টর্চ জ্বলছে একজনের হাতে। বাকি লোকগুলোর হাতে ছোরা চকচক করছে।

নীলু চিনতে পারল ওরা কারা। তপুও চিনল। বুবুও চিনতে পারল। গেন্নুও চিনল দুজনকে ভবশংকর, লালাজী আর সেই ভৈরব।

লালাজীর ভুঁড়ি হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ওই মেয়েটাকে আমি গাছে ঠ্যাং বেঁধে ঝোলাব। আর তলায় আগুন জ্বেলে দেব।

ভৈরব বলল—তখন কেল্লাপাহাড়ে ভূতের ঢিল কে ছুঁড়েছিল, এখন বুঝতে পেরেছি? জংলী ছোঁড়াটাকে আমি পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

ভবশংকর দাঁত কিড়মিড় করে বলল—ওই মিত্তিরদের ছোঁড়াটাকে

আমি অজগর দিয়ে গিলে খাওয়াব!

লালাজীর সেই কর্মচারি বলল—আমার ভাগে এই খোকাটা রইল। বলে সে তপুকে দেখিয়ে দাঁত বের করে হাসতে লাগল। একে আমি কী করব ভেবেই পাচ্ছিনে ছাই!

ভবশংকর বলল—ওকে টোপ করে নদীতে কুমির শিকার কোরো!

—খুব ভাল কথা, খুব ভাল কথা। বলে, লালাজীর কর্মচারী আরও হেসে উঠল।

ভবশংকর নীলুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল—এ্যাই! পায়রা দে, নৈলে পেট চিরে ফেলব। নাড়ি বের করে দেব, হ্যাঁ! দে বলছি আমার পায়রা।

লালাজীর হাতেই টর্চ আছে। সে একলাফে ভবশংকরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—কখনো না। তোমায় দেবে কেন? পায়রা তো আমার। আমি কিনেছি একটা টাকা দিয়ে! জিগ্যেস করে দেখ জংলী ছোঁড়াটাকে। ও পায়রা আমার!

ভবশংকর খাপ্পা হয়ে বলল—আমার পায়রা!

লালাজী আরও চেঁচিয়ে বলল—কখনো না। আমার পায়রা!

ভবশংকর ছোরা উঁচিয়ে বলল—লালাজী, সাবধান! তোমার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।

লালাজী বলল—কী! এতবড় কথা! তবে রে ব্যাটা!

বলে, খপ করে সে ভবশংকরের ছোরাধরা হাতটা ধরে ফেলল। টর্চটা পড়ে গেল তার হাত থেকে। কিন্তু নিভল না। সুইচ টেপা ছিল। সেই আলোয় দেখা গেল, পাহাড়ী রাস্তায় দু'জনে দুটো বুনোমোষের মতো লড়ে যাচ্ছে।

ভৈরব বলল—আহা! হচ্ছে কী? ঘরে-ঘরে বিবাদ করা ভাল হচ্ছে? ওহে গঞ্জু! ছাড়িয়ে দাও না।

গঞ্জু বলল—একা আমি পারি। দুটো হাতির মতো মানুষ! তুমিও এস।

ভৈরব বলল—তাহলে এরা যে পালিয়ে যাবে! তুমি একা ওদের

মারামারি ছাড়িয়ে দাও।

গঞ্জু এগিয়ে দাঁড়াল। ভবশংকর ও লালাজী একজন আর একজনের ওপর পড়ে আছে। পরস্পরের চুল খামচে ধরেছে। নাকে নাক ঠেকে গেছে।

ঠিক এইসময় পেছনের বাঁকে মোটর গাড়ির আলো ঝলসে উঠল। তারপর তীব্র বেগে গাড়িটা এসে পড়ল। এসেই থেমে গেল। ধুপধুপ করে কারা নেমে এল।

ভৈরব পালাবার জন্য পা তুলতেই কে গর্জে বলল—নোড়ো না। গুলি করব।

টর্চের আলো জ্বলে উঠল চারপাশ থেকে। পুলিশের জিপই বটে। ঠাসাঠাসি অনেক লোক এসেছে জিপে। সবাই নামল। তখন তপু চেঁচিয়ে উঠল—বাবা! তুমি?

নীলু আর একজনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—দাদু, দাদু! তুমি এসে গেছ?

অঘোরবাবু বললেন—না এসে পারি! অদ্ভুত ছেলে বটে তুমি! আমাকে তখনই জানালে বকুলপুর স্টেশনেই ভবশংকরকে ধরে ফেলতুম না।

নীলু মাথা চুলকে বলল—এতটা ভাবিনি দাদু!

ভবশংকর ও লালাজীর পেটে রুলের গুঁতো মেরে তবে ছাড়ানো গেল। পুলিশ দেখে তখন ওদের মুখ চুণ। হাতকড়া পরতে হল একটু পরেই।

ভৈরব আর গঞ্জুকেও পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে।

গুরুডির পুলিশ অফিসার বললেন—নেপাল থেকে বরাবর এভাবে সোনা পাচার হচ্ছে খবর ছিল। কিন্তু ধরতে পারছিলুম না নাটের গুরু কে বা কারা? যাক্‌গে, এবার একটা আস্কারা হল।

অজয়বাবু বললেন—টিহরিতে ট্রাকটা এতক্ষণ ধরা পড়েছে। তাই না মিঃ শর্মা?

পুলিশ অফিসার মিঃ শর্মা বললেন—আলবাৎ পড়েছে। চলুন,

গুরুডিতে ফিরে গিয়ে ভাগ্নে-বাবাজীর শ্রীমুখ দর্শন করি।

নীলু বলল—বারে! আপনারা কীভাবে জানলেন এ খবর?

মিঃ শর্মা জবাব দেবার আগেই অঘোরবাবু বললেন—বিকেলে আমরা কেল্লাপাহাড়ে তোমাকে খুঁজে পেলুম না। তারপর নিচে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি পাথরের খাঁজে একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে। তাতে নেপালের কে এক নারায়ণ সিং লিখেছে, কথামতো মালটা টিহরির জঙ্গলে পাঠালুম। হ্যাঁ, তার আগে কেল্লাবাড়িতে ভবশংকরের ডেরায় একটা স্যুটকেস পেয়েছিলুম আমরা। তালা ভেঙে দেখি, সোনার বিস্কুটেভরা প্যাকেট রয়েছে।

নীলু বলল—হ্যাঁ, তাই স্যুটকেশটা অত ভারি লাগছিল।

মিঃ শর্মা বললেন—কিন্তু ভাবিনি মশাই, পায়রার সাহায্যে চোরাচালানের খবর নেওয়া হয়। কল্পনাও করিনি। ভবশংকর মহা ধুরন্ধর দেখছি। চলুন, রওনা হওয়া যাক।

সারা পথ নীলু তিতিকে বুকের কাছে ধরে রেখেছে। ফিসফিস করে তার সঙ্গে সে কথা বলছিল। ফিরে গিয়ে খাঁচায় ঢোকানোর কথা বলতেই তিতি এতক্ষণে বলল—বক্ বকম্। বক বকম্! আমার কষ্ট হবে না বুঝি!

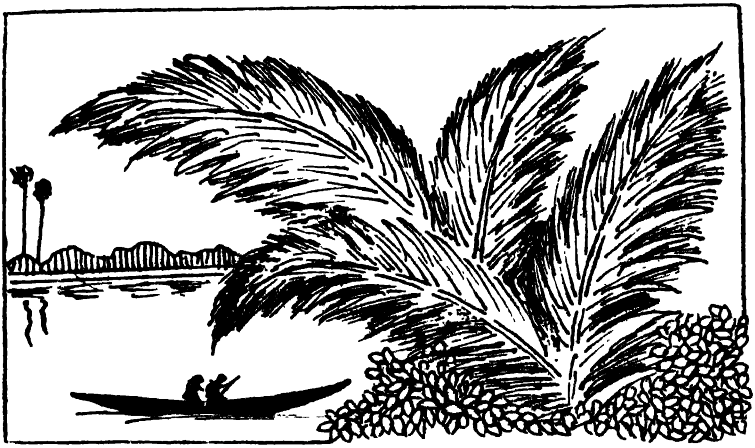
নীলু চুপিচুপি বলল—তাহলে কথা দাও, আর কক্ষনো কারুর কথা শুনবে না। আমি ছাড়া কারুর ডাকে কাছে যাবে না।

তিতি বলল—বক্ বকম্। বক্ বকম্! কান মলছি আবার।

বুবু সাদা পায়রাটার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে আদর করল। বলল—এই নীলু! বকুলপুরে ফিরে গিয়ে আমার জন্য এমনি একটা পায়রা প্যাঠিয়ে দেবে?

নীলু বলল—দেব। তারপর গেনুর দিকে তাকিয়ে বলল—আর তোমার জন্যে একটা এয়ার-গান।

———



আমাজনের অরণ্যে

১. জীভারো মমিমুণ্ড সানসা

একদিন সকালে হঠাৎ কী খেয়াল হল, সোজা হিরণমামার বাড়ি চলে গেলুম। হিরণমামা থাকেন দক্ষিণ কলকাতায়। লেকের কাছাকাছি বিশাল একটা সেকেলে ধাঁচের বাড়ি। চারিদিকে লতাপাতার ছাউনি দেওয়া পাঁচিল, মস্তো গেট, চওড়া লনের দুধারে অজস্র দেশী-বিদেশী পাথুরে ভাস্কর্য সাজানো রয়েছে। নানা রকম গাছপালা আর ফুলেরও অভাব নেই। হিরণমামার পূর্বপুরুষ এক সময় কলকাতার সেরা ধনীদের একজন ছিলেন শুনেছি।

হিরণমামা মানুষ হিসেবে বেশ চমৎকার। কোন হামবড়াই ভাব নেই, কোন রকম বড়লোকি জাঁকজমক দেখাতে চান না। মেশেনও খুব কম মানুষের সঙ্গে। বেশির ভাগ সময় তিনি অবশ্য বাড়িতে থাকেন না। কোথায় কোথায় কাটিয়ে আসেন। এই স্বভাবটা আমার ছেলেবেলা থেকে লক্ষ্য করে আসছি। যদ্দূর মনে

পড়ে, মামীমার মৃত্যুর পর থেকেই উনি খানিকটা খামখেয়ালি আর ভবঘুরে স্বভাবের হয়ে ওঠেন। তিনি পৃথিবীর নানান দেশে ঘুরেছেন। নানা রকম রোমাঞ্চকর আর দুঃসাহসী অভিযান করেছেন। তা নিয়ে কয়েকটা বইও লিখেছেন, তবে তাঁর আসল খ্যাতি একজন সৌখিন প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে। দেশের সব যাদুঘরে যে-কোন ব্যাপারে ওঁর ডাক পড়ে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ওঁর মতামতের মূল্য দেন খুব বেশি। যেমন, রাজস্থান মরুভূমির হিথেরোগড়ে বালির নিচে পাওয়া সেই ইঁটের স্তূপ নিয়ে দেশের পণ্ডিত আর বিজ্ঞানীরা যখন হিমসিম খাচ্ছেন, তখন হিরণমামা গিয়ে দেখেই বলে দিলেন—আরে, এ তো সেই ইংরেজ জুওলজিস্ট মাইকেল গেভার্টের অবজারভেসান টাওয়ার—পর্যবেক্ষণ মঞ্চ। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে গেভার্ট ভারতীয় মরুভূমির প্রাণী সম্পর্কে গবেষণার জন্যে এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন! আশ্চর্য এবং মজার কথা, সবাই এই ইঁটের স্তূপটা কমপক্ষে তিন হাজার বছরের পুরনো দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শন বলে হইচই লাগিয়েছিলেন। হিরণমামার কথা শুনে তখন তাঁদের তো মুখ চূণ। মামা বললেন, 'হ্যাঁ, কারবন-১৪ নামক পরীক্ষায় কোন্ জিনিস কত পুরনো ধরা পড়ে ঠিকই। কিন্তু মাঝে মাঝে ওই পরীক্ষা উল্টোপাল্টা খবরও বাতলায়। একশো বছরকে দশ হাজার বছর করে ফেলে।' নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেল, তাই বটে। মাইকেল গেভার্ট পলাশী-যুদ্ধের দশ বছর পরে এদেশে আসেন। মারা যান ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে। কলকাতায় পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায় তাঁর কবর এখনও রয়েছে।

এই হিরণমামার বয়স এখন প্রায় বাহান্ন। কিন্তু দেখলে যুবক বলে ভুল হয়। চুল-দাড়ি একটাও পাকেনি। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা—একটু লালচেও বটে। ভারতীয় বলে মনেই হয় না দেখলে। স্পেনের লোক বলে ভুল হতে পারে। প্রকাণ্ড শরীর। পথ দিয়ে হেঁটে গেলে না তাকিয়ে উপায় নেই।

উনি আমার মায়ের দূর সম্পর্কের এক দাদা হন, শুধু এটুকুই জানি। কালে-ভদ্রে আমাদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আসেন।

আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা ছেলেবেলা থেকেই গাঢ় হয়ে উঠতে পারে নি, তার কারণ, আমার ভয়। হ্যাঁ, ওঁকে বরাবর কেমন রহস্যময় মানুষ বলে মনে হয়েছে আমার। দেখলেই গা ছমছম করেছে। মনে হয়েছে, হয়তো কোন রহস্যময় ভয়ংকর জায়গায় নিয়ে পৌঁছে দেবেন, আমার আর বাড়ি ফেরাই হবে না।

অবশ্য বড় হয়ে অতখা ন ভয় আর ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, তবু সেই গা ছমছম ভাবটা আজও ঘোচে নি। ওঁর নীলচে চোখ দুটো আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। মনে হয়, আমাকে যেন ওই চোখদুটো ডেকে নিয়ে যেতে চায় কোন দুর্গম অরণ্যে কিংবা ভয়ংকর পাহাড়ী গুহার অন্ধকারে। পাতালে— যেখানে শুধু রহস্য আর রহস্য, যা আজও বিজ্ঞানীরা কল্পনা করতেও পারেন না।

হিরণমামা আমার এই ভয়ের ভাবটা আগে টের পেতেন, এখনও পান। তিনি মিটিমিটি হেসে বলেন, 'টিটোটা আসলে ভীতু নয়। ওর হয়েছে কী, আমার ওপর প্রচণ্ড ঈর্ষা আছে। আমি যা করি, ও তা পারবে না কেন, এইরকম ভাব। টিটো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায়। তাই না রে?'

আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছি। ভেবেছি, তা কি সত্যি? কে জানে! তবে আমার মনে একটা অভিমান জন্মাচ্ছিল টের পাই। কেন হিরণমামা আমাকে তাঁর রহস্যময় জীবনের সঙ্গী করছেন না? আমি কি নিতান্ত দুর্বল ছেলে? খেলাধুলো ঘুষোঘুষি মারামারি কোন্‌টাতেই-বা আমি অপটু? এদিকে বারবার কলেজের পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে পড়াশুনোয় মন বসে না, মাথায় খালি নানান উদ্ভট ভাবনার আসর। কোথায় যাই, কী করি, এই অবস্থা। সারারাত জেগে ভাবি, একটা কিছু করে ফেলা দরকার—ভয়ংকর মারাত্মক কিছু। অথচ করা হচ্ছে না। হু-হু করে দিনগুলো মিছিমিছি চলে যাচ্ছে। আমার হাতদুটো নিসপিস করে।

এই অস্থিরতার ফলেই যেন আমি এক সকালে হুট করে হিরণমামার বাড়ি হাজির হলাম। জানতুম না, মামা আছেন কী নেই।

না থাকলে মনে হচ্ছিল, ভারি কষ্ট পাবো—ফিরে এসে আবার সেই চুপচাপ ঘরে গিয়ে বসা, কিংবা বড়জোর ক্লাবে গিয়ে গুলতানি করা। ভ্যাট ভ্যাট! কোন মানে হয় না এমন করে বেঁচে থাকার।

গেটে রাম সিং দারোয়ান আমাকে দেখেই সেলাম দিয়ে একগাল হাসতেই বুঝলুম, ভাগ্য ভালো, হিরণমামা বাড়ি আছেন।

গাড়ি-বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ির ওপর পা ফেলতে ফেলতে সামনেকার বড়ো বসার ঘর থেকে হিরণমামার হো-হো হাসি শুনতে পেলুম। অনেকবার মামার অমন হাসি শুনেছি, কিন্তু আজকের মতো এমন প্রচণ্ড উদ্দীপনা তো কখনও পাইনি।

দরজার ভারি পর্দার এদিকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালুম। ভিতরে মামা কার সঙ্গে কথা বলছেন? ইংরিজিতে বলছেন। ব্যাপার কী? নিশ্চয় কোন বিদেশী সায়েব এসেছে। মামার কাছে এমন বিদেশী প্রায়ই আসে।

হিরণমামা বলছেন, 'আমায় অন্তত একটা দিন ভাববার সময় দিন মিঃ সিয়েমেল। আমি কাল সকালে সাতটা নাগাদ আপনাকে হোটেলে ফোন করে জানাব।'

একটা চাপা অথচ মিহি নাকি-স্বরে কে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলছে, 'কিন্তু খুব—খুবই সাবধান মিঃ রয়। দয়া করে কারও সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করতে যাবেন না। আর এ ধরনের এ্যানটিক আনতে যে অনুমতিপত্র লাগে, বুঝতেই পারছেন, তা আমি নিই নি। কারণ তাহলে তক্ষুনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীদের ডাক পড়তো। তারা বলতেন, এটা কী বস্তু ব্যাখ্যা করো। তাই না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিকই। তবে আমি সাবধানেই রইলুম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মিঃ সিয়েমেল।'

'আর একটা কথা, মিঃ রয়। 'যে ডায়রিটা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি, সেটা বিশ হাজার ডলার দামে একজন কিনতে চেয়েছিল, ভুলবেন না। জানিনে, সে ব্যাটা আমাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে কি

না—আসা তো খুবই স্বাভাবিক। তাই বলছি, যে-কোন সাদা চামড়ার বিদেশী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেই খুব সতর্ক হবেন, আর এখন কয়েকটা দিন বাইরের তেমন কোন লোকের সঙ্গে আপনার দেখা না হওয়াই নিরাপদ।'

হিরণমামার হাসি শোনা গেল আবার, 'কিন্তু আমাকে এতখানি বিশ্বাস করে বসলেন?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস আপনাকে করি। কারণ, আমার গুরু প্রখ্যাত এ্যাডভেঞ্চারিস্ট মিচেল হেজেস আপনার কথাই আমাকে বলেছিলেন।'*

'তাই বলুন! হেজেস এখনও বেঁচে আছেন?'

'আছেন, তবে নব্বুইয়ের ওপর বয়স এখন। লস এঞ্জেলসে থাকেন। উনিই তো এই এ্যানটিক দেখে বললেন, এটা কোন লিলিপুট মানুষদের মুণ্ডু নয়, জীভারো ইণ্ডিয়ানদের মমিমুণ্ডু। তাদের দৈহিক গঠন আমাদের মতোই। মাথাকে অদ্ভুত কায়দায় মমি করে কমলালেবুর মতো সাইজে আনতে ওরা পটু। চামড়াবিদ্যা অর্থাৎ ট্যাক্সিডামিতে ওদের জুড়ি নেই। ব্রাজিলের আমাজন নদীর অববাহিকায় ভীষণ দুর্গম জঙ্গলে ওদের বাস। ক্রমশ এই আদিম মানুষগুলোর সংখ্যা কমে আসছে। তবে মিঃ রয়, হেজেস আমাকে বলেছেন, আজকাল ওই মমিমুণ্ডু যা সব ট্যুরিস্টরা ব্রাজিল থেকে কিনে আনে, সবই কিন্তু নকল। আসল মমিমুণ্ডু পাওয়া ভাগ্যের কথা। তা পেতে হলে জীভারোদের আস্তানায় যেতে হয়। সে এক অসম্ভব ব্যাপার।'

আর দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। আচমকা পর্দা তুলে হিরণমামা খ্যাঁচ করে আমার কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন, 'ওরে বাঁদর ছেলে! কখন থেকে পা দুটো দেখেই চিনে ফেলেছি যে, শ্রীমান

---

* মিচেল হেজেস প্রখ্যাত অভিযাত্রী। তাঁর জীবন যেমন বিস্ময়কর, তেমনি দুর্দান্ত। তাঁর 'ডেঞ্জার মাই এ্যালি'—'বিপদ আমার সখা' বইটি সেই অসাধারণ অভিজ্ঞতায় ভরা। দক্ষিণ আমেরিকার 'লুবানটামে' মায়া সভ্যতার একটি বিশাল ধ্বংসাবশেষ তিনিই আবিষ্কার করেন।

টিটোর আবির্ভাব ঘটেছে। তা না হলে রাম সিংয়ের পাহারা এড়িয়ে ভিতরে ঢোকে সাধ্য কার?'

এই বলে হিরণমামা বিদেশী লোকটার দিকে ঘুরলেন, '…মিঃ সিয়েমেল, আমার প্রিয় ভাগ্নে শ্রীমান টিটো, আপনি স্বচ্ছন্দে ওকে বিশ্বাস করতে পারেন। আর বাবা টিটো, ইনি প্রখ্যাত রাশিয়ান অভিযাত্রী (এ্যাডভেঞ্চারিস্ট) মিঃ সাসা সিয়েমেল।'

এতক্ষণে মনে পড়ে গেল। সেই সাসা সিয়েমেল। দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল, পাহাড়ে যিনি জীবন কাটিয়েছেন তার দাদা আরনেষ্টি সিয়েমেলের সঙ্গে। বর্শা ছুঁড়ে রেড ইণ্ডিয়ানদের মতোই যিনি জাগুয়ার বা পুমা শিকার করতে পটু। হীরের খনি আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে প্রথম যে দলটি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মাটো গ্রাসো এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল, ইনি তো ছিলেন তাঁদেরই একজন। রাত জেগে সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়েছি তাঁর নিজের লেখা বই 'জাঙ্গল ফিউরিতে'? সেই সাসা সিয়েমেল!

আনন্দে বিস্ময়ে হাত বাড়িয়ে বললুম, 'অভিনন্দন, হাজার অভিনন্দন, মিঃ সিয়েমেল! জাঙ্গল ফিউরির নায়ককে সশরীরে এখানে দেখে মনে হচ্ছে নির্ঘাৎ স্বপ্ন দেখছি!*'

মিঃ সিয়েমেল আমার দিকে সন্দেহাকুল চোখে তাকিয়ে ছিলেন। এবার আমার হাতে মৃদু নাড়া দিয়ে বললেন, 'খুব খুশি হলুম, মিঃ টিটো।'

হিরণমামা মন্তব্য করলেন, 'মার্শাল টিটো বলুন স্বচ্ছন্দে।'

সবাই হেসে উঠলুম। তারপর এতক্ষণে কফি টেবিলের ওপর

---

* সাসা সিয়েমেল কাল্পনিক চরিত্র নয়। তাঁর দক্ষিণ আমেরিকার সেই রোমাঞ্চকর জীবনের কাহিনী লিখেছেন 'জাংগল ফিউরি' বা 'অরণ্যের প্রতিহিংসায়।' অবশ্য এই কাহিনীটিতে তাঁকে আমিই টেনে এনেছি। লোভ সামলাতে পারিনি।

—লেখক

চোখ পড়ল। একটা কাঠের ছোট বাক্সের ওপর ওটা কী? কী ওই ভয়ঙ্কর বস্তুটা? ওটা কি মানুষের মাথা? অসম্ভব। লম্বা চুল, কমলালেবু সাইজের একটা বীভৎস মুণ্ডু। দেখা মাত্র গায়ের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে চায়। সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। এই মুণ্ডুর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার সাধ্য খুব কম মানুষেরই আছে। মুণ্ডুটার জ্বলজ্বলে নীল ক্ষুদে দুটো চোখ নিষ্পলক আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ সরিয়ে নিলুম।

হিরণমামা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আপাতত কিছুদিন আমার সারাক্ষণের সঙ্গী টিটো। তোকে ছেড়ে দিচ্ছিনে। তোর মাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি। আর মিঃ সিয়েমেল, তা হলে সেই কথাই রইল। আগামীকাল সকাল সাতটা।'

২. চার্লস জেভিয়ারের ডায়েরি

ওপরের ঘরে দরজা ভালো করে এঁটে হিরণমামা বললেন, 'দেখ্ তো টিটো, এটা পড়তে পারিস কিনা?'

এই বুঝি সেই ডায়েরিটা। কালো ছেঁড়াখোঁড়া মলাট, কাগজও খুব পুরনো। খুলে দেখি, জায়গায় জায়গায় পোকায় কেটেছে। কোথাও জলে ভিজে হরফগুলো বোঝা যাচ্ছে না। চোখ বুলিয়ে দেখেই বুঝেছিলুম ইংরিজিতে লেখা। কিন্তু বেশ গোটা গোটা হরফ। সেকালের লোকেরা সব দেশেই খুব পরিষ্কার ছাঁদে লিখত। হরফের ধাঁচে সেকালের ছাপ রয়েছে। কালির রং কালো। কিন্তু এখনও কী ঝকমক করছে।

আমার আরও মনে হল, এই ডায়েরির লেখক অনেকদিন ধরে অনেক সময় নিয়ে আস্তে আস্তে লিখে গেছে। কোনো রকম তাড়াতাড়ির ধার ধারে নি। প্রথম পাতায় নাম ঠিকানা লেখা।

ক্যাপ্টেন চার্লস জেভিয়ার।

'আলাস্কা' জাহাজ, গুয়াকুইল বন্দর।

ইকোয়েডর।

দক্ষিণ আমেরিকা।

দ্বিতীয় পাতায় ডায়েরি শুরু হয়েছে। ওপরে তারিখ লেখা ১৮ই মার্চ, ১৮৯৯। রাত বারোটা।

"আমার সখের জাহাজ আলাস্কার দর-দাম আজই হয়ে গেছে। কাল সকালে ওকে নিতে আসবে ওর নতুন মালিক। লোকটা একজন স্প্যানিশ—এই বন্দরেই ওর বাড়ি। ও বলছিল, এমনি একখানা জাহাজ ওর খুব দরকার ছিল। এটা পেলে সে তার বাবার মতোই নিজের দেশ স্পেনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ভালো পয়সা কামাবে।···

···ওটা চালাকি ব্যাটার। আমি ইংরেজ, আমাকে ফাঁকি দেবে কিনা ওই মারকুট্টে মতলববাজ ধূর্ত একটা স্প্যানিশ? ওদের মতলব তো সবাই জানে। ব্যাটা আসলে একজন গোল্ড ডিগার যাকে বলে। সোনা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ও যদি নির্ঘাৎ জাহাজটা নিয়ে মেকসিকো উপসাগরে হারানো শহর অ্যাটলাণ্টা আবিষ্কার করে গুপ্তধন না হাতায় তো আমার সওয়া হাত লেজ গজাবে।

···তা মরুক গে। গোল্লায় যাক ওই নীল চোখ লাল চেহারা-ওয়ালা গিরগিটির মতো শয়তানটা। আলাস্কাকে আমার বেচে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ, টাকা আমার খুবই দরকার। বর্ষার আগেই আমাজন নদীর ধারে ভীষণ জঙ্গল এলাকায় কাজ শেষ করে ফিরে আসতে হবে। তার জন্যে কম করে একশো জন সাহসী ডানপিটে লোক দরকার, তাদের মাইনে আর খোরাকী দিতে হবে। তার ওপর অনেক বন্দুক পিস্তল আর কার্তুজ দরকার। এ সব না নিয়ে গেলে আমার আর ফিরে আসাই সম্ভব হবে না। পৃথিবীর সব চাইতে আদিম বর্বর এক নৃশংস ইণ্ডিয়ান জাতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। তবে একটা শুধু আশার কথা, ওদের সমাজ থেকে যে-লোকটা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছে, তার কাছেই পথের খবর

রয়েছে। এই লোকটার নাম ম্যাসিও। ওদের গোত্রের নাম জীভারো। ভীষণ দুর্ধর্ষ আর হিংস্র স্বভাবের মানুষ তারা। ম্যাসিও তাদেরই একজন ওঝা, যাকে আমরা বলি উইচ ডক্টর। কিছুদিন আগে অসুখ-বিসুখে অনেক লোক মারা পড়ায় ওঝার ওপর বিশ্বাস তাদের হারিয়ে গেছে। এ অবস্থায় জীভারোরা ওঝাকে খতম করে। তাদের বিশ্বাস, বনদেবতা ওয়াকিনি ওঝার রক্ত পেলে খুশি হবেন—অভিশাপ দূর হয়ে যাবে। ম্যাসিও কীভাবে টের পেয়ে পালিয়ে আসে। পথে এক ফরাসী শিকারীর সঙ্গে তার দেখা হয়। এই ফরাসী ভদ্রলোক ওদের ভাষা বোঝেন। তাঁর কাছে ম্যাসিও এখনও বাস করছে। ম্যাসিও নিজের জাতের ওপর এত রেগে আছে যে, তাঁকে একটা অদ্ভুত খবর দিয়েছে :...

...হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য খবর মনে হবে। কিন্তু আমি জানি, তা নয়। ষোল শতকের গোড়া থেকে যখন স্পেন দেশের লোকেরা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে ওই অঞ্চলের 'মায়াসভ্যতা' সোনার লোভে ধ্বংস করতে থাকে, তখন কিছু রেড ইণ্ডিয়ান—তাদের গোষ্ঠির নাম ইনকা, কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালায়। তাদের সঙ্গে ছিল অজস্র সোনা, হীরে আর মণিমুক্তা। আমাজন নদীর ধারে কোন এক পাহাড়ী জায়গায় সেগুলো তারা পুঁতে রাখে। তারপর হতভাগা লোকগুলো দিন দিন না খেতে পেয়ে অসুখ-বিসুখে মারা পড়ে। দুশো-আড়াইশো বছর পরে একজন জীভারো ওঝা কীভাবে হঠাৎ এই গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে যায়। কিন্তু ওরা তো বর্বর, অসভ্য মানুষ। এই আলো ঝলমলে জিনিসগুলো কী কাজে লাগে বোঝে না! কিন্তু ওদের ধারণা, এগুলো বনদেবতা ওয়াকিনিরই কোন কাণ্ডকারখানা। তাই সেখানটায় পাহারা দেয়, যাতে কেউ ওগুলো ছুঁতে না পারে। ম্যাসিও ওঝা সেই গোষ্ঠিরই একজন।

ফরাসী ভদ্রলোকের নাম জাঁ ফাঁর্লো। সম্প্রতি আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বন্ধুত্বও হয়েছে। একদিন হঠাৎ আমার কাছে সব খুলে বললেন। তারপর আমি ম্যাসিওর সঙ্গে দেখা করেও এসেছি।

ম্যাসিও পাসোম্বাগো নামে এই নির্জন পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে কিছুতেই বাইরে আসতে চায় না। ওখানে ফাঁর্লো খানিকটা জায়গা নিয়ে চাষাবাদ করেছেন। ম্যাসিও দিনরাত ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। ফাঁর্লোর ভয়, শিগগির লোকটা মরে যেতে পারে। তাই যত তাড়াতাড়ি হয় ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়া দরকার।…'

আমার গা শিউরে উঠছিল পড়তে পড়তে। এবার হিরণমামা বললেন, 'এবার একেবারে শেষ পাতাটা পড়।'

শেষ পাতাটা জেবড়ে গেছে। হয়তো জলে ভিজে গিয়েছিল। হরফগুলো চেনা যায় না। তবে অনেক কষ্ট করে মোটামুটি দাঁড় করালুম :

"…২ জুলাই, ১৮৯৯। রাত দুটো। নদীর ধারে বসে লিখছি। সাবধানে পাতার আড়ালে মোমবাতি জ্বেলে লিখতে হচ্ছে। এখান থেকেই জীভারোদের এলাকা শুরু। ম্যাসিও খুব উত্তেজিত। তার ছটফটানি টের পাচ্ছি। ফাঁর্লো ওকে ধরে বসে রয়েছেন একটা গাছের নিচে। আমরা সবাই বন্দুক-পিস্তলে গুলি ভরে তৈরী আছি, কারণ যে-কোন সময় জীভারোরা হানা দিতে পারে। তাদের কাছে যারা অচেনা, তারা সবাই তাদের শত্রু।

……কিন্তু এরই মধ্যে আমি লিখছি। কারণ, জানি না আর ফিরতে পারব কিনা। যদি না ফিরি, আমার এই ডায়েরি একটা 'চুওর' গাছের নিচে পোঁতা রইল। কারো না কারো একদিন হাতে পড়ে যেতে পারে। গাছের গুঁড়িতে ইংরিজিতে লিখে রাখব, 'নিচে খুঁড়ে দেখুন।'

এদিকে আজ বিকেলে ফাঁর্লো একটা চমৎকার কাজ করেছেন। তাঁর এতদিনের সাধনা সফল হয়েছে। ম্যাসিওর সাহায্যে সেই জায়গাটার একটা নকশা এঁকে ফেলেছেন। একটু এদিক-ওদিক অবশ্যই হতে পারে, কিন্তু নকশাটায় কোন ভুল নাকি নেই। ফাঁর্লো শিকারী মানুষ। এদিকটা তাঁর কিছু চেনা তো বটেই।

…একটা কাজ আমিও করে ফেলেছি। নকশাটা ফাঁর্লোর কাছে

আছে। কিন্তু আমি মনে মনে তা অবিকল মুখস্থ করার মতো রেখেছি, সেটা এই শেষ পাতায় এ'কে দিচ্ছি।"...

পাতা এখানে শেষ হয়েছে। আমি বললুম, 'ভ্যাট! পাতাই তো শেষ হয়ে গেল লেখার চোটে। নকশা আঁকলেন, কোথায় ভদ্রলোক?'

মামা মুচকি হেসে বললেন, 'উঁহু, ওটা শেষ পাতা নয়। শেষপাতাটা কেটে নিয়েছে কেউ। পরীক্ষা করে দেখলেই টের পাবি।'

তাই তো! আমার গা শিউরে উঠল। বললুম, 'মামা, তাহলে তো আর কোন উপায় নেই।'

হিরণমামা কী যেন ভাবতে ভাবতে বললেন, 'কিসের?'

'গুপ্তধন খুঁজে বের করার।'

হিরণমামা আমার চোখে চোখ রেখে শান্তভাবে বললেন, 'তবু আমি যেতে চাই, টিটো। তুই যাবি আমার সঙ্গে?'

আমার রক্ত নেচে উঠল। বললুম, 'যাবো মামা। তোমার সঙ্গে আমি যমের বাড়ি যেতেও পিছপা নই।'

হিরণমামা এবার মিটিমিটি হেসে বললেন, 'কতকটা যমের বাড়ি যাওয়াই বটে। এই মমিমুণ্ডুটা কার জানিস? সেই জীভারো ওঝা ম্যাসিওর।'

ম্যাসিও ওঝার মুণ্ডু! আমার গা শিউরে উঠল। মুণ্ডুটার দিকে তাকালুম। একটা কমলালেবুর মতো ছোট্ট সেটা। একরাশ চুল রয়েছে। মেয়েদের মতো লম্বা সেই চুল। চোখ দুটো জ্যান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে যেন...জ্বলছে। কী হিংসুটে চাউনি! ঠোঁটদুটো সেলাই করা।

বললুম, 'মামা! এই জীভারোরা কি ক্ষুদে লিলিপুট মানুষ? অতটুকু মুণ্ডু কেন?'

হিরণমামা বললেন, 'না, তারা আমাদের মতোই লম্বা—এমনি চওড়া ছাতিওলা মানুষ। মাথাটা আমাদের তুলনায় বরং মোটা। আসলে কী হয়েছে জানিস? চামড়া বিদ্যায় ওরা পাকা। মানুষের

মুণ্ডু কেটে খুলি হাড়গোড় ফেলে দিয়ে শুধু চামড়া, চুল, চোখ, কান—সব ঠিকঠাক তুলে নেয়, যাকে বলে ছাল ছাড়ানো। তারপর ভেতরে গরম পাথর আর বালি ভরে দেয়। এবার কোন আড়কে ডুবিয়ে দিলে ওটা কুঁচকে ছোট্ট কমলালেবুর সাইজ হয়ে পড়ে। এই মমিমুণ্ডু হাজার হাজার বছর টিকে থাকে, নষ্ট হয় না। আর এর নাম কী জানিস? সানসা! (Tsantsa) জীভারোদের যুদ্ধজয়ের ট্রফি বলতে পারিস।'···

৩. স্টীমারওলা জেলে ট্র্যাভেল্লো

এরপর কীভাবে দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডর রাজ্যে আমরা পৌঁছলুম, তার খুঁটিনাটি বলে কোন লাভ নেই। তবে যা দেখলুম, সিয়েমেল সায়েব যত ভয় দেখিয়েছিল, তা ভুয়ো। কেউ আমাদের টিকি ছোঁয় নি। হিরণমামা আর আমি উড়োজাহাজে সরাসরি জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছেছিলুম। সেখানে দিন তিনেক থাকতে হয়েছিল মিস্টার সিয়েমেলের জন্যে। উনি একা পৌঁছেছিলেন আলাদা উড়োজাহাজে। তারপর প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে পড়া গেল। এ জাহাজটার নাম ছিল 'ডস প্যানডো'। একটা মালবওয়া মস্তোবড় জাহাজ। সিয়েমেল সাহেব খুব কাজের লোক। তেমনি সব ব্যাপারে খুব সাবধানীও বটে। এ জাহাজের বুড়ো কাপ্তেন তার চেনাজানা। আমাদের তিনজনকে তার কথামতো নাবিকের পোশাক পরতে হয়েছিল। তা না হলে আইনের গোলমালে পড়তে হয়। মালের জাহাজে যাত্রী বওয়া বারণ আছে কিনা!

প্রশান্ত মহাসাগরে আমরা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় মাসখানেক ভেসে তারপর দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডর রাজ্যের গুইয়াকিল উপসাগরে পৌঁছলুম। বন্দরটার নামও গুইয়াকিল। এখানে ডস প্যানডোর মাল খালাস হবে।

ঠিক ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন বন্দরের ঘরবাড়ি চোখে

পড়ল, আমার সে কী আনন্দ। তক্ষুনি নাবিকের পোশাকটা খুলে ফেললুম। বাপ্‌স, আমরা ডাঙার বাসিন্দা—জলে ভেসে থাকতে কতক্ষণ আর ভালো লাগে। মাটি দেখে ধেই-ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করছিল।

জাহাজ থেকে নামবার আগে কাপ্তেন-বুড়ো আমাদের শেষবার কড়া তিতকুটে জাহাজী-চা খাইয়ে তবে ছাড়ল। বুড়ো স্পেন দেশের লোক। ইংরিজী একেবারে জানে না। তবে ফরাসী ভাষা ভালো জানে। হিরণমামা তো কমসে-কম চৌদ্দটা বিদেশী ভাষায় গড়গড় করে কথা বলতে পারেন। তাই অসুবিধে হয় নি। মাঝখানে আমার লাভই হল বলব। কিছু স্পেন দেশের ভাষা শেখা হয়ে গেল। চা খেতে খেতে ভুট্টা আর মাংস দিয়ে তৈরী কেক খেতে খেতে আমি বলে উঠলুম, 'ডস্ রিয়েলস্ ক্যাডো উনো।' অমনি বুড়ো কাপ্তেন দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে আদর করতে থাকল। ওর এক নাতি আছে নাকি আমার বয়সী। তাই এতদিন আমাকে নাতির মতন দেখেছে। ডেক থেকে সিঁড়িতে পা রাখামাত্র সে দৌড়ে এসে আমার কপালে একটা চুমু খেয়ে ফেলল। তারপর দেখি, তার চোখে জল টলটল করছে। আমার দুঃখ হল। মামার কাছে শোনা একটা ফরাসী কথা চালিয়ে দিলুম তখন, 'অ রিভোয়া কাপ্তান, অ রিভোয়া!' আবার দেখা হবে, বিদায়!

বুড়ো চোখের জল মুছতে মুছতে মামাকে কী বলল বুঝতে পারলুম না। তারপর দেখি, মামা একটা নোট-বইতে কী সব টুকে নিলেন।

জেটিতে গিয়ে আমরা দাঁড়ালুম। আমাদের মালপত্র নামিয়ে আনছিল জন-পাঁচকে নিগ্রো কুলি। মাল নেহাৎ কম নয়। যখন জড়ো করা হল, দেখি সে একটা ছোটখাটো পাহাড়। আমি কিন্তু টেরই পাইনি যে টোকিওতে জাহাজ ছাড়ার আগে মামা আর মিঃ সিয়েমেন্স মিলে এতসব কেনাকাটা করে জাহাজে তুলেছেন কখন। জঙ্গলে অতসব কি কাজে লাগবে?

এক ফাঁকে মামাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কাপ্তেনদাদু কী বলছিল মামা, আপনি লিখে নিলেন ?'

মামা হেসে বললেন, 'বাঃ! দাদু-নাতি হয়ে গেছ দেখছি। এটা একরকম ভালোই হয়েছে টিটো। বুড়োর জাহাজেই আমরা ফিরব ঠিক করেছি, তবে দু'মাস তো ওরও লাগবে ফের এখানে আসতে। টোকিও যাবে, আবার ফিরবে। এদিকে আমাদের কাজও দু'মাসের আগে শেষ হবে না। আমাজন নদীতে পৌঁছতেই তো সাত-আটদিন লেগে যাবে, তারপর···। যাকগে, তোর কথাটার জবাব দিই এবার। বুড়ো একজন রেড ইণ্ডিয়ানের খবর দিল, তার নাম জোয়াকিম। লোকটা থাকে প্যাসো স্যাণ্টো নামে একটা জায়গায়। গরুর ফার্ম আছে ওর। পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝামাঝি একটা তৃণভূমি রয়েছে সেখানে।'

বললুম, 'ওর কাছে যাবে নাকি ? কিন্তু কেন ?'

'যেতে হবে। একেবারে অজানা জায়গা, তার ওপর যাচ্ছি ভীষণ জঙ্গলে। জোয়াকিম ওদিককার অনেক খবর রাখে। ওর সাহায্য আমাদের চাই-ই।'

মিঃ সিয়েমেল আগাগোড়া কলকাতা থেকেই আমাকে সঙ্গে নেওয়া পছন্দ করেন নি। তাঁর খুঁতখুঁতে ভাব সব সময় টের পাচ্ছিলুম। আমি যেন ওঁর এক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। মামা অত করে বোঝালেও তাঁর খুঁতখুঁতেমি যাচ্ছিল না। এর ফলে আমার বেশ রাগ হয়েছিল ওঁর ওপর। ঠিক আছে সায়েব, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব এই শ্রীমান টিটো কী জিনিস! আমি মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে রেখেছি।

হিরণমামা আমাকে নিয়ে এগোলেন। সিয়েমেল মালগুলো নিয়ে পরে আসবেন। জেটির গেটের পরে একটা ভিড় দেখতে পেলুম। পুলিশকে কাগজপত্র দেখিয়ে যেই আমরা বেরিয়েছি, সেই ভিড়ের লোকগুলো আচমকা লম্বা আলখেল্লার ভেতর থেকে হাত বের করে চেঁচাতে লাগল। অবাক হয়ে দেখি, প্রত্যেকের হাতে একটা করে

সেই জীভারো মমিমুণ্ড! কী বীভৎস সব মুণ্ডুগুলো! ওদের চেঁচামেচিতে বুঝলুম, ওরা টুরিস্টদের কাছে এগুলো বিক্রি করে।

মামা ভিড় ঠেলে এগোচ্ছিলেন। বললুম, 'মামা! তুমি বলছিলে যে জীভারো-মুণ্ডু মোটেও পাওয়া যায় না! এই যে এত সব বিক্রি হচ্ছে!'

হিরণমামা হেসে বললেন, 'ভ্যাট! এ সব যা দেখছিস, প্রত্যেকটা নকল মুণ্ডু। ট্যুরিস্টরা বোকার মতন তাই কিনে নিয়ে যায়। চলে আয়!'

ভিড়ের লোকগুলোর মধ্যে বুড়ো-জোয়ান-বাচ্চা সব বয়সের মেয়েপুরুষ রয়েছে। অদ্ভুত সব পোশাক, তেমনি গায়ের রঙ! কেউ কুচকুচে কালো, কেউ স্রেফ ধবধবে সাদা, কেউ লালচে। কারো মাথায় পালকের মতো টুপিও রয়েছে। যেতে যেতে মামা বললেন, 'এরা কেউ স্প্যানিশ, কেউ পর্তুগীজ, কেউ নিগ্রো, কেউ রেড ইণ্ডিয়ান।' লোকগুলো কী নোংরা। যাবার সময় দুর্গন্ধ টের পাচ্ছিলুম। একটি ছেলে তো হাত দিয়ে আমার জামা টানাটানি করতে থাকল। অনেক কষ্টে তার হাত থেকে ছাড়া পেলুম তো এবার পড়লুম ভিখিরিদের হাতে। মনে হল, এবার আর বাঁচোয়া নেই। শকুন যেমন ভাগাড়ে মাংস ছিঁড়ে খায়, তেমনি দশা হবে আমাদের। চারদিক থেকে আমাকে ওরা টানটানি শুরু করল। চেঁচিয়ে উঠলুম, 'মামা, মামা!'

হিরণমামা কোন্ ফাঁকে ভিড় ছাড়িয়ে এগিয়েছেন। আমার দশা দেখে হেসে ফেললেন। আমার রাগ হল। তারপর দেখি, উনি পকেট থেকে একমুঠো খুচরো পয়সা ছড়িয়ে দিলেন ভিড়ে। অমনি লোকগুলো হুটোপুটি করে কুড়োতে বসে গেল। সেই ফাঁকে আমিও দৌড় দিলুম। পিছনে হিরণমামা ডাকছিলেন, 'টিটো! টিটো! দাঁড়া।'

*　　　　*　　　　*

হোটেল আগে থেকে ঠিক করার উপায় ছিল না। সিয়েমেল একটা ফরাসী হোটেলের কথা বলেছিলেন। আমরা একটা অটো-

রিকশায় করে সেখানে পৌঁছলুম। রীতিমতো পাহাড়ী এলাকা। দার্জিলিঙের মতো কতকটা। রিকশাওলা একটা টিলার কাছে রাস্তায় পৌঁছে হোটেলটা দেখিয়ে দিল। টিলার মাথায় একটা সুন্দর হোটেল: ছবির মতন লাগছিল। অত উঁচুতে ওঠার জন্যে একটা লিফট্ রয়েছে। আমরা লিফটে চড়ে হোটেলের লনে পৌঁছে গেলুম। দু'জনের হাতে মাত্র দুটো বড়ো সাইজের সুটকেস ছাড়া কোন মালপত্র নেই। হোটেলের একজন বেয়ারা দৌড়ে এল। তার চেহারা বিশাল দৈত্যের মতন। একহাতেই সুটকেস দুটো তুলে নিয়ে চলল সে।

দোতালায় পূর্ব-দক্ষিণ কোণার দুটো ঘর আমাদের ভাগ্যে মিলে গেল। ম্যানেজার রাশিয়ান। সিয়েমেলের চিঠিটা দেখাতেই আমাদের খুব আদরযত্ন শুরু করে দিল।

খুব ক্লান্ত বোধ করছিলুম। টানা একমাস জাহাজের দোলানিতে হাড়-মাস ব্যথা করছিল। তাড়াতাড়ি স্নান করে নিলুম। মামা দাড়ি কাটতে ব্যস্ত হলেন। ঘণ্টাখানেক পরে মিঃ সিয়েমেল পৌঁছলেন। পাশের লাগোয়া ঘরে উনি থাকবেন। মিঃ সিয়েমেলের সঙ্গে একজন অদ্ভুত চেহারার লোক। মাথায় একটা বাদামী রঙের টুপি, পরনে ব্রীচেস, আর কোমরে একটা হাতখানেক লম্বা রিভলবার চামড়ার খাপে ঝুলছে। লোকটাকে কী জানি কেন, আমার পছন্দ হল না। মিঃ সিয়েমেল মামার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন, মিঃ ট্র্যাভেল্লো নাম ওর। একটা স্টীমারের মালিক। আমাজন নদীতে মাছ ধরা ওর পেশা।

ট্র্যাভেল্লোকে যতই অপছন্দ করি না কেন, আমাজন নামটা শোনা-মাত্র আমার রক্ত নেচে উঠল। তাহলে কি এবার আমরা এ্যাডভেঞ্চারের দরজায় এসে পৌঁছে গেছি। ট্র্যাভেল্লো বলল, 'সিনোর রায়, জোয়াকিম বুড়োর কাছে আমি আপনাদের নিয়ে যাব, ভাববেন না।'

স্টীমারওয়ালা পর্তুগীজ-জেলে ট্র্যাভেল্লো যে সিয়েমেলের বন্ধু তা জানতুম না। কিন্তু তবু লোকটার কোমরের ওই রিভলবার আর সব

সময় হামবড়াই ভাব আমার অপছন্দই থেকে গেল। ও গুইয়াকিলে এসেছে কী একটা কাজে। আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবে।

মালপত্র সিয়েমেল রেলস্টেশনে বুক করে এসেছিলেন। বিকেলের ট্রেনেই আমরা রওনা দিলুম। পাহাড়ী রেলপথ। পথের দু'ধারে শুধু জঙ্গল, পাথর, নদী আর পোড়ো মাঠ। বসতি খুব কমই চোখে পড়ছিল। প্রায় তের হাজার ফুট উঁচু দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল। কনকনে শীত। প্যারামো নামে একটা স্টেশনে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপর ট্রেন নিচের দিকে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল।

আমরা ভোরবেলা পৌঁছলুম 'কুইটো' নামে একটা ছোট্ট শহরে। সেখানে দুপুরবেলা দুটো ট্রাকে আমাদের মালপত্র আর জনাচল্লিশ রেড ইণ্ডিয়ান ভাড়াটে লোক নিয়ে যাত্রা শুরু হল। ট্র্যাভেল্লো বরাবর আমাদের সঙ্গে চলেছে। হিরণমামা তার সঙ্গে খুব জমিয়ে ফেলেছেন। পরে শুনলুম, আমাজনের জঙ্গল এলাকায় আদিম অধিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলে সেটা 'কিচুয়া' ভাষা, মামা ট্র্যাভেল্লোর কাছে সেই ভাষা রপ্ত করে নিচ্ছেন। উঁচু-নীচু পাহাড়ীপথে ট্রাক দুটো চলতে থাকল। তারপর বিকেলে এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। চারিদিকে ঘন জঙ্গল, মধ্যে একফালি সরু রাস্তা। ধুলোয়-কাদায় একাকার। একটা চোণ্টাগাছের নিচে আমাদের বয় এবং বাবুর্চি ফ্রেড চা তৈরী করতে ব্যস্ত হল। সেই সময় দেখি, আমাদের লোকগুলো ট্রাক থেকে কয়েকটা বাক্স নামাচ্ছে, মামা তদারক করছেন। একটু পরে আমি তো অবাক! অজস্র বন্দুক আর পিস্তলে বোঝাই ছিল বাক্সগুলো—একটুও টের পাইনি। এ সব দেশে আইনকানুনের পরোয়া লোকে কমই করে, তা বোঝা গেল। সিয়ে-মেলের দেখছি এ দেশটা ভালই চেনা-জানা। তিনি গোপনে যোগাড় করেছেন অস্ত্রশস্ত্র।

লোকগুলো প্রত্যেকে বন্দুক পিস্তল হাতে নিল এবার। বুঝলুম, এখন থেকেই আমরা সতর্ক হচ্ছি। ওদের কারো কারো হাতে বর্শা আর তীরধনুকও দেওয়া হল। লোকগুলো কিন্তু মোটামুটি সরল

আর আমুদে মনে হল। চা খেতে খেতে ওরা কী সব গান গাইছিল। অদ্ভুত তার সুর। অনেকবার শোনার ফলে গানের কথাগুলো মুখস্থ হয়ে গেল আমার।

'…তাওয়াসাম্বা তিমিয়ানো,
তিমিয়ানো সিংগারি
সিংগারি উই এরমাংকে
উই এরমাংকে…উই…উই…উই…'

আমি একপাশে একা দাঁড়িয়ে গান শুনছিলুম। ট্র্যাভেল্লো এসে কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠলুম। সে আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে ইংরিজিতে বলল, 'কী বাছা, কেমন মনে হচ্ছে ব্যাপার-স্যাপার?'

একটু সরে এসে বললুম, 'কী ব্যাপার-স্যাপার মিঃ ট্র্যাভেল্লো?'

ট্র্যাভেল্লো আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, 'তোমাদের দেশের ছেলেরা খুব গান পছন্দ করে বুঝি?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম, 'সব দেশের ছেলেরাই করে।'

ট্র্যাভেল্লো আমার ঘাড়ে ওর থ্যাবড়া হাতের একটু চাপ দিয়ে বলল, 'ওরা যে গানটা গাইছে, তা কিন্তু ওদের নিজের ভাষার নয়—জীভারো ভাষার।'

অবাক হয়ে বললুম, 'তাই নাকি! কেন বলুন তো?'

'ওরা নিজেরা রেড ইণ্ডিয়ান। কিন্তু জীভারো ইণ্ডিয়ানদের ওরা বিষাক্ত সাপের মতন ভয় করে। দেখবে, আসল জায়গায় পৌঁছে ক'জন তোমাদের দলে থাকে! সবাই কেটে পড়তে চাইবে একে-একে। হ্যাঁ, যা বলছিলুম, ওরা জীভারো ভাষায় গান গাইছে, কারণ ওদের বিশ্বাস, এর ফলে জীভারোদের দেবতা খুশি হবেন এবং ওদের কোন ক্ষতি করবেন না।'

'আচ্ছা মিঃ ট্র্যাভেল্লো, 'আপনি কখনও জীভারোদের দেখেছেন? তারা কেমন দেখতে?'

ট্র্যাভেল্লো হো-হো করে হেসে উঠল, 'অনেকবার দেখেছি। সব সময় তো আমি আমার ছোট্ট স্টীমার নিয়ে আমাজন আর তার

আশেপাশের নদীতে মাছ ধরে বেড়াই। তারা তোমার আমার মতই মানুষ। এমনি দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা।'

'আপনার কোন ক্ষতি করেনি তো?'

গোঁফে তা দিয়ে ট্র্যাভেল্লো বলল, 'সে হিম্মত ওদের চৌদ্দপুরুষেও নেই! আমার নাম শুনলেই আমাজনের দু'ধারে হই-চই লেগে যায় যে! এদেশের সবচেয়ে হিংস্র জানোয়ার পুমা বা জাগুয়ারের নাম শোনেন? বাঘের মতন দেখতে, কিন্তু বাঘের চেয়ে একশো গুণ হিংস্র আর শক্তিমান জন্তু। সেও আমার এই পিস্তলের আওয়াজ শুনলে পড়ি-কি-মরি করে পালায়।'

বলে আচমকা বিদঘুটে লম্বা পিস্তলটা বের করে আকাশে দুটো গুলি ছুঁড়ে মারল সে। আওয়াজে বিকেলের শান্ত জঙ্গল কেঁপে উঠল। সবাই হইচই করে দৌড়ে এল। মামা বন্দুক তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী হয়েছে ভাই ট্র্যাভেল্লো?'

ভাই অর্থাৎ ব্রাদার ট্র্যাভেল্লো হো-হো করে হেসে খুন। সবাইকে ভড়কে দিয়ে মজা পেয়েছে। কিন্তু মিঃ সিয়েমেল এসে বললেন, 'মিঃ ট্র্যাভেল্লো, প্লীজ···ভাই, দয়া করে কয়েকটা দিন পাগলামিটা বন্ধ রাখো। আমরা, বুঝতেই তো পাচ্ছ, একটু চুপিচুপি এগোতে চাই।'

ট্র্যাভেল্লো গ্রাহ্য করল না। আমার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'এস হে ক্ষুদে অভিযাত্রী, দু'জনে একসঙ্গে আরেক কাপ করে চা খেয়ে নিই। তারপর তোমাকে জীভারোদের অনেক গল্প শোনাব।'

লোকটার গায়ে আঁশটে গন্ধ। আমার বমি এসে যাচ্ছিল প্রায়। কিন্তু এমন ভাবে ধরেছে, ছাড়াতে গেলে রাগারাগি করতে হয়। সেই সময় মামার দিকে চোখ পড়ল। দেখলুম, মামা চোখ টিপে ওর সঙ্গে ভাব জমাতে ইশারা করছেন।

পথের ওপাশে একটা ঝোপঝাড়ে-ঘেরা ফুল ও গাছ দেখিয়ে ট্র্যাভেল্লো বলল, 'এই গাছটার নাম হচ্ছে এমবুয়াশ। ফুল কত দেখছ? ওর থেকে মারাত্মক বিষ হয়। জীভারোরা তীর বা বর্শায় এই বিষ মাখায়। রক্তে এক চিলতে গেলেই ব্যস, আর রক্ষে নেই।'

বলে, সে তার মস্তো ফ্লাস্ক থেকে চা বের করে বলল, 'চোঁ-চোঁ করে গিলে ফেলো। এ চা কিন্তু তোমাদের ইংলিশ চা নয়, স্রেফ দক্ষিণ আমেরিকার জিনিস।'

ওর নোংরা কাপে আমাকে মুখ দিতে হবে নাকি? ভাবলুম, আমার প্লাস্টিকের কাপটা নিয়ে আসি ট্রাক থেকে। কিন্তু তার হাত থেকে ছাড়া পেলুম না।

খাচ্ছি না দেখে সে পিঠে মৃদু থাপ্পড় দিয়ে আদুরে স্বরে বলল, 'খাও বাছা আমার, খোকা আমার, সোনামণি! খেয়ে ফেলো।'

বিব্রত মুখে পিছন ফিরে একটু দূরে মামার দিকে তাকালুম। দেখি, মামার ঠোঁটে হাসি—চোখে ইশারা। ওঃ ভগবান! এই শয়তানের পাল্লায় পড়তে হবে কে জানত! আর মামারই-বা কী আক্কেল, খেতে বলছেন ওই এঁটো কাপে! মামার ওপর রাগ হল। কিন্তু সেই সময় ট্র্যাভেল্লো আমার মুখে গরম চা ঢেলে দিল খানিকটা।

আমি জোরে এক ধাক্কা দিলুম। কাপের সব চা পড়ে গেল। ও দুলে দুলে হাসতে থাকল। রাগে গজরাচ্ছিলুম। ঠোঁট পুড়ে গেছে। ট্র্যাভেল্লো বলল, 'হুঁঃ! এটুকুতে এমন ঘাবড়ে যাচ্ছ খোকাবাবু। তাহলে আমাজনের জঙ্গলে গিয়ে তুমি কী করবে? এ্যাঁ! তার চেয়ে সোজা কলকাতা ফিরে যাও। তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না!'

হনহন করে চলে এসে ট্রাকে নিজের জায়গায় বসে পড়লুম। খানিক পরে ট্রাক ছেড়ে দিল আবার। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আমাদের ট্রাকটার সামনে ড্রাইভারের বাঁদিকে আমি আর হিরণমামা বসে আছি। পিছনের ট্রাকে সিয়েমেল এবং ট্র্যাভেল্লো। ড্রাইভার রাস্তা চেনে।

রাত নামল। রাত বাড়তে থাকল। ক্রমশ আমরা নীচের দিকে নামছি টের পাচ্ছিলুম। তারপর সমতলে এসে পড়লুম। রাস্তা শুকনো, পাথুরে। কিন্তু দু'ধারে ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে দু' একটা অচেনা জন্তু রাস্তা পার হয়ে পালাচ্ছে। হঠাৎ একেবারে আচমকা আমাদের ড্রাইভার একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মাথা নামাল। হিরণমামা

স্টিয়ারিং না ধরে ফেললে গাড়ি জঙ্গলে ঢুকে পড়ত। ইতিমধ্যে ড্রাইভার সামলে নিয়েছে।

পরক্ষণে অল্প আলোয় দেখি, ড্রাইভারের সামনের কাঠের তাকে একটা তীর বিঁধে রয়েছে। মামাও এতক্ষণে দেখতে পেয়ে জোরে হুইসিল বাজিয়ে দিলেন। গাড়ি দুটো তক্ষুনি গতি বাড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে চলতে শুরু করল। ড্রাইভারের মুখ সাদা হয়ে গেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করানোর হুইসিল বাজালেন হিরণমামা। তারপর তীরটা এতক্ষণে তুলে পরখ করে বললেন, 'তীরটা মনে হচ্ছে কোন রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠির। ওরা চায় না যে আমরা ওদের রাজত্বে ঢুকে পড়ি।'

সেই সময় সিয়েমেল পিছনের ট্রাক থেকে দৌড়ে এলেন। তাঁর হাতের টর্চের আলো পড়ছিল। তাতে দেখলুম, উনিও একটা তীর নিয়ে আসছেন। এসে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'মিঃ রয়, মিঃ রয়! রেড ইণ্ডিয়ানরা তীর ছুঁড়েছে!'

মামা তাঁর হাতের তীরটা দেখিয়ে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তবে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না ওরা। আমাদের তো বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।'

ট্র্যাভেল্লো পিছনে অন্ধকার থেকে বলে উঠল, 'সিনোর রয়, জংলী রেড ইণ্ডিয়ানরাও আজকাল বন্দুক, রাইফেল ব্যবহার করতে জানে। ওদের এসব জিনিসেরও অভাব নেই। তবে সভ্য রেড ইণ্ডিয়ানরা ওদের চেয়ে আরও খুনে স্বভাবের। তাই বলছি, অস্ত্র-শস্ত্রের ওপর ভরসা বেশি করবেন না। মগজটা খাটালেই বাঁচবেন।'

হিরণমামা বললেন, 'কিসে খাটাব বলুন তো সিনোর?'

ট্র্যাভেল্লো বলল, 'যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এটা সভ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের এলাকা। কাছে একটা পুয়েব্লো বা বস্তী রয়েছে। পুলিশ রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট আছে। এক্ষুনি গ্রেফতার করে ফেলবে। কারণ অতসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে। তাই বলছি, শিগগির কেটে পড়া যাক।'

মিঃ সিয়েমেল বললেন, 'তাও বটে। আমরা তাহলে লিসো মারোর

কাছে এসে গেছি। বোবোনজো নদী পৌঁছতে আর ঘণ্টাখানেক লাগবে। তারপর সভ্যজগতের সীমা শেষ।'

আমাদের ট্রাক আবার চলতে থাকল। অন্ধকারে হেডলাইটের আলো পড়ছিল। দেখলুম, উৎরাইয়ের পথে নেমে চলেছি। এখন দু'পাশে শুধু ঘন গহন বনজঙ্গল। হ্যাঁ, এবার সভ্যজগতের সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা।

৪. আসিমো ইণ্ডিয়ানদের কবলে

রিও মানে নদী, সেটা ট্র্যাভেল্লো আমাকে শেখাল। রিও বোবোনজোতে তার ছোট্ট স্টীমার নোঙর করা ছিল। নদীর দু'ধারে চলেছে গহন বন। বিশাল সব গাছ আকাশে মাথা তুলে আছে, তলায় ঘন লতা আর ঝোপঝাড়। যুগ-যুগ ধরে গাছপালা জন্মেছে আর মরেছে। ফের সেখানে গাছপালা গজিয়েছে। তার ফলে জঙ্গলের ভিতর কোনদিনই সূর্যের আলো ঢোকে না। যেন চিরকালের রহস্যভরা একটা রাত থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানুষকে হাতছানি দিচ্ছে, 'দেখছ কী ভায়া, সোজা চলে এস এই রূপকথার রহস্যপুরীতে, দেখবে কত আজব কাণ্ডকারখানা ঘটে চলেছে।'

আফ্রিকার অরণ্যে যাই নি বটে, সিনেমায় ছবি দেখেছি তার। কিন্তু আমাজন অরণ্যের কাছে দেখছি, সে তো নেহাৎ ক্ষুদে বাচ্চা। বোবোনজো নদীর ওপর স্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে আছি, আর সেই অরণ্যকে দেখছি। ছমছম করছে বুক। মামা আর সিয়েমেল বঁড়শী ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রেলিঙের ধারে। মাঝে মাঝে একটা করে মাছ ধরছেন। চল্লিশজন রেড ইণ্ডিয়ান কুলিকামিন একসঙ্গে তখন চেঁচিয়ে উঠছে, 'কুম্বো কুম্বো!' নদীতে দেখছি প্রচুর মাছ রয়েছে। ট্র্যাভেল্লোর সঙ্গে আমার এবার জোর জমে গেছে। তবে তার হামবড়াই ভাবটাই যা খারাপ লাগছে। একবার দু-দুটো কালো জাগুয়ার একসঙ্গে কীভাবে মেরেছিল সেই গল্প বলতে বলতে অভ্যাস মতো

রিভলবার বের করে ফের গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছিল, আমি খপ করে ওর হাত চেপে ধরে আটকেছি। বলেছি, 'সিনোর (মশাই) ট্র্যাভেল্লো! আবার তাহলে কারা বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে মারবে জঙ্গল থেকে।' ট্র্যাভেল্লো এমন ভাব দেখিয়েছে যেন ওসব সে থোড়াই পরোয়া করে!

এই নদী গিয়ে রিও মাঁরাও অর্থাৎ আমাজন নদীতে পড়েছে। আমাদের স্টীমার এঁকেবেঁকে সাবধানে এগোচ্ছে। কারণ নদীর জলে অজস্র গাছের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে।

ট্র্যাভেল্লো বলল, 'ক্ষুদে সিনোর, সন্ধ্যে নাগাদ তোমাদের রিমবো হ্রদের ধারে নামিয়ে দেব। আমার সঙ্গে ওখানেই ছাড়াছাড়ি কিন্তু। হ্রদের পশ্চিমদিকে আমাজন নদীর শুরু। সেখানেই প্যাসো স্যাণ্ডো নামে জায়গাটা—জোয়াকিম বুড়োর খামারবাড়ি।'

আমি ওকে খুশি করার জন্যে বললুম, 'ট্র্যাভোল্লোখুড়ো, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে।'

ট্র্যাভেল্লো একটু হাসল। বলল, 'ভ্যাখো খোকামাণ, তোমাদের মতো জীভারোর মমিমুণ্ডু আনতে যাওয়ার শখ আমার নেই! ফুঃ! ভারি তো একটা মমিমুণ্ডু। তার জন্যে এত খরচা করে এত লোক-লস্কর বন্দুক-পিস্তল নিয়ে হামলা করা! ও আমার পোষায় না।'

অমনি বলে উঠলুম, 'কী বলছ খুড়ো! মমিমুণ্ডু আনবার জন্যে আমরা যাচ্ছি নাকি? আমরা তো যাচ্ছি—'

বলেই, জিভ কেটে থামলুম। সর্বনাশ! হিরণমামা আর সিয়েমেন্স অত করে বারণ করেছেন, ওকে আসল খবর যেন ভুলেও না জানাই। আর আমি কিনা মুখ ফসকে প্রায় বলেই ফেলেছিলুম!

কিন্তু ট্র্যাভেল্লো মহা ধড়িবাজ। সে খপ্ করে আমার হাত ধরে বলল, 'এ্যাঁ, এ্যাঁ! মমিমুণ্ডু নয়, মমিমুণ্ডু নয়, তবে···তবে কী?'

হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে বললুম, 'হ্যাঁ, মানে, মমিমুণ্ডুই বটে। তবে সেটা যার-তার নয়, একজন জীভারো ওঝার।'

ট্র্যাভেল্লোর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে থাকল। সে এবার আচমকা

আমাকে কাতুকুতু দিতে দিতে বলল, 'জীভারো ওঝার, জীভারো ওঝার মমিমুণ্ডু? বলে ফেলো, বলে ফেলো দিকি ব্যাটার নামটা ম্যাসিও নাকি! বলো, বলো, বলো……'

ওরে বাবা! ওর আঙুলে কী আছে? কাতুকুতুর চোটে দম আটকানোর দশা। হাতটা এত জোরে ধরে আছে যে ছাড়ানো অসম্ভব। সে আরও কাতুকুতু দিয়ে বলল, 'হাসা হচ্ছে চাঁদুর! হাসা হচ্ছে! এঁ্যা! বলে ফেলো···বলে ফেলো!'

'সাধ করে কি হাসছি! নাড়িভুঁড়ি উগরে যাচ্ছে যেন কাতুকুতুর চোটে। অগত্যা বলে ফেললুম, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ খুড়ো। ম্যাসিও ওঝার মুণ্ডু।'

ট্র্যাভেল্লো ছেড়ে দিল। বিড়বিড় করে কী ভাষায় কিছু কথা বলছে আপন মনে জানি না। সেই সময় ওদিকের ডেক থেকে সিয়েমেল ডেকে বললেন, 'কী ব্যাপার টিটো? অত হাসছ কেন?'

আমি বলার আগে ট্র্যাভেল্লো বলে দিল, 'তোমাদের ভাগ্নেমশাই তো আমাজনের জঙ্গলে যাচ্ছে, তাকে খানিক ট্রেনিং দিচ্ছি ভায়া সিয়েমেল! জানো না তো, ঢুণ্ডার পাল্লায় পড়লে কী হয়! ঢুণ্ডা কামড়ায় না। কাতুকুতু দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলে! তাই খোকামণিকে পরখ করে দেখছি, কতটা কাতুকুতু সইতে পারে!'

এই বলে সে ভীষণ জোরে হেসে উঠল। সিয়েমেলও হাসলেন। তারপর বঁড়শীর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। আমি বললুম, 'ঢুণ্ডা কি ট্র্যাভেল্লো খুড়ো?'

ট্র্যাভেল্লো গম্ভীর হয়ে বলল, 'ইণ্ডয়ানচির চেলা।'

'ইণ্ডয়ানচি কে?'

'জীভারোদের দেবতা—জঙ্গলের রাজা সে। ঢুণ্ডা তার চেলা।'

'ভূতটুত নাকি?'

'কে জানে ভূত না মানুষ, না জানোয়ার! তবে তার পাল্লায় যে পড়েছে, তার বাঁচোয়া নেই। শুনেছি, ঢুণ্ডারা ভারি সুন্দর চেহারার মানুষ হয়ে দেখা দেয়। ম্যাসিও ওঝার সান্‌সা আনতে যাচ্ছ, যাও। দেখবে কী হয়।'

'সান্সা কী খুড়ো ?'

'সেও জানো না ? মমিমুণ্ডুকে ওরা সান্সা বলে।' এই বলে ট্র্যাভেল্লো হেঁড়ে গলায় গাইতে লাগল হঠাৎ—

ওয়াকিনি ইগুয়ানচি···উই।
এরমাংকে সান্সা···উই।
চুণ্ডা এরমাংকে···উই।
উই···উই···উই !!

অমনি আমাদের রেড ইণ্ডিয়ান লোকগুলো যে-যেখানে ছিল, একসঙ্গে চাপা গলায় গানটা গাইতে লাগল। চোখেমুখে ওদের দারুণ আতঙ্কের ছাপ। হিরণমামা, আর মিঃ সিয়েমেল রেলিঙের কাছে ঘুরে অবাক চোখে এদিকে তাকিয়ে রইলেন। স্টীমারটার গতিও যেন বেড়ে গেল এই সময়। ট্র্যাভেল্লোর মাঝিমাল্লা সারেঙও কাজ করতে করতে ওই গানে যোগ দিল। আমার বুক কাঁপতে থাকল। নদীর ধারে ঘন সবুজ অরণ্যের ওপর সূর্যের আলো ঝকমক করছে। নিচে গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে যেন হাজার হাজার মরা জীভারো ওঝার ভূতপ্রেত সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে।

সন্ধ্যা নাগাদ রিমবো হ্রদের পশ্চিম তীরে একটা পাহাড়ের ধারে আমাদের নামিয়ে দিয়ে ট্র্যাভেল্লো তার স্টীমার নিয়ে চলে গেল। বারোটা তাঁবুতে আমাদের সব জিনিসপত্র ধরে গেল। পাথুরে মাটি এখানে। চারিদিকে কিছুটা তাই ফাঁকা। তারপর গহন বন। বনের ভিতর ছোটবড়ো অনেক পাহাড় মাথা তুলেছে। রাঁধুনী ফ্রেড বাইরে কেরোসিন স্টোভে রান্না করছে। রেড ইণ্ডিয়ানরাও আগুন জ্বেলে রুটি সেঁকছে, ভুট্টা পোড়াচ্ছে। একটা ক্যাম্প-খাট বাইরে এনে মামা আর সিয়েমেল বসেছেন। চাপা গলায় কিছু কথা বলছেন। আমি সামনে কিছু তফাতে উঁচু হয়ে থাকা একটা বড়ো পাথরের ওপর বসে হ্রদের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। বিশাল হ্রদের জলে আকাশের তারাগুলো চুমকির মতন ঝিলমিল করে উঠছে। অন্ধকার রাত। কিন্তু এখন আর ভয় নেই, উত্তেজনায় রক্ত আমার

চঞ্চল। চার্লস জেভিয়ারের ডাইরির কথাগুলো মনে ভাসছে। কাল সকালেই হিরণমামা যাবেন জোয়াকিম বুড়োর খোঁজে। তারপর আমাদের অভিযান শুরু হবে।

আপন মনে বসেছিলুম। হঠাৎ কী একটা শক্ত দড়ির মতো এসে গলায় জড়িয়ে গেল, আর হ্যাঁচকা টানে আমি পাথরটার ওদিকে গিয়ে পড়লুম। চ্যাঁচাবার আগেই আমার মুখে দুর্গন্ধযুক্ত কার হাত চেপে ধরল। কোন স্বর বেরুল না আমার। তারপর দেখি, আমাকে কে বা কারা তুলে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। জলের ধারে-ধারে যে যাচ্ছি তা টের পেলুম। সেই সময় পিছনে প্রথমে হিরণমামার চিৎকার শুনলুম, 'টিটো, টিটো!' তারপর সিয়েমেলের ডাক, 'টিটো, টিটো!' তারপর বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। একটা অস্পষ্ট গোলমালও শুনতে পেলুম।

এখন আমাকে কারা যেন জঙ্গলে এনে ফেলেছে। কী দুর্গন্ধ এদের গায়ে! এরা মানুষ না জন্তু! মানুষই মনে হচ্ছে। কিন্তু এরা আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? কেন? কারা এরা? আমি আবার চ্যাঁচাতে চেষ্টা করলুম, পারলুম না। গলায় ফাঁসটা চেপে বসেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একসময় অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

যখন চোখ খুললুম, দেখি আমার সামনে আগুন জ্বলছে। আর তার তিনদিক ঘিরে বেঁটে হনুমানের মতো অদ্ভুত চেহারার একদল লোক বসে রয়েছে। তাদের পিছনে একজন দাঁড়িয়ে শুধু দুলছে আর দুলছে। সে হঠাৎ চোখ খুলে তাকাল আমার দিকে। অমনি রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ও কি মানুষ? নাকি কোন জানোয়ার?

অমন বীভৎস মুখ আমি স্বপ্নে কখনও দেখিনি। ভূতের স্বপ্ন বরাবর দেখি, তারা মানুষের মতোই কতকটা। কিন্তু এই মুখটা যে স্বপ্নের নয়, তা বুঝতে পারছিলুম। মুখের একটা দিক পোড়া এবং গলার সঙ্গে আটকানো, অন্যদিকটা কালো। সেদিকটার চোয়ালে খোঁচা-খোঁচা মাংস ঝুলছে। সেও বেঁটে। গায়ে নোংরা

একটা চামড়ার আলখেল্লা মতো চাপানো আছে। গলায় হাড়ের মালা। মাথায় পালক-গোঁজা টুপি। ছ'পাশে লালচে চুলের গোছা ঘোড়ার লেজের মতো ঝুলছে। তার হাতে একটা কাঠের বাটি। ছলতে ছলতে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বাটিতে চুমুক দিল সে। কী গিলল? তখন দেখলুম, ওর একটা চোখ নেই—সেখানে কালো গর্ত।

এবার সে গোঁ-গোঁ করে বলে উঠল, 'আসিমো! আসিমো!'

তখন বাকি বসে থাকা লোকগুলো বলল, 'ওয়াকিনি! ওয়াকিনি!'

কথা ছটো আমার জানা আসিমো জীভারোদেরই একটা শাখাবংশ বলা যায়। ওয়াকিনি জঙ্গলের দেবতা। আমি তাহলে কি আসিমোদের কবলে পড়েছি? এরা কী করতে চায় আমাকে নিয়ে?

যে কাঠগুলো জ্বলছে তা চিনি। চোণ্টা কাঠ। মশালের মতো জ্বলে। তার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ওদের সামনে একটা মতো কেলে হাঁড়ি রয়েছে। তা থেকে কাঠের চোঙায় কী তুলে ঢকঢক করে খাচ্ছে। মনে পড়ল, সিয়েমেল বলেছিলেন, আসিমোরা খুব নেশাখোর। 'আওয়াউসা' নামে এক রকম নেশার জিনিস খায়। হ্যাঁ, ব্যাটারা তাই খাচ্ছে বটে। ঝাঁঝাল ছর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

এবার বীভৎস চেহারার লোকটা হেঁকে উঠল. 'নেমাতিন! নেমাতিন!'

অমনি আমার পিছন দিক থেকে চারজন পুরুষ আর ছটি মেয়ে দৌড়ে গিয়ে নাচ জুড়ে দিল। 'নেমাতিন' ওদের যুদ্ধের নাচ তাও আমার মুখস্থ। হায়, যদি ট্র্যাভেল্লোর কাছে হিরণমামার মতো কাজ চালানো গোছের 'কিচুয়া' ভাষাটাও শিখে নিতুম! আফশোষ হতে লাগল। ওরা বিকট ভঙ্গীতে আগুন ঘিরে নাচছে, আর মাঝে মাঝে বড়ো হাঁড়িটা থেকে চোঙায় কী তুলে গিলছে। বসে থাকা লোকগুলো এবার চাপা গলায় গান শুরু করল। শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেল—

'আসিমো এরমাংকে……উই।

উই ওয়াকিনি এরমাংকে…উই! উই…উই…উই!!'

একটা খুঁটিতে আমার হাত দুটো পিঠের দিকে বাঁধা। ভয়ে আমার হাত-পা জমে আসছিল। বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছিল।

কতক্ষণ কেটে গেলে এক সময় দেখি, সামনের আগুন নিভে এসেছে। লোকগুলো চারপাশে মাটিতে লুটোচ্ছে। আর সেই মামদো ভূতটা এখন একটা কাঠের গুঁড়িতে বসে মাথা নিচু করে শুধু দুলছে আর দুলছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। হাতের বাঁধনটা টানাটানি করে খোলবার চেষ্টা করলুম। কব্জি কেটে যাচ্ছিল তার ফলে। যন্ত্রণা হচ্ছিল, তবু দমে গেলুম না। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর খানিকটা আলগা করা গেল বাঁধন। চারিদিকটা দেখে নিলাম। পিছনে অজস্র সারি-সারি কাঠের গুঁড়ির দেয়াল, ওপরে খড়ের ছাউনি, লম্বা-চওড়া একটা ঘর রয়েছে দেখা গেল। তার একটি মাত্র ঘুপটি দরজা। দরজার দুপাশে বর্শা-হাতে দুটো লোক হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই সুযোগ।

একটা হাত খুলে যেতেই পকেট থেকে ছুরি বের করলুম। লতার তৈরী শক্ত দড়িটা কেটে অন্য হাতও ছাড়ানো গেল। আরও মিনিট পাঁচ চুপচাপ বসে রইলুম। মাথার ওপর গাছপালা, সামনে একটুকরো ফাঁকা জমিতে ওরা এতক্ষণ নেচে হয়রাণ হয়ে পড়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে না, ভোর হতে কতো দেরী।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালুম। মাথা ঘুরছে। শরীর খুব দুর্বল লাগছে। পা টিপে-টিপে ফাঁকার দিকে এগিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। তারপর আরেক বার দেখে নিয়ে চলতে শুরু করলুম। সেই অন্ধকারের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মনে হল, আমি চোখদুটো হারিয়ে এসেছি। মোটামোটা লতা-পাতা গায়ে ঠেকছে, বাধা দিচ্ছে। হাত বাড়িয়ে, পা সাবধানে ফেলে আন্দাজে চলেছি। কতবার গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খাচ্ছি। এইভাবে কতদূর গেলুম

জানি না—একটা ফাঁকা জায়গায় এলুম। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ভোর হয়ে আসছে। জিরিয়ে নেবার জন্যে সেখানে একটু বসলুম।

একটু পরে চারদিকটা দেখবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ চোখ পড়ল, ঝোপ-ঝাড় ঠেলে কী যেন এগিয়ে আসছে। ফাঁকা জায়গার ধারে আসা মাত্র আমার পিলে চমকে গেল। সর্বনাশ! সেই মামদো-ভূতটা। দুলতে দুলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

ও কেমন করে টের পেল? থরথর করে কেঁপে উঠলুম। আমার হাতে ছুরি রয়েছে ভুলেই গেলুম। ওর কুতকুতিতে একটা চোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—অন্ধকার পাতলা হয়ে যাচ্ছে তাই। সে এগোচ্ছে আমার দিকে। আমি যেন মন্ত্রের গুণে অবশ হয়ে গেছি। হঠাৎ দেখি, মাত্র তিন-চার হাত দূরে চলে এসেছে সে। তারপর গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'ওয়াকিনি! আসিমো ওয়াকিনি!'

অমনি আমি লাফ দিলুম। দৌড়ে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে আবার আঁধার রাজ্যে ঢুকে গেলুম। পিছনে চাপা গর্জন করতে করতে চলে আসছে সে, 'ওয়াকিনি! ঢুগা ওয়াকিনি!'

মনে হল, তার হাত থেকে আমার রেহাই নেই। গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, বারবার লতায় জড়িয়ে যেতে-যেতে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি। সেও যে এবার দৌড়াচ্ছে তা বোঝা গেল। পায়ের শব্দ পাচ্ছি ধুপ, ধুপ, ধুপ। হাঁটছে না, যেন ঢাক বাজছে।

আবার একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লুম। ভোরের আলোয় স্পষ্ট হয়ে আছে সেখানটা। এখানে-ওখানে কেয়া-ঝোপের মত দেখতে কী ঝোপ রয়েছে! কতকগুলো ঝোপ দেখে অবাক লাগল। চারপাশে গোল হয়ে মাটিতে পড়েছে কেয়া পাতার মতো লম্বা কাঁটাওয়ালা শাখা বা পাতা—মধ্যিখানটা ফাঁকা। হঠাৎ দেখি, সেই বীভৎস মূর্তি ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল। তারপর অস্পষ্ট গর্জন করে দৌড়ে এল। আর একটু হলেই ধরে ফেলবে ও। ছুরি বাগিয়ে ঘুরে দাঁড়ালুম।

অমনি এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। সেই লুটিয়ে থাকা লম্বা ডাঁটাগুলো কিংবা শাখাগুলো সাঁৎ-সাঁৎ করে চারদিক থেকে উঠে মূর্তিটাকে খাঁচায় আটকানোর মতো বন্দী করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ও অমানুষিক কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। সর্বনাশ! এই গাছগুলো জ্যান্ত দেখছি! আর্তনাদ সমানে চলল। আমি ফের দৌড়তে থাকলুম।

৫. পুয়েব্‌লো—জাভারোবস্তী

যেদিকে খুশি টলতে টলতে হাঁটছি, আর মাঝেমাঝে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। যখন পা বাড়াচ্ছি, আগে ভাল করে দেখে নিচ্ছি সেই খাঁচাকলের মতো রাক্ষুসে কেয়াগাছগুলো আছে কিনা? আকাশে দিনের আলো ফোটার ফলে বনের তলায় আঁধার কমে গেছে। কিন্তু যতদূর যাচ্ছি, সেই মামদো চেহারার আস্কিমো ওঝার বীভৎস আর্তনাদ কান থেকে মুছে যাচ্ছে না।

সত্যি বলতে কী, আমার মনে ওই হতভাগ্য ওঝার অমন অসহায় মৃত্যুর জন্য কষ্টও কম হচ্ছে না। আহা, সেও তো আসলে আমার মতো একজন মানুষ! আমার মতই সে সুখে হাসে, দুঃখে কষ্ট পায়। আমার মতো তারও কথা বলার ভাষা আছে। হ্যাঁ, সে একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। আমি···এই শ্রীমান টিটো যদি কলকাতায় না জন্মে আমাজনের এই জঙ্গলে জন্মাতুম তাহলে কি আমি নিছক জানোয়ার হয়ে যেতাম? মোটেই তা মনে হয় না। লোকটার জন্যে কষ্ট হতে লাগল। একেক দেশের একেক রকম সমাজ, একেক রকম রীতিনীতি। জঙ্গলের মানুষের রীতির সঙ্গে বাইরের মানুষের রীতি-নীতি মিলবে কেন? আসলে আমার মতো মানুষের সঙ্গে ওরা যেমন মেলামেশার সুযোগ পায়নি, তাই ওরা যেমন আমাকে ভয় করে, আমিও ওদের তেমনি ভয় করি।

এই সব ভেবে আমার মন দমে গেল। আমার কাছে একটা

ছুরি রয়েছে। ইচ্ছে করলেই ওকে আমি বাঁচাতে পারতুম। ছি ছি! এভাবে ওকে অক্টোপাশের মত রাক্ষুসে হাতওয়ালা গাছটার ফাঁদে অসহায় হয়ে মরতে দেখেও পালিয়ে আসা উচিত হয়নি। আমি না সভ্য শিক্ষিত মানুষ! দুঃখে চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু আবার ভাবলুম, ওকে বাঁচালে কি ও আমাকে ছেড়ে কথা কইত? ওরা যে অসভ্য! যাক্‌গে, এখন নিজের প্রাণ বাঁচানোই সমস্যা। এই দুর্গম জঙ্গল, পায়ে-পায়ে অজানা বিপদ। কতদিনে সভ্য মানুষের দেখা পাব, ঠিক নেই। হয়তো এখানেই কোন জীভারোর বিষাক্ত তীর বা বর্শার আঘাতে, কিংবা সাপখোপ পোকা-মাকড় জন্তুজানোয়ারের হাতে যে-কোন সময় মারা পড়ব। কোথায় মৃত্যু ওঁৎ পেতে রয়েছে, কে বলতে পারে?

অরণ্যের মাথায় রোদ চড়া হচ্ছে টের পাচ্ছিলুম। ভয়ে, দুর্ভাবনায়, ক্লান্তিতে এক সময় ভেঙ্গে পড়লুম। ভাঙ্গা গলায় মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, হিরণ মা—মা—আ! সিয়েমেল সা—য়ে—ব!

কোন সাড়া এল না। কেবল 'টোগো' পাখির ঝাঁক কিচমিচ করে উঠল চুওর গাছের মাথায়। নায়েগ্রিলতার ঘন ঝাড়ে মুস্তি নামে লেজঝোলা সুন্দর পাখিটা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে লুকোবার চেষ্টা করল। আশে-পাশে কোথাও বাঁদরের ডাক শোনা গেল। তারপর মনে হল, দূরে কোথাও যেন পুমার গর্জন শুনলাম। পুমা বাঘজাতীয় জানোয়ার। প্রচণ্ড হিংস্র আর শক্তিমান। বড় বড় ঘোড়া কিংবা মোষ সে থাবার ঘায়ে কাবু করে পিঠে চাপিয়ে দিব্যি গাছে উঠতে পারে।

থমকে দাঁড়ালুম। হাত-পা অবশ হয়ে গেল। নিশ্চয় কোন পুমা আমার গন্ধ টের পেয়ে জিভ বের করে দৌড়ে আসছে। হয়তো গাছের ডালে-ডালে বাঁদরের মতো এগোচ্ছে, আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়বে। এত ভয় হল যে, ছুরিটা পকেট থেকে বের করার মতো হাতে জোর পেলুম না। কিন্তু ছুরি দিয়েই বা কি করব?

আবার পুমার গর্জন শোনা গেল। অনেকটা কাছে। তখন

পাগলের মতো ডাইনের ঝোপে ঢুকে পড়লুম। সতর্ক চোখে চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে থাকলুম। তারপর একটা কাঁটাওয়ালা গাছ দেখতে পেলুম। গাছগুলোকে বলে 'টিমাকো'। কুইটো থেকে রওনা হবার পর পথে আমাকে ট্র্যাভেল্লো চিনিয়ে দিয়েছিল। টিমাকো দেখতে আমাদের দেশের কদমগাছের মতো, কিন্তু আষ্টে-পিষ্টে ছ'সাত ইঞ্চি লম্বা সব কাঁটা রয়েছে। কাঁটা বাঁচিয়ে ওঠা যায়। শুনেছি, টিমাকো গাছকে শুধু পুমা নয়, গেছো প্রাণী বাঁদর হনুমান কাঠবেড়ালি রাক্কুসে গিরগিটি জাতীয় সেই গোসাপ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ভয় করে।

গাছটায় অনেক সাবধানে ওঠা গেল। প্রকাণ্ড গাছ। দু'শো আড়াইশো ফুট উঁচু। কিন্তু ওঠা খুব সহজ। জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে যে ডালটা উঠেছে, একেবারে সেখানে গিয়ে বসলুম। নিচে অনেকটা জায়গা চারদিকে দেখা যাচ্ছিল। শুধু অরণ্য আর অরণ্য, কোথাও নীল রংএর পাহাড়। কোথাও কোন মানুষ দেখা গেল না। পুমার ডাকটা এবার মিলিয়ে গেল। আরও কিছু পরে হঠাৎ এক জায়গায় কিছুটা দূরে ধোঁয়া দেখে চমকে উঠলুম। যেখানে ধোঁয়া সেখানে আগুন। আর আগুন থাকলেই মানুষ থাকবে। জানি না, তারা কেমন মানুষ, কিন্তু এখন মানুষের জন্যে আমার প্রাণ ছটফট করছে।

গাছ থেকে নেমে সেদিকটা অনুমান করে হেঁটে চললুম। একবার ভয় হল, ও আগুন দাবানল নয় তো? সিয়েমেলের কাছে শুনেছি, একবার জঙ্গলে দাবানলের মধ্যে পড়ে প্রায় পুড়ে মরতে-মরতে বেঁচে যান। চারদিক থেকে আগুন ঘিরে ধরলে আর বাঁচার উপায় থাকে না। দাবানল কী থেকে হয় তা জানি। জঙ্গলের শুকনো গাছে ডালে-ডালে অনবরত বাতাসের দোলায় ঘষা খেতে-খেতে আগুন জ্বলে ওঠে। তারপর ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকে আরও কিছুটা যাওয়ার পর নাকে পোড়া কাঠের গন্ধ এল। তারপর জলের কলকল শব্দ শোনা গেল।

আবার সাবধানে পা বাড়ালুম। তারপর দেখি আমি একটা

ছোট্ট নদীর ধারে পৌঁছে গেছি। নদীটা কানায় কানায় ভরা। স্রোত বইছে প্রচণ্ড বেগে। জলের মধ্যে বড় বড় পাথর উঁচু হয়ে রয়েছে। আর এ দেশের নদীর যা রীতি—অজস্র গাছের গুঁড়ি ভেসে ভেসে যাচ্ছে। এসব নদীতে কুমীর থাকে শুনেছি। হিংস্র সামুদ্রিক মাছ 'বারাকুদা'ও মাঝে মাঝে লোনা জল ছেড়ে এই মিঠে জলের স্বাদ নিতে আসে। আর থাকে জলচর অজগর অর্থাৎ পাইথন। ভয়ংকর জলবানর ওপাংকার কথাও শোনা যায়।

তেষ্টায় গলা শুকনো। ভয় উবে গেল জল দেখে। কী সুন্দর স্বচ্ছ জল! তলা অব্দি দেখা যাচ্ছে। পাড়ে শুয়ে দু'হাতে আঁজলা ভরে জল খেলুম। মুখ কাঁধ হাত এবং পা ধুয়ে ফেললুম। খুব আরাম লাগল। তারপর চুপচাপ বসে ভাবছি, এবার কী করা যাবে। কাঠ-পোড়া গন্ধ নাকে আসছে তখনও। তার মানে আগুনটা নদীর এপারেই কোথাও কাছাকাছি রয়েছে। সেখানে নিশ্চয় অসভ্য রেড-ইণ্ডিয়ানদের কেউ—হয় জীভারো, নয়তো আসিমোরা রয়েছে। ঘাবড়ে গেলুম। যদি ওরা আমাকে আগের বারের মত বেঁধে রাখে!

সেই সময় হঠাৎ দেখি—নদীতে আমার কাছ থেকে প্রায় হাত দশেক দূরে একটা 'ক্যানো' বা ছিপনৌকো, আর একজন বেঁটে লালচে চেহারার লোক তাতে বসে একহাতে বর্শা তাক করছে। না, আমার দিকে নয়—জলে। আমাকে সে দেখতে পায়নি, তার নজর মাছের দিকেই মনে হল। ঝটপট ঝোপের আড়ালে সরে এলুম। লোকটাকে দেখতে থাকলুম।

খালি গা, বুকে ঝুলছে একটা রঙীন পাথরের মালা। বুকে হাতে নীল রং-এর উল্কির মতো কী ছবি আঁকা রয়েছে, তেমনি নাকের ওপর আর গালে আমাদের দেশের রসকলির মতো টানাটানা তিলক কিংবা কাটাকুটি সব সাদা রং-এর চিহ্ন রয়েছে। মুখের দু'ধারে দুটো ঘোড়ার লেজের মত লালচে বেণী ঝুলছে—বেণী দুটো সুতোর মতো লতা দিয়ে সুন্দরভাবে জড়ানো। কপালের ওপর চুলটা ছাঁটা—আমাদের দেশের পাহাড়ী মানুষ নাগাদের মতো। তার পরনে হাঁটু অব্দি ডোরাকাটা

পুরু তাঁতের ছোট্ট লুঙ্গিমতো কাপড়। হ্যাঁ, গলায় অবিকল বৈষ্ণবদের যেমন তুলসীকাঠের মালা থাকে, তেমনি একটা মালা জড়ানো—আঁটো হয়ে আছে।

দেখে অমনি আমার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। সিয়েমেলের কাছে জীভারোদের ফটো দেখেছি। জীভারো! নির্ঘাত জীভারো! আমি এবার সত্যি জীভারোদের দেখা পেয়ে গেছি! এরাই মুণ্ডু কেটে কী কৌশলে ক্ষুদে কমলালেবুর মতো করে ফেলে। মমি মুণ্ডু 'সানসা' বানায়। পৃথিবীর সভ্য মানুষদের কাছে 'সানসা' ভয়ংকর জিনিস। এখনও বিজ্ঞানীদের কাছেও এক পরম বিস্ময়কর রহস্য।

লোকটার বরাত। সত্যি, একটা বড়োসড়ো বোয়ালজাতীয় মাছ গেঁথে ফেলল দেখছি। ওর সঙ্গে আমাদের দেশের গ্রামে যে জেলেদের দেখেছি, তার একতিল তফাৎ খুঁজে তো পেলুম না! জীভারোরাও যে মানুষ, তাতে সন্দেহ কী?

লোকটা মাছ গেঁথে 'ক্যানো'টা ঘুরিয়ে ভাঁটার দিকে চলল। আমি পাড়ে তাকে অনুসরণ করলুম। একটু পরেই দেখি, সে নৌকো এক জায়গায় বাঁধল। লগি পুঁতে মাছটা নিয়ে লাফ দিল ডাঙায়। ঘাটে চার-পাঁচটি ক্ষুদে বাচ্চা আর দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে। লোকটাকে ঘিরে ধরে ওরা সবাই যেদিকে এগোলো, সেদিকে তাকাতেই দেখলুম আসিমোদের মতো অবিকল একই গড়নের একটা মস্তো বড় ঘর—দরজাটাও ছোট্ট।

এই বস্তিগুলোকে বলে পুয়েব্লো। একটা পরিবার নিয়ে একটা 'হাসিয়েন্দা' অর্থাৎ এইরকম লম্বা ঘর।

আমি যা থাকে বরাতে ভেবে মরিয়া হয়ে দৌড়লুম। ওদের পিছন-পিছন ঘরে ঢুকে পড়লুম।

ঘরটা ধোঁয়ায় ভরা। আমি কিছু দেখার আগেই ওরা দেখে ফেলেছে আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে যে-যেখানে ছিল, পাথরের মূর্তির মতো চুপ হয়ে গেছে।

৬. নুহা ! হে অতিথি বন্ধু !

কতক্ষণ কেটে গেল জানি না। তারপর একটা নড়াচড়ার শব্দ উঠল।

'নুহা!' ফিসফিস করে উঠল কোণের এক বুড়ি। সে একটা উনুনের কাছে বসেছিল। উনুনে মস্তো হাঁড়িতে কী সেদ্ধ হচ্ছে। একটা কাঠের বারকোষে একগাদা রাঙা আলুর মতো কী যেন শেকড়-বাকড় রয়েছে। আমি হাঁটু মুড়ে বসে পকেট থেকে ছুরি আর রুমালটা বের করলুম। ট্রাভেল্লোর কাছ থেকে শেখা বিদ্যেটা পরখ করে দেখা যাক্। রেড ইণ্ডিয়ানরা উপহার পেলে নাকি খুব খুসি হয়। জীভারোরাও হতে পারে, কারণ আসলে তারাও তো আদিম ইণ্ডিয়ান। তবে আরও অসভ্য এই যা। ঘোড়ায় চাপতে জানে না অন্য সব রেড ইণ্ডিয়ান জাতের মতো। বন্দুক পিস্তল ছুঁড়তেও শেখেনি। আর জীভারোরা মাথায় পালকের মুকুটও পরে না।

মাচা থেকে বুড়ো উঠল। বুঝলুম এ নিশ্চয় ওদের মোড়ল বা 'কুরাকা'। দু'হাতে এই সামান্য উপহার দুটো নিয়ে আমি মাথা ঝুঁকিয়ে বললুম—'কুরাকা, কুরাকা!'

মোড়ল আমার হাতের জিনিসগুলো তুলে নিল ছোঁ মেরে—যেন আমার হাতে ওর হাত ঠেকলে পুড়ে যাবে। তারপর সবাইকে দেখাল। প্রত্যেকের মুখে কোন ভাবভঙ্গি নেই—যেন সব পাথরের মুখ। এবার বুড়িটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নুহা রিফিলি।'

বুড়ো মোড়ল মাচায় ছুরি ও রুমালটা রেখে নিচে হুমড়ি খেয়ে কী বের করতে ব্যস্ত হল। বাচ্চাগুলো যেন ভয় পেয়ে গেছে—মেয়েদের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলুম। মুখের ভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইলুম, আমি তোমাদের বন্ধু। কিন্তু কেউ হাসল না।

তারপর দেখি মোড়ল মাচার তলা থেকে একটা রাইফেল বের করল। আমি তো হাঁ। রাইফেলটা দু'হাঁটুর ওপর রেখে সে ফের হাত বাড়িয়ে বের করল একটা বুলেটের চওড়া বেল্ট। অনেকগুলো কার্তুজ সাজানো রয়েছে। কোথায় পেল ওরা?

মোড়ল রাইফেল ও কার্তুজের মালা দেখিয়ে বলল, 'নুহা, রিফিলি।'

'রিফিলি' বলতে রাইফেল বোঝাচ্ছে তা ঠিক। সে বারবার কথাটা বলে আর রাইফেলটা দেখায়। হায়, যদি বুদ্ধি করে ট্রাভেল্লোর কাছে 'কিচুয়া' ভাষাটা শিখে নিতুম! কতক্ষণ এভাবে দু'পক্ষ কথা বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলুম। তারপর মরিয়া হয়ে হাত বাড়ালুম, অর্থাৎ রিফিলিটা আমাকে দাও।

আশ্চর্য—দিল। কার্তুজের মালাটাও দিল। তারপর আমার হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেল। ঘরেব দশ-বারোজন ছেলেমেয়ে বুড়ী-জোয়ান সবাই পিছনে বেরলো। মোড়ল এবার বেড়ার ধারে গিয়ে একটা চুওর গাছের দিকে ইসারা করল। কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু সে বারবার আমাকে খোঁচা দিয়ে দেখাতে লাগল। অবশেষে দেখি, গাছের ডালে ঘন ছায়ার মধ্যে—প্রায় অন্ধকারই বলা যায় ওখানটা, একটা লাল বেবুনের মতো বাঁদর বসে রয়েছে। আমাজন অঞ্চলে বাঁদরের মাংস খুব আনন্দে খায় শুনেছিলুম। রাইফেল ছুঁড়তে আমি ভালই জানি। গুলি পুরে সেফটি ক্যাচ তুলে দূরত্বটা আন্দাজ করে নিলুম! লোকগুলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমাকে লক্ষ্য করছে। বাঁদরটার একটা পাশ আমি দেখছি। সেফটি-ক্যাচ তোলার ওইটুকু শব্দেই সে আমার দিকে ঘুরে দাঁত খিঁচলো। তারপর অনবরত দাঁত খিঁচোতে থাকল। আমার হাসি পেলেও এরা কেউ হাসছে না। এরা কি পাথরের মানুষ যে হাসতে জানে না? মোড়ল আমার পাঁজরে খোঁচা মেরে ফিসফিস করল, 'নুহা রিফিলি কাচা! কাচা!'

ঘোড়ায় টান দিলুম। হাত কাঁপছিল। প্রচণ্ড আওয়াজে।

সচকিত হয়ে উঠল সকালের নিথর অরণ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে গেল। বারুদের গন্ধে ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা। ওই স্পেনীয় রাইফেলগুলোর কী রকম বদমেজাজ আমি জানি—সিয়েমেল বলেছিলেন আসার পথে। হায়, আমার বরাত! গুলি লাগল কই? বেবুনটা তড়াক করে ওপরের ডালে উঠে এবার ভীষণ মুখভঙ্গী করে দাঁত খিঁচিয়ে ধমকাতে শুরু করল। মোড়ল বলল—'টাকাচা টাকাচা!'

বুঝলুম 'কাচা, মানে গুলি ছোঁড়ো। 'টাকাচা' মানে নিশ্চয় আবার গুলি ছোঁড়ো। এবার আমার বরাত ফিরল। বেবুনটা গুলি খেয়ে একটু পরে বড়ো পাথরের মতো ঝুপ করে বেড়ার ওপর পড়ল—তারপরই দেখি সে রক্তমাখা শরীরে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে এগিয়ে আসছে। এবার সবাই বলে উঠল—'সুহা টাকাচা! সুহা টাকাচা!' (হে অতিথি বন্ধু, আবার গুলি করো!)

আরেকটা গুলিতে বেবুনটা স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটাকে টানতে টানতে ফাঁকা উঠোনের মধ্যে নিয়ে এল। সেই বুড়ি—মোড়লের বউ নির্ঘাৎ—একটা কাঠের গুঁড়ি বসবার জন্যে এনে দিল। মোড়ল বসল গম্ভীর মুখে। অদ্ভুত অতিথিসেবা তো! আমি দাঁড়িয়ে রইলুম দেখেও বসতে বলল না।

উঠোনে রোদ আছে, ছায়াও পড়েছে একদিকে। ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে বসলুম। মোড়ল আমার ছুরিটা দলের লোকদের দিতেই ওরা বেবুনটার ছাল ছাড়াতে লাগল। অপূর্ব দক্ষতায় ছাল ছাড়ানো দেখে ওদের অসভ্য মনে হচ্ছিল না। এই সময় হঠাৎ দেখি, একটি বছর বারো-চৌদ্দ বয়সের মেয়ে হাসিমুখে আমার দিকে একটা মাটির পাত্রে কী নিয়ে আসছে। তাতে ভাপ উঠছে। তাহলে হাসতে এরা জানে! মন আনন্দে নেচে উঠল। সে পাত্রটা ধরে বলল, 'সুহা! চিকা!'

'সুহা' মানে তাহলে বন্ধু—সম্ভবত অতিথি বন্ধু! ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি, এরা কেন আমাকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছে। ওই রাইফেলের

শক্তি তারা কোন ভাবে টের পেয়েছে। তাই রাইফেলটা যেভাবে হোক হাতে পেয়ে গুলি ছোঁড়া শিখতে চায়। রাইফেলটার উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণাম জানালুম। ওটাই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে—মান বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওর হাতের পাত্রে ভাপওঠা বস্তুটি কী কে জানে! হাত থেকে নিয়ে শুঁকে দেখি, গন্ধটা বেশ মিঠে! ঘন কাথ মতো কী সেদ্ধ করেছে। মেয়েটি হাসিমুখে তাকিয়ে রইল। আমি চুমুক দিলুম। বাঃ! বেশ সুন্দর স্বাদ তো। ভাল লাগছে, তা ইশারায় বোঝাতেই ও খুসি হয়ে বলল –'চিকা!'

হ্যাঁ, এই খাবারটার নাম তাহলে চিকা। মহানন্দে এবং ক্ষিদের চোটে চিকাটা গিলে ফেললুম। ইশারায় জল চাইলুম। ও বুঝতে পারল। বাঁশের চোঙায় জল আনল এক দৌড়ে। খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ওদের মাংস-কাটা দেখতে থাকলুম। একটু পরে মোড়ল আমার কাছে এল! এসে রাইফেল আর বুলেটের মালাটা তেমনি ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। যেন এতক্ষণ উত্তেজনায় আনন্দে ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। ওর দু'চোখে সন্দেহ টের পাচ্ছিলুম। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।

সে তো ঠিকই। এই অরণ্যবাসী সরল মানুষগুলোকে তো চিরদিন সভ্য মানুষেরা ঠকিয়ে আসছে। সভ্যদের অত্যাচারেই তো ওরা কোণঠাসা হয়ে গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছে দিনে-দিনে। ওদের অপরাধ ওরা সোনা হীরে মণিমুক্তোর খবর রাখে, কিন্তু মূল্য বোঝে না। দেবতা ওয়াকিনি কিংবা ইয়াগুনচির কোন রহস্য ভেবে তা কুড়িয়ে এনে সসম্মানে লুকিয়ে রাখে ও পাহারা দেয়। আমি আরও জানি, সরল রেড ইণ্ডিয়ানদের বশ করা নাকি খুব সোজা। কিছু উপহার পেলেই ওরা খুসি। আয়না, চিরুনি, কাপড়চোপড়, ছুরি, কাঁচি দিয়ে ওদের জয় করা যায়। ওরা যুগযুগ ধরে দেখেছে ওই আগুন ওগরানো মারাত্মক জিনিসগুলো কী কাজে লাগে। সারা ব্রাজিল—এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার যেখানে যত রেড ইণ্ডিয়ান আছে, সবার হাতে তাই আজকাল রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল এমনকি

টমিগান মেসিনগানও দেখা যায়। অবশ্য, জীভারোরা এখনও সভ্য মানুষের সংস্পর্শে তেমন আসে নি। এড়িয়ে থাকে এরা। কিন্তু রাইফেল বন্দুক পিস্তলের ব্যাপারটা নিশ্চয় দেখেছে এবং জেনেছে। এখন কথা হচ্ছে এই অস্ত্রটা এরা পেল কোথায়? নাকি কোন বিদেশী সভ্য মানুষকে আচমকা আক্রমণ করে এটা বাগিয়ে নিয়েছিল?

প্রশ্নটা বুড়োকে ইশারায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম। অনেক চেষ্টার পর ও বুঝেছে মনে হল। তারপর বলে উঠল, 'চিকিট্‌চিক্‌, চিকিট্‌চিক্‌।'

মাংস ছেড়ে দু'জন আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো যুবক উঠে এল। তাদের হাতে দুটো বর্শা এনে দিল একটি মেয়ে। আর বুড়ো মোড়ল রাইফেলটা একহাতে নিয়ে বুলেটের মালাটা কাঁধে ঝুলিয়ে অস্পষ্ট কী একটা কথা বলতেই আরেকজন ওকে একটা ধনুকের মতো জিনিস এনে দিল। মনে পড়ল ট্রাভেল্লো জীভারোদের এক ধরনের দেশী বন্দুকের কথা বলছিল বটে ইংরিজীতে যাকে বলে 'ব্লো-গান'। এটা ধনুকই বটে। তবে একটা চোঙা থেকে কী কৌশলে মারাত্মক 'নাটেমা' বিষে মাখানো তীর ছোঁড়া যায় প্রচণ্ড বেগে।

আমরা চারজনে চলতে শুরু করলুম। ঘাটে গিয়ে ওরা ঝোপ থেকে দুটো 'ক্যানো' বা ছিপনৌকো বের করে জলে নামাল। আমরা দু'জন করে বসলুম তাতে। বুড়ো আর আমি এক নৌকোয়। ক্যানো উজানে চলল। অনেকটা পথ যাবার পর ওপারে গিয়ে আমরা নামলুম। ক্যানো দুটো ঝোপে ঢুকিয়ে রেখে বুড়ো ইশারায় তার পিছনে যেতে বলল। এত গভীর দুর্গম জঙ্গলের কথা কল্পনা করা যায় না। কী অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে ভিতরটা! লক্ষ বছর ধরে হয়তো আলো পায়নি। সঙ্গী যুবক দু'জন কোমরের খাপ থেকে ভোজালির মতো পাথরের দা বের করে সামনের ডাল লতা-পাতা কেটে পথ সাফ করতে থাকল। পাথরের দা— তা পরে লক্ষ্য করেছিলুম। আশ্চর্য, এরা লোহার ব্যবহার এখনও জানে না। এরা

সেই প্রস্তরযুগের মানুষ হয়ে আছে। বর্শাগুলোও যে পাথরের তাও পরে দেখেছিলুম।

এক জায়গায় এসে আমি শিউরে উঠলুম। সেই রাক্ষুসে একটা গাছ টুকরো কাটা পড়ে রয়েছে মূলসুদ্ধ ওপড়ানো। টাটকা কাটা হয়েছে, আর তার মধ্যে একটা মানুষের রক্তাক্ত দেহ কিসে খুবলে খেয়েছে। খাকি প্যাণ্টশার্ট পরনে রয়েছে। চমকে উঠলুম। এ যে একজন সাদা চামড়ার সভ্য মানুষ!

হাজার বছর ধরে এই মাটি এক ফোঁটাও রোদ্দুর পায় নি। অন্ধকারের মত গাঢ় ছায়া এখানে থকৃথক্ করছে। এই দুঃসাহসী সাদা চামড়ার মানুষটিকে তাই সাবধান হওয়ার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। সাবধান হয়েও তো উপায় নেই কারো। কোথায় পা ফেলছি, দেখতে পেলে তো কথা!

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের দৃষ্টি আরও একটু পরিষ্কার হল। হতভাগ্য লোকটি কেন এখানে এসেছিল? সুদূর সভ্য পৃথিবীতে এখনও ওর আত্মীয়স্বজন কেউ জানে না যে আমাজনের নিষ্ঠুর অরণ্য রাক্ষুসে কেয়াগাছের একটি থাবায় ওকে পিষে আর রক্ত শুষে মেরে ফেলেছে। খুব দুঃখ হতে থাকল। কিন্তু আর কিছু করার নেই। রক্তাক্ত বীভৎস শরীরটা দেখে এবার ভয় লাগল। মোড়লের গায়ে একটু খোঁচা মেরে ইশারায় চলে আসতে বললুম। রাইফেলটা এরা ওর কাছেই কুড়িয়ে পেয়েছে তাহলে।

মোড়ল আর তার দলের লোকেরা আমার ইশারা বুঝল। ওদের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। যে পথে গিয়েছিলুম, সেই পথেই ফিরে এলুম আমরা। নদীর ধারে এসে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলুম। এই সময় মোড়ল একবার বাঁদিকে আরেকবার ডানদিকে নদীর দুই পাড় দেখিয়ে বলল—'চিকিটচিক হী মাম্‌বা, হী মাম্‌বা!' তারপর হাত নাড়ল। অঙ্গভঙ্গী করে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করল। পা টিপে টিপে মাটির দিকে মুণ্ডু ঝুঁকিয়ে ফুট দশেক এগোল। তারপর একলাফে পিছিয়ে এল। এই রকম

অদ্ভুত কাণ্ড বারকতক করল সে। তখন বুঝতে পারলুম, সে কী বলতে চায়।

না, ওইসব এলাকায় কক্ষনো যাবে না। যদি যেতে হয় খুব হুঁশিয়ার! ওদিকে ওই রাক্ষুসে গাছগুলোর রাজত্ব। তাই শিকারের জন্যে যদি বা যাবার দরকার হয়, মাটির গন্ধ শুঁকে এগোবে।……হী মাম্‌বা, হী মাম্‌বা!

আমার অমনি মনে পড়ে গেল, আরে, তাই তো! আজ ভোরে আসিমো ওঝাটা যেখানে রাক্ষুসে গাছের মধ্যে বন্দী হয় এবং একটু আগে সেখানে কয়েকজন হতভাগা ওই শয়তান গাছের খপ্পরে পড়ে প্রাণ খুইয়েছে সেখানে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছিলুম যেন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। গন্ধটা তাহলে ওই গাছের কিংবা যে-মাটিতে ওই গাছ গজায়, সেখানকার।

মোড়ল এবার আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'মুহা চিকিটচিক!' তারপর রাইফেলটা তাক করল জঙ্গলের দিকে। বুঝলুম, ও শিকার করে দিতে বলছে। রাইফেলটা নিয়ে ক্যানো বা ছিপ-নৌকায় উঠলুম। ওরাও উঠল। ভাঁটার দিকে প্রায় আধ মাইল যাবার পর এখানে ক্যানো ভেড়াল ওরা।

দূর থেকে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছিলুম, তার মধ্যে দিয়ে নদীটা এবার হারিয়ে গেছে। প্রচণ্ড জলের শব্দ শোনা গেল। একটু এগিয়ে দেখি নদীটা এখানে প্রপাতের সৃষ্টি করেছে! প্রায় একশো ফুট নিচে পাথরের খাদে জল আছড়ে পড়ছে। পাহাড়গুলো ন্যাড়া। মোড়লের পিছুপিছু একটা টিলায় উঠে দেখি, যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড় ক্রমশঃ উঁচু হয়ে আকাশ ছুঁয়েছে।

তাহলে আমি এখন বিখ্যাত আন্দেস পর্বতমালার কাছে চলে এসেছি। মোড়ল টিলা থেকে সামনের দিকে ইশারা করে বলল, 'চিকিটচিক, চিকিটচিক।' মানে ওখানে অঢেল শিকার।

নিচে একটা দিগন্তজোড়া তৃণভূমি অর্থাৎ কুশকাশ নলখাগড়ার জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল—তার একধারে তিনশো ফুট উঁচু সব অজানা

গাছের গহন অরণ্য শুরু হয়েছে। আমরা নেমে গেলুম। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় আর উঁচু ঘাসের জঙ্গল। হঠাৎ অনেকটা দূরে বাঁদিকে কমপক্ষে কয়েক হাজার ফুট উঁচু ন্যাড়া পাহাড়ের চূড়োয় দেখি, একটা মূর্তি। সভ্য মানুষ বলেই মনে হল। কাঁধে রাইফেল ঝুলছে। চোখে বাইনাকুলার নিয়ে অন্যদিকে কী দেখছে। আমি আনন্দে নেচে উঠলুম।

একটা গুলি ছুঁড়লেই লোকটা আমাকে দেখতে পাবে। তারপর হিরণমামার কাছে পৌঁছতে কোন অসুবিধে হবে না। তাই ভেবে যেই আমি রাইফেল তুলেছি, অমনি মোড়ল বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে। ওর সঙ্গীরা রাইফেলটা কেড়ে নিল। তারপর আমার মুখে নোংরা হাত চাপা দিয়ে চ্যাংদোলা করে তুলে দৌড়তে লাগল। আমি এত অবাক যে বাধা দিতেও ভুলে গেছি।

ক্যানোয় আমাকে তুলে দুজন চেপে ধরে রইল! মোড়ল প্রচণ্ড বেগে ক্যানোর বৈঠা বাইতে শুরু করল। বুঝলুম, আমাকে ছেড়ে দিতে একটুও রাজী নয় জীভারোরা। আমার দুর্ভাগ্য! এদের কেমন করে বোঝাব, আমি কী করতে চেয়েছিলুম! অনেকক্ষণ পরে মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। নদীর জলে মুখটা ধুয়ে ফেললুম। ঠোঁট আর চোয়াল ব্যথা করছিল। লোকগুলোর গায়ে যেন অসুরের শক্তি।

* * *

ওদের আস্তানায় ফিরতে দুপুর হয়ে গেছে। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেলুন এবার। প্রত্যেকটি লোক গম্ভীর হয়ে পাথরের টাঙ্গি বল্লম আর তীর-ধনুক বা ব্লোগানগুলো শান দিচ্ছে ঘরের মধ্যে। ব্যস্ততার ভাব আছে। বুড়িটা মেয়ে আর কাচ্চাবাচ্চাদের এককোণে জড়ো করে আগলে বসে রয়েছে। মুখে উত্তেজনার ছাপ। আর মাচার ওপর একজন অচেনা যুবক জীভারো বসে রয়েছে—তাকে এর আগে দেখিনি এদের মধ্যে। সেই লোকটা আমাকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে দেখছিল। মোড়ল তার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল।

লোকটা এবার মোড়লের দিকে ঘুরে চাপা গলায় কী সব বলতে লাগল।

তখন কিছু বুঝতে পারলুম না, পরে বোঝা গেল। বাইরে উঠোনের বেড়াগুলো যখন ওরা মজবুত করতে লাগল, মোড়ল আমার হাতে রাইফেলটা তুলে দিয়ে জঙ্গল দেখিয়ে বলল, 'আসিমো মুভাচা! রিফালি কাচা।' আর সেই অচেনা লোকটা আমার একটা হাত ধরে বলে উঠল—'মুহা! আসিমো হানটা।' বারকতক সে কথাটা বলতে আমার মনে হল—এই জীভারো স্প্যানিশ ভাষা কিছু জানে। 'হানটা, ট্রাভেলেরাম মুখে শুনেছি। 'হান্ট' ইংরিজিতেও শিকার কিংবা আক্রমণ। স্পেনের ভাষায় হানটা মানেও তাই। তাহলে কি আসিমোরা এদের আক্রমণ করতে আসছে? এই লোকটা সম্ভবত এদেরই আত্মীয়—অন্য এলাকায় থাকে। খবর নিয়ে এসেছে। তাই এরা আক্রমণ রুখতে চাই। আমাকে দলের একজন যোদ্ধা হিসেবে পেতে চায়। লোকটার পোষাকের দিকে এতক্ষণে নজর গেল। একটা পাতলুন পরে আছে সে। তা হলে এর সঙ্গে সভ্য জগতের যোগাযোগ আছে। আবার আশা জেগে উঠল মনে।

জীভারোরা নিজেদের মধ্যে খুব মারামারি করে জানতুম। কিন্তু আসিমোরা এদের ওপর হানা দিতে আসছে সে কি আমার জন্যে? আমি ওদের হাতছাড়া হয়ে এদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি—হয়তো তার প্রতিশোধ নিতে চায়। ঠিক আছে। আসুক ব্যাটারা! উচিত শিক্ষা দিতে পিছপা হব না।

আমি রাইফেলে কার্তুজ পুরে নিলুম। কার্তুজের বেল্টটা গায়ে জড়ালুম। তারপর মোড়লের ইসারায় একটা গাছে উঠে বসলুম। জীভারো পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেড়ার আড়ালে ওৎ পেতে বসে রইল।

সেই লোকটা এতক্ষনে চলে গেল নিজের আস্তানার দিকে। যাক, আবার আসবে নিশ্চয়। তখন ওর সাহায্য নিয়ে মামার খোঁজে বেরোতে হবে।

সন্ধ্যাঅব্দি ওইভাবে সবাই ওৎ পেতে আছি—কিন্তু আসিমোদের দেখা নেই। এর মধ্যে বার দু'তিন আমাকে ওরা খাইয়েছে। মূল-সেদ্ধটা ভাল—খেয়েছি। বাঁদরের মাংস-পোড়া খেতে পারিনি। ক্ষিদে আর নেই। দেখতে দেখতে অন্ধকার নামল। আমাজন অরণ্যের ভয়ঙ্কর আরেকটা রাত এল। চারদিক থমথম করছে। মাঝেমাঝে রাতচরা পাখি ডাকছে। কখনও কোন জন্তু চেঁচিয়ে উঠেছে। হঠাৎ আমার মনে হল, এই গাছটার নিচে অস্পষ্ট কী খসখস শব্দ হচ্ছে। কিছু দেখবার জো নেই। কিন্তু শব্দ যে হচ্ছে, তা ঠিক। কান খাড়া করে এবং চোখ দুটোর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে রইলুম। হ্যাঁ—যেন অনেকগুলো পায়ের চাপা শব্দ হচ্ছে। তাহলে কি ব্যাটারা এসে গেছে এতক্ষণে? বেড়ার মধ্যে উঠোনে আগুন জ্বলছে—এখানে সে আলো পৌঁছয় না।

সেই সময় উঠোনের ওদিকে কার আওয়াজ শোনা গেল—'কুকারো হান্টা!' অমনি মশাল জ্বলে উঠল। তারপর রাতটাকে ফালাফালা করে ফেলল একসঙ্গে অজস্র চিৎকার—সে চীৎকার কী অমানুষিক, কী ভয়ংকর প্রাণ-কাঁপানো, বলে বোঝাতে পারব না। অরণ্য থরথর করে কেঁপে উঠল। অনেক মশাল জ্বলতে লাগল। আর আমার গাছটার নিচে দেখতে পেলুম—হ্যাঁ, ওরা আসিমো ছাড়া কেউ নয় পাল্টা চিৎকার করে দৌড়ে যাচ্ছে বেড়ার দিকে। মশালের আলোয় তাদের একজনকে লুটিয়ে পড়তে দেখলুম। আমি তক্ষুণি রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে বসলুম। না, মানুষ মারা পাপ। আকাশের দিকেই ছুঁড়লুম, যাতে ওরা ভয় পায়। কিন্তু ভয় পাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার গাছ লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। বর্শাটা পায়ের কাছে এসে বিঁধল। তখন আর সহ্য করতে পারলুম না। এরা তো এখন মানুষ নয়—আস্ত একেকটি বুনো জন্তু। আমার রাইফেল থেকে গুলির বৃষ্টি শুরু হল।

সে এক বীভৎস কাণ্ড! ওখানে মেয়ে আর কাচ্চাবাচ্চারা ভয় পেয়ে ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড চেঁচাচ্ছে। রাইফেলের কানফাটা আওয়াজ,

মশালের আলো, যুদ্ধপাগল দু'দস অসভ্য মানুষ দুর্বোধ্য ভাষায় গর্জে উঠেছে। রাইফেল কেঁপে যাচ্ছিল আমার হাতে।

কিন্তু এক মিনিট মাত্র। তারপর তাকিয়ে দেখি চার পাঁচটা লাস পড়ে আছে। আর আসিমোদের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। সবাই কেটে পড়েছে। একলাফে গাছ থেকে নামলুম। দৌড়ে বেড়ার খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লুম। তারপর যা দেখলুম, খুব কষ্ট হল, বুড়ো জীভারো মোড়লের বুকে একটা বল্লম বিঁধে রয়েছে। অগ্নিকুণ্ডটার কাছে সে পড়ে আছে। তাকে ঘিরে তার বউ আর অন্য সব মেয়েরা কান্নাকাটি করছে।

মোড়ল তাহলে মারা গেল! কিন্তু আমার কিছু করার নেই। ক্লান্তিতে আড়ষ্ট আমি। একটা কাঠের গুঁড়ি দেখে নিয়ে বসে পড়লুম। সেই সময় সেই চেনা কিশোরী মেয়েটি বাঁশের চোং ভরতি জল এনে সামনে ধরল। তেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু এই বন্য মেয়েটি কীভাবে টের পেল আমি এখন জল খেতে চাই! ওর হাত থেকে জল নিয়ে মুখের দিকে তাকালুম। অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম, ওর দুটো চোখ ভিজে ছপছপ করছে। গালও ভিজে। নিঃশব্দে কাঁদছে। সম্ভবত মোড়ল ওর বাবা ছিল। জলটা খাবার আগে ওর কাঁধে হাত রেখে ইসারায় বললুম 'কেঁদো না।'

ও যেন বুঝল। আস্তে আস্তে বলল—'মুহা! হে বিদেশী অতিথি বন্ধু, তাই হবে। মুহা! ইনচে মুহা!'

৭. আমিও এক জীভারো

ওই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর আমার সম্মান খুব বেড়ে গেল। কিন্তু আরও মুসকিল হল এই—ওরা আমাকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে চায় না। সেই অচেনা লোকটার সঙ্গেও খুব ভাব হল। ওর নাম 'সোলাঙ্কি'—জীভারো নাম। কিন্তু ওর আরও একটা নাম

আছে, 'লুকাস'। এটা সভ্য মানুষের দেওয়া নাম। 'লুকাস' নামে ডাকলে কিন্তু ও বেশি খুসি হয়। লুকাস কিন্তু ভাঙ্গা স্প্যানিশ ভাষা জানে। মাত্র দশ-বারোটা স্প্যানিশ শব্দ আমার জানা আছে—ট্রাভেল্লোর কাছে শেখা। তাই দিয়েই তিন দিনের মধ্যেই কিচুয়া ভাষা মোটামুটি শিখে নিতে অসুবিধে হল না। লোকটা দু'বেলাই আট মাইল জঙ্গল পেরিয়ে এই আস্তানায় আসে। মোটামুটি চমৎকার আর ভদ্র মানুষ বলব ওকে। ও আমাকে কিচুয়া ভাষা শেখাতে উঠে পড়ে লেগেছে।

লুকাসের কাহিনী পরে শুনেছিলুম। ও একবার দৈবাৎ সভ্য মানুষের পাল্লায় পড়েছিল। সভ্য লোকটি স্পেনদেশের একজন অভিযাত্রী। এখানে এসেছিল হীরের খনির খোঁজে। লুকাসকে সে বন্দী করে রেখেছিল মাস তিনেক। তারপর লুকাস বশ মানে। তাই বলে হীরের খনির খোঁজ ওকে দেবার ছেলে সে নয়। পুরো এক বছর ওর সঙ্গে কাটিয়েও লুকাস এক রাত্রে সুযোগ পেয়ে পালিয়ে আসে। লুকাস আসলে অরণ্যের মানুষ - প্রকৃতির সন্তান। সভ্যতার কৃত্রিম জীবন সে সহ্য করতে পাববে কেন? চলে আসে সে। নিজের গোষ্ঠীর লোকেরা দিনকতক ওকে যাচ্ছেতাই অত্যাচার করত। দলে নিতে চাইত না। তখন লুকাস ওয়াকিনি ইয়াগুনচির নামে প্রতিজ্ঞা করে বলে, তাঁদের হুকুমেই সে ফিরে এসেছে। কারণ তাঁরা ওকে বলেছেন– শত্রুগোষ্ঠী হুয়ামবিজ্ঞা জীভারোদের ওঝা ট্যানিসার মুণ্ডু কেটে মমি বানাও এবং আমাদের পুজো দাও। লুকাস এর পর সত্যি সত্যি এক রাত্রে ওঝা ট্যানিসার মুণ্ডুটি কেটে নিয়ে আসে। তখন সবার বিশ্বাস হয়। হ্যাঁ, বাহাদুর ছেলে বটে। কাজের মতো কাজ একটা করেছে। বাস রে! তারপর সে কী খাতির বেড়ে গেল লুকাসের! এখন ওর অনেক উচ্চাশা। দলের মোড়ল হবে।

দলের মোড়ল হতে গেলে কিন্তু মোড়লের মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। ওর দলের মোড়লের মেয়ে আঙুলের মতো একরত্তি। সে ওর বউ হবে কী! বরং এই দলের মোড়লের মেয়েটা তার বউ হতে

পারে। আসলে সেজন্যেই লুকাস বরাবর এখানে আসে। তা না হলে আসিমোদের হানা দেবার খবর আনবার কী মাথাব্যথা পড়েছিল বলো?

লুকাস কিচুয়া ভাষা মোটামুটি অনেকটা শিখিয়ে দিল। এখন আমি এদের সঙ্গে কাজ চালানো কথা বলতে পারি। আর সত্যি বলতে কী ভুলেই গেলুম যে আমি একজন সভ্য শিক্ষিত ছেলে। আমি ওই লুকাস কিংবা টানাকা কিংবা তেজী ছোকরা হারিচুর মতোই একজন। আমাকে ওরা নাম ধরে ডাকে আজকাল। বলে —'টিটোক-টিটোচু! 'ওক' আর 'চু' শব্দে সম্মান বোঝায়। আমি ওদের সঙ্গে ক্যানোয় চেপে মাছ ধরতে যাই। একবার তো নদী বেয়ে গিয়ে একটা হ্রদেই পড়েছিলুম—সেই হ্রদটা? যার ধার থেকে আসিমোরা আমাকে ধরে এনেছিল। কিন্তু গেলে কী হবে—আমাকে এরা ছাড়লে তো? আমি যেন এদের বন্দী বন্ধু।

মাঝে মাঝে আমরা চলে যাই দুর্গম জঙ্গলে বাঁদর, ইয়াপুতি পাখি, আটিন্টু বেড়াল আর হরিণের মতো জন্তু টিটাক মারতে। এখনও আন্দেস পাহাড়ের দিকে গিয়ে গর্তে আগুন ধরিয়ে খরখোস মারি। দিনগুলো মন্দ কাটে না। রাতে নাচগানের আসর চলে। তখন শুক্লপক্ষ শুরু হয়েছে। অরণ্যের গায়ে জ্যোৎস্না ছড়ায় চাঁদ। আগুন ঘিরে নাচগানের আসর—আমি তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে। কোথায় আমার দেশ? কোথায় জন্মেছিলুম আমি? সব ভাসা-ভাসা লাগে। মনে হয় সে একটা স্বপ্ন। আমি এই অরণ্যেরই এক সন্তান। এরাই আমার বাবা-মা ভাইবোন।

একদিন লুকাস, আমি, হারিচু, টানাকা আর কয়েকজন মিলে আন্দেস পাহাড়ের কাছে খরগোস মারতে গেছি, হঠাৎ উড়োজাহাজের শব্দ শুনতে পেলুম। একটু পরেই পাহাড়ের ওদিক থেকে একটি হেলিকপ্টার উড়ে আসছে দেখা গেল। অমনি লুকাসরা আমাকে জাপটে ধরে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। আমি হাত-পা ছুঁড়ে মিনতি করে বললুম - লুকাস! সেলোক্কি লুকাস! দোহাই তোমাদের,

আমাকে ছেড়ে দাও। ওই উড়ো জাহাজটা কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে হচ্ছে। হয়তো মামা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

লুকাস এখন অন্যমূর্তি। ঘাসের জঙ্গলে ঠেসে আমাকে ধরে রইল। যতক্ষণ না হেলিকপ্টারটা তৃণভূমি থেকে জঙ্গল পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে ফের পাহাড়ের ওধারে চলে গেল, আমাকে ছাড়ল না।

আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম, 'কেন এরকম করো তোমরা? তোমাকে যখন সেই স্প্যানিশটা বন্দী করে রেখেছিল—তোমার কষ্ট হয় নি?'

লুকাস একটু হাসল। বলল—'আরে ছ্যা ছ্যা? তোমাদের সভ্য মানুষেরা আবার মানুষ? বরং আমাদের কাছে রয়েছ—কী আনন্দে দিন কাটছে বলতো? খাও-দাও, ফুর্তি করো'—এই বলে সে গান গেয়ে উঠল—

'উই উই টিমিংকা হী…
বেডোওয়ানে টিমিংকা হী
উই বেডোওয়ানে উই উই উই…

…আহা, ঝর্ণাতলা, সুন্দর ঝর্ণাতলা! সুন্দর ঝর্ণাতলায় স্নান (করব) আহা! (সুখে) স্নান করব।

সেদিন রাগের চোটে স্রেফ পাথর ছুঁড়েই তিনটে খরগোস আমি মেরে দিলুম। রাইফেলের গুলি নাই আর—সব শেষ। লুকাস বলেছে, এখান থেকে অনেক দূরে একটা সভ্য মানুষের আস্তানা আছে। তাদের রিফিলি আছে। সে জঙ্গলের আড়াল থেকে দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছে। এক রাত্রে রিফিলি আর কার্তুজ চুরি করে আনবে।

চুরি কী, তা সরল এই জীভারোরা জানে না—কেবল জানে লুকাস। কারণ সে সভ্য মানুষের সঙ্গে কাটিয়েছে!

জায়গাটা কোথায় জানতে চাইলুম। যদি আমি পালাতে পারি, কাজে লাগবে। লুকাস হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বলল—'চিকিটিচিক কিনডা।' ওরা দূরত্ব বোঝাতে শিকারের দিন বা

চিকিটিচিক কিনডা ব্যবহার করে। তার মানে, একদিন শিকার করতে যতটা পথ যেতে হয়, তার পাঁচগুণ দূরে সেই সভ্য মানুষের আস্তানা। তার মানে, গড়ে আন্দাজ একদিনের শিকারে সাত মাইল পথ, তাহলে জায়গাটা প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে।

বললুম, 'কোন্ দিকে ? আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

লুকাস কিন্তু কিছুটা রাজী হল। বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু দেবতা ওয়াকিনি আর ইয়াগুনচির কাছে এ রিফিলি আনতে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাই। টিটোচু, এক রাতে একটা পাহাড়ের গুহায় আমরা কয়েকজন যাব পূজো দিতে। দেবতা যদি বলেন, তা হলেই তোমাকে নিয়ে যাবো। তবে আগে ওঝা আসুক।'

একটা ব্যাপার এতদিনে লক্ষ্য করলুম, এদের কোন ওঝা নেই কেন ? কথাটা টানাকাকে জিজ্ঞেস করতে তখন জানা গেল। ওদের ওঝার নাম ক্যানাসা। সে এলাকার সব জীভারো গোষ্ঠীর ওঝাদের চেয়ে বড়ো ওঝা হিসেবে নাম কিনেছে। কারণ তার সঙ্গে দেবতাদের কথা হয়। তা, এই ক্যানাসা এখন মাস দুই থেকে পাহাড়ের গুহায় দেবতার অতিথি হয়ে বাস করছে। সে গেছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। সভ্য মানুষেরা প্রায়ই আজকাল হামলা করছে। ওয়াকিনির সম্পত্তি এই আমাজন নদীর দু'ধারের হাজার মাইল ব্যাপী অরণ্য। একে তারা দখল করে ফেলেছে। এর পর জীভারোদের আর টিকে থাকা দায় হবে। তারা অরণ্যের আড়ালে থাকতে চায়। অরণ্য ওদের গায়ের পোষাকের মতো। এর পর জীভারোরা উলঙ্গ হয়ে পড়বে না ? ছি, ছি, অন্য জাতের সামনে তাদের হাজির হওয়া বারণ। ওয়াকিনি লক্ষ বছর আগে জীভারোদের আদি পিতাকে বলেছিলেন, খবরদার, নিজেদের লোক ছাড়া কেউ যেন তোমাদের দেখতে না পায়। তা হলেই অভিশাপ লাগবে। তোমরা নির্বংশ হয়ে যাবে।

আর লুকাসকে তো ওই জন্যেই জীভারোরা প্রথমে ভালো চোখে দেখত না। সে যে নিজেকে বাইরের লোকের কাছে দেখিয়ে এসেছে !

যাই হোক, ওঝা ক্যানাসা আগামী পূর্ণিমার রাতে ফিরে আসবে

পাহাড় থেকে। সে নাকি যুদ্ধের হুকুম নিয়েই আসবে। যেখানে পাও, সভ্য মানুষ বা 'ৎসাপা' দেখলেই লড়াই দাও, মুণ্ডু কাটো।

আমি শিউরে উঠলুম। তার আগেই যদি পালাতে পারতুম!

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মোড়লের মরাটা এরা নষ্ট করে নি। একরকম ফুলের রং মাখিয়ে উঠোনের কোণে একটা মাচায় রেখেছে—খোলা নয়, কাঠের খোঁদলে ভরে ওপরে গাছের পাতা চাপিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধেছে আষ্টেপিষ্টে। বুড়ি রোজ সকাল-সন্ধ্যা সেখানে একবার করে মড়াকান্না কেঁদে আসে। ওই ওদের বিধবার শোক পালন। পূর্ণিমা অব্দি এটা চলবে। তারপর ওঝা ক্যানাসা ফিরলে ওটা পুড়িয়ে ফেলা হবে। এইসব ব্যাপার না করলে মোড়লের আত্মা সাংঘাতিক ভূত হয়ে যাবে যে! আর সেই সময় নতুন মোড়ল ঠিক করা হবে। লুকাস বড় আশায় ঘুরঘুর করছে। তার মোড়ল হবার সাধ।

পূর্ণিমার সন্ধ্যায় খুব ব্যস্ত দেখলুম সবাইকে। লুকাসও এসে গেল। তারপর আগুন জ্বালা হল। ওরা গাইতে লাগল:

ওয়াকিনি ওয়াকিনি পাস্থক
ওয়াকিনি পাস্থক
তিমিয়ানো উই এরমাংকে
উই…উই…উই!

…হে আত্মা! হে মাকড়সার আত্মা। আমি পোষাক পরেছি। তোমার শক্তি আমার মধ্যে জাগছে!

গানটা এক সময় শেষ হতেই বেড়ার ওধারে একটা মূর্তি টলতে টলতে আসছে দেখলুম। সবাই দেখল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আর একটা গান গাইল:

'কুরিসিওন কুরিসিওন
তিমিরানো উই এরমাংকে
উই…উই…উই…'

…হে ছোট্ট সুগন্ধি মাছি! আমি পোষাক পরেছি। আমার মধ্যে ছোট্ট সুগন্ধি মাছি জেগে উঠেছে।

হ্যাঁ, ইনিই তাহলে সেই ওঝা ক্যানাসা। কী ভয়ংকর চেহারা! আমার বুক কেঁপে উঠল। সে উঠোনে এসে একটা হাত তুলল। সবাইকে দেখল কটমটিয়ে। তারপর আমার দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠল, 'কে এই ছোঁড়াটা? এই ছোঁড়াটা কে? এই ৎসাপাকে কোত্থেকে জোটালি তোরা? ওহো, বুঝেছি! ওয়াকিনি ইগুয়ানচি এর কথাই বলছিলেন বটে। রিফিলি ছুঁড়তে ওস্তাদ একটা ৎসাপা তোদের জন্যে আমি পাঠিয়েছি। সেই ৎসাপা—সভ্য ছোঁড়াটা তোদের জাতকুল বাঁচাবে। হে মাকড়সার আত্মা! তোমার কথা রেখেছ। তোমাকে প্রণাম।'

সব্বাই সাঁৎ-সাঁৎ করে মাটিতে গড়াগড়ি দিল, অর্থাৎ প্রণাম করল। তারপর ওঝা চাঁদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'নুহা! অতিথি বন্ধু! আমরা তোমার ওপর খুশি হয়েছি।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমি হাসি চেপে হাত বাড়িয়ে বললুম, 'আসুন, আসুন, হে ওয়াকিনি ইগুয়ানচির অনুগৃহীত ব্যক্তি! আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি!'

ক্যানাসার তাক লেগে গেল নিশ্চয়! আমি ওদের ভাষায় কথা বলছি দেখে সে আরও খুসি হয়ে বলল, 'নুহা! দেবতাদের আপনি প্রিয়পাত্র।' তাঁরা আপনার মত একজন তরুণকে মনোনীত করেছেন আমাদের রক্ষার জন্যে। সেই জন্যেই শয়তান আসিমো ওঝা ডাকা-চোকে তাঁরা গাছের মধ্যে আটকে রক্ত নিংড়ে মেরে ফেলেছেন!'

আশ্চর্য, এতসব খবর রাখে ক্যানাসার! রাক্ষুসে গাছের পাল্লায় মরা সেই আসিমো ওঝার খবরও জানে দেখছি। লোকটি নিশ্চয় বুদ্ধিমান এবং চালাক!

আমার পাশে বসে সে 'অ্যাওয়েউসা' নামক মদ গিলল ঢকঢক

করে। তারপর লুকাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই পুঁচকে বেড়ালটা আবার এখানে কেন রে! যা, যা, মর ব্যাটা চামচিকে···ভাগ!'

লুকাস করুণ মুখে বলল, 'আমি টিটোচুকে নিয়ে রিফিলি আনতে যাব। তবেই তো টিটোচু আমাদের জন্যে লড়াই করবে। আমি ছাড়া পথ কে চেনে?'

ওঝা ক্যামাসা বলল, 'ঠিক আছে। রিফিলি আনলে তবে তোর কপাল ফিরবে। নয় তো তোর মুণ্ডু দিয়েই সানসা (মমি) বানাবো। হুঁসিয়ার!'

লুকাস বলল, 'কিন্তু বিয়ের লগ্ন যে আজ ভোরেই পেরিয়ে যাবে আবার পূর্ণিমা অব্দি অপেক্ষা করতে হবে। তাই···'

ক্যানাসা ভুরু কুঁচকে বলল, 'বিয়ে! কিসের বিয়ে? কার বিয়ে?'

লুকাস বলল, 'আমার। মোড়লমশাই মরার আগে আমাকে জামাই ঠিক করে গেছেন যে! জিগ্যেস করো না টিটোচুকে।'

এই শুনে ওঝা ক্যানাসা এত জোরে হাসল যে ঘরের মধ্যে মাচায় শুয়ে থাকা বাচ্চাগুলোর ঘুম ভেঙে গেল, তারা প্রচণ্ড কান্না জুড়ে দিল।

৮. ম্যাসিওর দালে!

সেই রাতেই আমাদের ক্যানো ভাসল। লুকাস বসল হালে, শক্ত গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান হ্যারিচু বসল দাঁড়ে। আমি 'রিফিলি' বা রাইফেল নিয়ে মাঝখানে বসলুম। এ অস্ত্রটা অকেজো, কারণ গুলি নেই একটাও। তাই দুটো ব্লোগান বা জীভারো ধনুক আর একগাদা তীর নিয়েছি আমরা। তিনটে বল্লম নিয়েছি। আর নিয়েছি খানদুই দা। দরকার হলে জঙ্গল কেটে পথ সাফ করতে হবে।

লুকাসের চোখ জ্বল জ্বল করছে জ্যোৎস্নায়। তার হাবভাব এমন যেন রাতেই ফিরে এসে সে মোড়লের মেয়ে ইন্নাকে বিয়ে করবে।

ওঝা বলেছে, 'ওয়াটুকা ইন্না।' ক্ষুদে শয়তান লুকাস, কাজটা সফল করতে পারলেই তোর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছু মেয়ে ইন্নার বিয়ে দেব। 'আনসিও হতুংকা'! কিন্তু মনে রাখিস ব্যর্থ হলে তোকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলব। হতুংকা বেল্লে! ভিলি!' নদীর ধারের মরা গাছটায় ঝুলিয়ে রাখব, আর প্রত্যেকে একটা করে তীর মারবে তোর গায়ে। সাবধান! তলায় চোন্টাপাতাও জ্বেলে দেব কিন্তু।'...

রেড ইণ্ডিয়ানদের শাস্তি দেওয়ার নমুনা কলকাতায় সিনেমা ঘরে মার্কিন ছবিতে অনেক দেখেছিলুম। গাছে ঝুলিয়ে রাখা ওদের বড় শাস্তি। তা যেমন বীভৎস, তেমনি মারাত্মক। নিচে আগুনও জ্বালিয়ে দেয়। বেচারা অপরাধী জ্যান্ত ছটফট করে মরে।

জীভারোরাও তো তাদেরই একটা আদিম উপজাতি। তাই আমিও খুব ভাবনায় পড়ে গেছি। লুকাস রিফিলির খবর অত বড়াই করে না দিলেই পারত! সাদা চামড়ার 'সভ্য' শয়তানগুলোর ওই মারাত্মক অস্ত্র লুঠ করে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। ও ব্যাটা জংলী কী করতে কী করে বসবে, জানি না। আমাকেই বুদ্ধিসুদ্ধি খাটিয়ে কাজ বাগাতে হবে। হ্যারিচুটা তেজী আর বলবান হলে কী হবে! ও তো জীবনে কখনও ওদের বস্তির এলাকা ছেড়ে খুব একটা দূরে যায় নি! ওর ধারণা, যদ্দূর যাবে, এইসব জঙ্গল, রিও (নদী), হুডিলি (পাহাড়) আর জন্তুজানোয়ার ছাড়া কিছু নেই। শহর কী ও বোঝে না! তবে ওদের ওঝা যখনই আমাকে দেবতাদের দূত ঠাওরেছে, হ্যারিচুর ধারণা হয়েছে আমি মানুষ নয়, দেবতা। সে আর ছুঁতেও সাহস করছে না আমাকে। শুধু ব্যাটা লুকাস কী ভাবছে জানি না।

মনে পড়ল, ইন্না আসবার সময় ফিসফিস করে আমাকে বলেছে, 'মুহা টিটোচু,...প্রিয় অতিথি বন্ধু টিটো, আমাকে একবার ইগুয়ানচির পাখির পিঠে চাপাবে?'

হ্যাঁ, উড়োজাহাজকে ওরা দেবতার পাখি ভাবে। ইন্নার সে সাধ আমি কি মেটাতে পারব? যে হেলিকপ্টারটা আন্দেস পাহাড়ের ধারে ঘাসের মাঠের ওপর দেখেছিলুম, সেটা যদি আমার

খোঁজে সত্যি হিরণমামারা যোগাড় করে থাকেন, তা হলে একটা চান্স আছে। বলে এসেছি, 'ইন্না, তোমাকে আমি দেবতার পাখির পিঠে চাপাব।'

বেচারা ইন্না! জীবনে ও কিছুই দেখতে পায় নি এতবড় পৃথিবীর। এতসব শহর, কলকারখানা, গাড়ি, কত পোষাক আর ভালো ভালো খাবার! আমার বোন ইতির কথা মনে পড়ছিল। ইতি স্কুল ফাইনাল দেবে এবার। ইতি ইন্নার মতই শান্ত, গোবেচারা। মনে মনে বললুম, 'ইন্না, বোনটি আমার, তোমার বিয়ের পর তোমাকে আমি ইগুয়ানচির পাখির পিঠে চাপাব। দুঃখ করো না।'

হঠাৎ এক জায়গায় ক্যানো থেমে গেল।

লুকাস আর হ্যারিচু দু'জনেই খুব উত্তেজিত। লুকাস বলল, 'শুনতে পাচ্ছ না?'

'না তো।' বলে, আমি কান পাতলুম। স্রোতের শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে এল না।

লুকাস বলল, 'ম্যাসিও জীভারোরা ঢাক বাজাচ্ছে।'

বললুম, 'তাতে কী হয়েছে? চলো, আমাদের শিগ্‌গির ফিরতে হবে। দেরী করা ঠিক নয়।'

লুকাস বলল, 'ম্যাসিও, ম্যাসিও! টিটোচু, ওরা সব চেয়ে সাংঘাতিক জীভারো! ওয়াকিনিদেবের আস্ত চেলা ওরা। ম্যাসিও একজন অদৃশ্য দানো। সে জঙ্গল পাহারা দেয়। এক পা এগোলেই আমরা তার নজরে পড়ে যাব!'

এই সব ভূতুড়ে গল্প শুনলে কার না রাগ হয়। কিন্তু আচম্বিতে মনে পড়ে গেল 'ম্যাসিও' শব্দটা আমার খুব চেনা। আরে তাই তো! হিরণমামাদের কাছে যে 'সানসা' বা মমিমুণ্ডু রয়েছে, তা তো ম্যাসিও নামে এক জীভারো ওঝার! আর ওই ম্যাসিও ওঝাই তো গুপ্তধনের খবর রাখত। চার্লস জেভিয়ার ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর ডায়েরিতে ওর কথা লিখেছিলেন।

উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'লুকাস. কোথায় ওরা থাকে ?'

লুকাস চাপা গলায় বলল, 'পূবদিকের পাহাড়ের নিচের জঙ্গলে। এখন ওরা ঢাক বাজিয়ে ওয়াকিনির পুজো দিচ্ছে। ম্যাসিওর আত্মা আনবে কিনা। সে এসে বসবে একটা চুরাও গাছের মগডালে। পাখি হয়ে আসবে। তার ডাক শুনলে তুমি ভিরমি খাবে!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে কোথায় একটা চেরা সূক্ষ্ম আওয়াজ কেঁপে কেঁপে জ্যোৎস্না রাতের নিঃঝুম অরণ্য আর নদীকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিল। ও কিসের ডাক ? হলফ করে বলতে পারি, পাখিরা অমন করে ডাকতে পারে না। কোন জানোয়ারও না। ওই অমানুষিক রক্ত ঠাণ্ডাকরা ডাকের কোন তুলনা হয় না। ট্রেনের হুইসল শুনেছি ঝড়-বৃষ্টির রাতে। তার মতো হলেও এ আওয়াজ কতকটা এই রকম ঃ ই—ই—ই—ই—ই ই···হিঁ···হিঁ···হিঁ···ই!

টেনে টেনে ডাকটা অরণ্যের গভীর থেকে ভেসে আসতে লাগল দীর্ঘ দু'মিনিট ধরে। লুকাস আর হ্যারিচু দু'হাতে কান ঢেকে ক্যানোয় উবুড় হয়ে পড়েছে। অরণ্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। জলের স্রোতও যেন বইছে না। এক মুহূর্ত বিরতির পর ফের ডাকটা উঠল ই-ই—ই ই—ই···

অমনি আমি বলে উঠলুম, 'লুকাস! হ্যারিচু! কেন তোমরা ভয় পাচ্ছ ? ওতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। ভুলে যাচ্ছ কেন আমি দেবতা ইগুয়ানচির দূত ? ওয়াকিনির চেলা ম্যাসিওর ভূত আমাদের ছোঁয় সাধ্য কিসের ?'

দু'জনে মুখ তুলল এবং উঠে বসল।

'হ্যাঁ, আমি পবিত্র মহান দেবাদিদেব শ্রীশ্রীইগুয়াচির চেলা টিটোচু টিটোক। তোমাদের ওঝা আমাকে চিনে ফেলেছে না ? তোমাদের গোষ্ঠীকে আমি সব শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে এসেছি না ?'

হ্যারিচু বিড়বিড় করে বলল, 'ঠিক, ঠিক। ই ই!!'

লুকাস নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিল নদীর মাঝামাঝি। তারপর তীব্রবেগে এগিয়ে চলল ক্যানো। এবার আমি ঢাকের শব্দ শুনতে

পেলুম—চাপা গুম গুম আওয়াজ। নৌকা ফের ঘুরল। আরেকটা ছোট্ট নদীতে পড়লুম। তারপর লুকাস নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ খুলল।··· 'টিটোচু, ম্যাসিওদের আমরা খুব ভয় পাচ্ছিলুম, তার কারণ ওয়াকিনি ওদের দলে তোমার মতো কোন দূত পাঠিয়েছে নির্ঘাৎ। ওদের ঢাকের শব্দে তাই বলছে ওরা। তাই না ভাই হ্যারিচু?'

হ্যারিচু সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ওরা ঢাক বাজিয়ে সবাইকে শোনাচ্ছে, ওয়াকিনির গুহা পাহারা দেয় যে ম্যাসিও দানো, তার একজন 'সভ্য' সঙ্গী জুটেছে। সবাই সাবধান! টিটোচু, ওয়াকিনির গুহা কোথায় আমরা জানি। সেখানে ঢুকলে মানুষ প্রাণ নিয়ে ফেরে না।'

তাহলে কি সেই গুপ্তধনের সন্ধান এই হ্যারিচুরা জানে? আমি শিউরে উঠলুম।···

৯. উয়াহু হানটা!

কিন্তু কোন সভ্য মানুষ জুটেছে ম্যাসিও গোষ্ঠীর জীভারোদের দলে? কে সে? সে যেই হোক, গুপ্তধন যে ওই জীভারোদের কাছে রয়েছে, তা সে নিশ্চয় জানে। তাই হয়তো কোন চালাকি করে ওদের 'মুহা' সেজে বসেছে। সরল লোকগুলো তাকে ওয়াকিনির দূত ভেবে বিশ্বাস করে ফেলেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, তার মতলব আমি কিছুতেই পূর্ণ হতে দেব না। যে কোন উপায়ে হোক ম্যাসিওদের সঙ্গে আমাকে খাতির জমাতেই হবে। তারপর সভ্য লোকটার মতলব তাদের জানিয়ে দিতে হবে।

রাগে আমার শরীর রি-রি করে জ্বলতে লাগল। এমনি করেই চতুর শয়তান সাদা চামড়ার সব লোকেরা ইউরোপ থেকে পাড়ি জমিয়েছে ব্রাজিলে—আমার্জনের অরণ্যে! যুগ-যুগ ধরে তারা প্রকৃতির সন্তান এই সরল আদিবাসীদের হত্যা করেছে, সর্বস্ব লুঠপাট করেছে। এখানেই পেরুতে অতো বড়ো একটা আজটেক সভ্যতা

ধ্বংস করেছে তারা। হতভাগ্য ইনকাদের রক্তে আমাজন নদীর জল লাল হয়ে গেছে। সোনার লোভে ওরা সমস্ত সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। মায়াসভ্যতার যে সব নমুনা হিরণমামার পরিচিত সেই প্রখ্যাত অভিযাত্রী মিচেল হেজেস প্রথম আবিষ্কার করেন তাতেই প্রমাণ হয়, দক্ষিণ আমেরিকার এই আদিবাসীরা এক সময় কত সভ্য ছিল, কত আশ্চর্য বাড়িঘর, যন্ত্রশালা তৈরী করতে জানত তারা।

যুগ-যুগ ধরে সোনার লোভে অত্যাচারী সভ্য মানুষ এদের ক্রমশ গভীর জঙ্গলে ঠেলে দিয়েছে। নিজেদের টিঁকিয়ে রাখবার জন্য কোণ-ঠাসা হয়ে এইসব জীভারো ইনকা ইত্যাদি অজস্র গোষ্ঠীর আদিবাসী লুকিয়ে বাস করছে দারিদ্র্য রোগে ধুঁকছে। দিনে দিনে তারা পশুর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। বোন ইন্না সামান্য মিষ্টি বুনো ফলের আরক খেয়ে জীবনটাকে ধন্য মনে করে। ওর পূর্বপুরুষরা একদা সোনার পেয়ালায় উরুগু ফুলের মধু পান করত, ও জানে না। উরুগু ফুল আজকাল জীভারোরা দেখতে পায় না, সব চলে গেছে সাদা চামড়ার লোকেদের বাগানে! অরণ্যকেও গরীব করে ফেলেছে সভ্য লোকেরা। জন্তু-জানোয়ার মেরে লোপাট করে দিয়েছে। পাখিগুলো ধরে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানায় পুরেছে। সুন্দর সুন্দর ফুলের ঝাড় আর সুগন্ধি গাছ 'বানবেকা', নদীর আশ্চর্য চারপেয়ে উড়ন্ত কাছিম— সব খতম করেছে এরা। ঐ সভ্যরা তাই জীভারোদের দুশমন, প্রকৃতির দুশমন। ওয়াকিনি-ইগুয়ানচি অরণ্য-দেবতারা তাই বলেন, ওদের দেখামাত্র খুন করো। 'উয়াহু হানটা উয়াহু হা-হানটা!' সাবাড় করো ব্যাটাদের। এমনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ যখন আন্দেস পর্বতশ্রেণীর ওপর জ্যোৎস্না ছড়ায়, দুই দেবতা উঠে এসে দাঁড়ান তার চূড়ায়। গভীর দুঃখে তাঁরা কেঁদে কেঁদে বিলাপ করেন। আর তাই শুনে যে-যেখানে জীভারো গোষ্ঠী রয়েছে, দল বেঁধে দাঁড়ায়···প্রার্থনা করে: হে দেবতাদ্বয়! আর কান্না নয়—এবার প্রতিশোধের দিন, টেমুন্না কাতানো ইয়াকিনি এরমাংকে হিউ উই উই উই···' ঢাক বাজে মৃদু গম্ভীর গুম গুম, গুম গুমা···গুম গুম গুম গুম।···

ভাবতে ভাবতে কখন নিজের অজান্তে আমি এক জীভারো হয়ে উঠেছি। আমার রক্তে দোলা লাগল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলুম, 'উয়াহু হানটা, উয়াহু হা-হানটা!' খতম করো বজ্জাত সভ্যগুলোকে···শেষ করে ফেলো!

লুকাস আর হ্যারিচু চমকে উঠেছিল। তারাও একসঙ্গে হিংস্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'উয়াহু হানটা।'

একটু পরে বললুম, লুকাস সেলোস্কি, আর কতদূর?'

লুকাস দুটো আঙুল দেখাল। তার মানে আর দুটো শিকার পথ।

সামনে কি সমুদ্র? অত বিশাল ফাঁকা কেন? লুকাস অস্ফুট গলায় বলল, 'রিও ম্যাঁরাও এসে গেল!'

আমাজন নদী! এসে গেল সেই স্বপ্নের আমাজন! এই নদী গিয়ে যেখানে মিশেছে সেখানে একটা বিশাল হ্রদ। হ্রদের কিনারা দিয়ে আমরা এগিয়ে চললুম। তীব্র স্রোত বইছে হ্রদের এদিকটায়। লুকাস বলল, 'বাঁদিকে, এটা হচ্ছে পাসো স্যাণ্ডো!'

পাসো স্যাণ্ডো! জোয়াকিম বুড়োর খামার বাড়ি আছে না এখানে? কিন্তু নিজের দিকে লক্ষ্য করে অবাক হলুম। আশ্চর্য, আমি এখন অন্য টিটো টিটোচু! হিরণমামাকে সামনে দেখলেও আর ঝাঁপিয়ে পড়ব না বুকে! হয়তো 'সভ্য' লোভী মানুষ ভেবে তীর বা বল্লম ছুঁড়ে মারব! হ্যাঁ, আমি একজন জীভারো এখন। আমারই পূর্বপুরুষ সাত রাজার ধন জিম্মা রেখেছেন কোন পাহাড়ের গুহায়—আমারই দেবতা ওয়াকিনির পবিত্র সম্পদ তা। আমি কি তা সভ্য মানুষদের লুট করতে দিতে পারি? হুঁসিয়ার হিরণমামা! সাবধান মিঃ সিয়েমেল! আর তুমিও হুঁসিয়ার বুড়ো জোয়াকিম! তুমি রেড ইণ্ডিয়ান না? এই অরণ্যের সন্তান ছিলে না তুমি? ধিক্ তোমাকে! বিশ্বাসঘাতক হয়ে পথ দেখাতে চাও সভ্য মানুষদের? সবার আগে তোমাকেই তাহলে খতম করা দরকার।

আবেগে চঞ্চল হয়ে বলে উঠলুম, 'লুকাস! হ্যারিচু! আমি ভাই আর ফিরব না সভ্যদের জগতে। তোমাদের সঙ্গে চিরজীবন থেকে

যাবো। আন্দেস পাহাড়ে পরীদের নাচ দেখব। তাদের হাতে থাকবে উরুগু ফুল। হারানো সেই ফুলের গন্ধে মৌ-মৌ করবে জ্যোৎস্না রাতের বন। হেকুটা ফলের রস খেয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে 'নেমার্তিন' (যুদ্ধ-নাচ) নাচব হাত ধরাধরি করে। কী আছে ভাই সভ্য জগতে ! ছ্যা-ছ্যা ! শুধু বই মুখস্থ, পরীক্ষায় পাস · এই কি জীবন ?'

লুকাস হাসল, 'তোমার ভাব-ভঙ্গী দেখে আমরা তা আঁচ করেছিলুম ভাই টিটোচু ! তা না হলে গুলি-ভরা রিফিলি তোমার হাতে মোড়ল কতবার তুলে দিয়েছে, ইচ্ছে করলে তুমি সবাইকে মেরে পালিয়ে আসতে পারতে। পালাও নি ! আমরা জানি, তুমি পালাবার জন্যে আসো নি !' ·

হ্যারিচু বলল, 'দেবতা ইগুয়ানচি তোমায় পাঠিয়েছেন যে ! তুমি পালাবে কেন ?'

বললুম, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। উয়াহু হা-হানটা !'

কতক্ষণ পরে আমাজনকে ডানদিকে রেখে আমরা আরেকটা ছোট নদীতে ঢুকলুম। এর নাম লুকাস জানাল, 'রিও সান্টিয়াগো'। তারপর কিছুটা এগিয়ে ডাইনে পাহাড়. বাঁয়ে জঙ্গল পড়ল। এবার নৌকোটা ঝোপের দিকে এগোল। আমি দা দিয়ে ঝোপ কেটে চলেছি. আর সুড়ঙ্গের মতো খাল-পথে নৌকো চলেছে। সে যে কি গভীর অন্ধকার কল্পনা করা যায় না ! কতদূর যাবার পর ফাঁকা জায়গা আর জ্যোৎস্না আবার দেখা গেল। এখানে নৌকো বেঁধে লুকাস লাফ দিয়ে নামল। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি শুধু রাইফেলটা নাও। অঢেল গুলি পেয়ে যাবে একটু পরে। আমরা ধনুক আর বল্লম নিচ্ছি।'

তিনজনে বড়ো-বড়ো গাছের তলা দিয়ে এগিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ালুম। সামনে একটা চব-পড়া নদীর মতো জায়গা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার ওধারে ফাঁকা মাঠ আর পাহাড়। চরের ওপর দিকে একটা কাঠের ঘর—আলো জ্বলছে। আর চড়ের ওপর সার-সার গোটা ছয় তাঁবু। লুকাস চাপা গলায় বলল, 'ওই ঘরে রিফিলি আছে, অনেক গুলিবারুদও রয়েছে।'

তাঁবু দেখেই বুঝলুম, এরা সোনা বা হীরের খনির তল্লাসে এসেছে। আমরা তিনজনে চরের ধারে ঝোপঝাড়ের আড়ালে এগিয়ে চললুম। তাঁবুতে কোন সাড়া নেই। সভ্য লোকগুলো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। অনেকটা ঘুরে চরা পেরিয়ে ওধারে ঘাসের মাঠে ওঠা গেল। ঘাসগুলো মাথা সমান উঁচু। ঠেলে এগোতে হল। খানিক পরে ঘরটার পিছনে গিয়ে পড়লুম।

কোন বারান্দা নেই। পিছন ঘুরে সামনে কাকেও দেখলুম না। কিন্তু কুকুরের গর্জন শুনলুম। সর্বনাশ! কুকুর একটা নয়, অনেক গুলো মনে হচ্ছে। লুকাসের গায়ে চিমটি কাটলুম। লুকাস ফিসফিস করে বলল, 'তিনটে কুকুর আছে, কিন্তু ভেবো না। সে আমি সামলাবো। কুকুরগুলো এলেই আমি দৌড়ে পালাতে থাকবো। ওই মরা হ্রদের উত্তর দিকে চোরাবালি আছে। ওরা আমার পিছন পিছন ওখানে যাবে। তারপর চোরাবালিতে পড়ে ডুবে মরবে। আমি ঠিক ক্যানোয়ের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করব। দাঁড়াও, আমি ব্যাটাদের সামনে যাই।'

লুকাসের বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। যেই সে একটু এগিয়েছে, অমনি তিনটে কুকুর দৌড়ে এল কোত্থেকে। লুকাসও তক্ষুনি অবিশ্বাস্য বেগে পিছনের ঘাসের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুকুরগুলো তাকে তাড়া করে চলে যেতেই ঘর থেকে একজন সাদা চামড়ার লোক বন্দুক নিয়ে দৌড়ে এল। আমরা ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছি। সে টর্চের আলো ফেলতে থাকল। তারপর ঘরের পিছনে গিয়ে কুকুরগুলোকে ফিরে আসবার জন্য ডাক দিল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিচু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচমকা আক্রমণে লোকটা মাটিতে আছাড় খেল। এই কাজে জীভারোদের জুড়ি নেই। আমাকেও ঠিক ওই কৌশলে আসিমোরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। টুঁ শব্দটি করতে পারিনি। বলবান হ্যারিচু ওকে ঠেসে ধরে রইল। আমি এই সুযোগ ছাড়লুম না। ছায়ার আড়ালে দৌড় দিলুম। খোলা দরজা পেয়ে ঢুকে গেলুম ঘরে। পরক্ষণে

দেখি, এক মেমসায়েব বিছানায় শুয়ে কী বই পড়ছে। বই মুখের ওপর থাকায় আমার ঘরে ঢোকা সে টের পায় নি। ডাইনে কোণে কয়েকটা আলনামতো রয়েছে, তাতে অনেকগুলো রাইফেল থাকে-থাকে সাজানো। নিচে অনেকগুলো বাক্স। দেখেই চিনলুম গুলিবারুদ রয়েছে। হিরণমামার দলেও এ রকম বাক্স দেখেছিলুম। কাঠের বাক্স সব।

মেমসায়েব বই পড়তে পড়তেই ইংরিজিতে বলল, 'কী ব্যাপার রিচার্ড?'

আর এক মুহূর্তও দেরী করা ঠিক নয়। একটু কাসতেই বই নামিয়ে রেখে মেমসায়েব তাকাল! তারপর হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসল। বলল, 'কে তুমি?'

হেসে বললুম, 'ম্যাডাম, আমি একজন ইণ্ডিয়ান!' (মিথ্যে নিশ্চয় বললুম না। আমি তো সত্যিকার ইণ্ডিয়ার মানুষ! কলম্বাস ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করে ভেবেছিলেন, এটাই ভারতবর্ষ বা ইণ্ডিয়া। তাই ওখানকার আদিম অধিবাসীদের ইণ্ডিয়ান বলেছিলেন। সেই থেকে আজও ওরা ইণ্ডিয়ান হয়ে রইল।)

মেমসাহেব ডাকল, 'রিচার্ড! রিচার্ড! শিগ্‌গির এসো তো!'

বললুম, 'খবরদার ম্যাডাম! চুপ, যা বলছি শুনুন।'

মেমসায়েবটি তেজী। তার ওপর আমার মতো একজন কমবয়সী ছেলে তার ঘরে ঢুকে শাসাচ্ছে, সে তা বরদাস্ত করবে কেন? চেঁচিয়ে উঠল, 'রিচার্ড! কোথায় তুমি?'

এবার তার বুকে রাইফেলের নল ঠেকাতেই সে হাঁউমাউ করে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। তখন ঘরের কোণায় যে দড়ির বাণ্ডিলটা দেখেছিলুম, তাই দিয়ে আষ্টেপিষ্টে খাটের সঙ্গে ওকে বেঁধে ফেললুম। মেমসায়েব আর টুঁ শব্দটি করল না।

বাইরে হ্যারিচুর শিস শুনলাম। আর দেরী নয়। রাইফেলগুলো বের করে বাইরে রাখলুম। গুলিবারুদের বাক্সগুলোও বয়ে নিয়ে গেলুম একে-একে। তারপর হ্যারিচু এসে গেল ঝোপ ঠেলে।

হসিমুখে বলল, 'ও ব্যাটা ঘুমোচ্ছে।'

অর্থাৎ লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমি বললুম, 'কিন্তু এতসব নেব কীভাবে?'

হ্যারিচু বলল, 'তুমি রিফিলিতে গুলি ভরেছ কি? বোকা, বোকা টিটোচু!'

ঠিক কথা। একটা কাঠের বাক্স রাইফেলের কুঁদো দিয়ে সামান্য ফাঁক করলে গুলি পাওয়া গেল। এবার রাইফেলে ছ'টা গুলি পুরে নিলুম। শার্টের বুক-পকেট আর প্যাণ্টের দু-পকেটেও একগুচ্ছের করে গুলি ভরা হল। ততক্ষণে অস্ত্রশস্ত্র বইতে শুরু করেছে হ্যারিচু। মাঠে ঝোপের মধ্যে রেখে আসছে। আমিও হাত লাগালুম।

এইভাবে তিন-চার দফায় দু'জনে মজা হ্রদের পাড়ে এবং সেখান থেকে জঙ্গলে, তারপর খালের ধারে নৌকোর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হল। ধূর্ত লুকাস ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'কুকুরগুলো তলিয়ে গেছে চোরাবালিতে।'

বললুম, 'ভাগ্যিস তুমি তলিয়ে যাওনি!'

'আমি জানি, কোথায় পা ফেললে বেঁচে যাব!' লুকাস খুশিতে হাসতে লাগল।

আমাজনে পৌঁছানোর পর প্যাসোস্যাণ্ডোর কাছে আমি বললুম, 'লুকাস, তোমরা একটুখানি অপেক্ষা করবে?'

'কেন, কেন?'

'এখানে কোথায় জোয়াকিম বুড়োর খামারবাড়ি আছে, আমি একবার ওর সঙ্গে দেখা করে আসতুম।'

'সে কী! কেন?'

'ওকে বলে আসতুম, মামা যেন আমার জন্যে আর ব্যস্ত না হোন, আমি ভালো আছি।'

লুকাস গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওই ছাখো, চাঁদ ঢলে পড়েছে। ভোর হবার আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে। আর চাঁদ থাকতে থাকতে না পৌঁছলে বিয়ের লগ্ন হাতছাড়া হয়ে যাবে। আবার অপেক্ষা

করতে হবে কতদিন, তা জানো ?'

সেও তো বটে ! মনমরা হয়ে গেলুম। যাকগে, বেচারার বিয়েটা হোক, তারপর আসা যাবে জোয়াকিম বুড়োর খোঁজে। এখন আমি আমাজনের মানুষ—একজন জীভারো। আর কিসের ভয় ? জঙ্গলের আঁতিপাতির খবর জানা হয়েছে। কিচুয়া ভাষাও শিখেছি।

হ্যারিচু সায়েবটার টর্চ কুড়িয়ে আনতে ভোলেনি। সে বোতাম খুঁজে পাচ্ছিল না. ওই ভূতুড়ে আলো জ্বালাবার সাধে সে মরীয়া হয়ে টর্চটা আছাড় মারে আর কী ! আমি তাকে শিখিয়ে দিলুম। কিন্তু যেই টিপেছে, আলোও জ্বলে উঠেছে। সে যেন সাপ ধরে আছে এভাবে টর্চটা ক্যানোর গলুইতে ফেলে দিল। আমি অনেকবার ওকে বুঝিয়ে ভয়টা কাটালুম। তারপর সে বার বার টেপে এবং আলো জ্বলে ওঠে, আর অমনি খিলখিল করে হেসে খুন হয়। লুকাস টর্চ কী তা জানে। সে ধমকাচ্ছিল, 'খবরদার ! কার চোখে পড়ে যাব আমরা !' কিন্তু হ্যারিচু মানা শুনলে তো। যা সে ওয়াকিনির ভূতুড়ে মারাত্মক অস্ত্র ভেবেছিল, তা যে কোন ক্ষতি করছে না দেখে তার এত আনন্দ ! তেমনি অবাকও সে কম হচ্ছে না। সে সুইচে আঙুল রেখে বিড়বিড় করছে, 'কোন আলো নেই, ওয়াকিনিও নেই।' তারপর আঙুলে চাপ দিয়ে আলো জ্বললে হেসে গড়িয়ে পড়ছে এবং বলছে, 'কোত্থেকে আলো এল ? ওয়াকিনি নেই।' আমাদের নৌকো যখন সেই ম্যাসিও জীভারোদের এলাকায় এল, তখন লুকাস হাল ছেড়ে এসে ওর হাতের টর্চটা কেড়ে নিয়ে গেল। নৌকো ঘুরপাক খাচ্ছিল, আবার ঠিক পথে এগোল। তখন হ্যারিচু গম্ভীর মুখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুহা ! ওই চাঁদটার পিছনে তাহলে একজন জীভারো আছে আমার মতো ?'

হেসে বললুম, 'আছে হয়তো। তবে তোমার চেয়ে অনেক বড়ো।'

সেই সময় কানে এল আবার সেই ম্যাসিওদের ঢাকের শব্দ। শোনামাত্র লুকাস ও হ্যারিচু দু'জনেই উত্তেজিত হয়ে জোরে ক্যানো বাইতে শুরু করল। বললুম, 'কী হল ?'

লুকাস রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'টিটোচু ওদেরঢাক বলছে. ওয়াকিনির দূতের চামড়ার রং সাদা। তার ঠোঁটের ওপর আর চিবুকে আজগুবি চুল রয়েছে। তার হাতে ক্ষুদে রিফিলি আছে। আর সে রিও মাঁরাওঁতে (আমাজন নদে) মস্তো বড়ো চলন্ত কাছিমের পিঠে ঘুরে বেড়ায়। সেই কাছিম আবার হুস-হুস করে ধোঁয়া ওগরায়, তার পেটে হু-হু করে আগুন জ্বলে!'

একটা কথা বলতে আগাগোড়া ভুলে গেছি। জীভারো ইণ্ডিয়ানরা সবাই মাকুন্দ, তার মানে ওদের দাড়িগোঁফ গজায় না। কিন্তু লুকাসের মুখে ম্যাসিওদের ঢাকের ওই খবর শুনে আমি লাফিয়ে উঠলুম। এ তো অবিকল ট্র্যাভেল্লোর বর্ণনা! তারই মাছধরা স্টীমার রয়েছে, গোঁফদাড়ি রয়েছে, ক্ষুদে রিফিলি অর্থাৎ রিভলবারও রয়েছে।

নির্ঘাৎ শয়তান ট্র্যাভেল্লো ছাড়া কেউ নয়। আমি তাকে ম্যাসিও ওঝার কথা বলেছিলুম। ও ব্যাটা তখনই হিরণমামাদের অভিযানের আসল রহস্য আঁচ করে নিয়েছিল। এখন কীভাবে ঠিক জায়গায় গিয়ে জুটেছে এবং ওই জীভারোদের সঙ্গে ভাবও করে ফেলেছে। সর্বনাশ! তাহলে ধূর্ত বদমাসটা গুপ্তধন না হাতিয়ে ছাড়বে না।

আমি গুলিভরা রাইফেলটা শক্ত করে ধরলুম। আমার জামা ও প্যান্টের মোট তিনটে পকেটেও গুলি ভরতি রয়েছে। চেঁচিয়ে উঠলুম, 'লুকাস! নৌকো ভেড়াও।'

লুকাস কিছু বোঝবার আগেই ওর কাছে গিয়ে টর্চটা নিলুম। তারপর এক ধাক্কায় হাল ঘুরিয়ে দিতেই নৌকো পাড়ের ঝোপে ঢুকে গেল। আমিও লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্যে নেমে পড়লুম। লুকাসরা কী ভাবল কে জানে, আচমকা ভয় পেয়ে দ্বিগুণ বেগে ক্যানো বেয়ে পালাল। ওদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললুম, 'আমি আবার ফিরে যাব লুকাস, ওঝাকে বোলো।'

১০. শয়তান ট্র্যাভেল্লোর কীর্তি

গুম্…গুম্…গুম্ গুমা ! গুমা গুমা…গুম্ গুমা ! কান পেতে ঢাকের শব্দ শুনছিলুম। কিছুক্ষণ শোনার পর বুঝতে পারলুম লুকাস ঠিকই বলেছে। টেলিগ্রাফে আমরা যেমন 'টরে টক্কা' এই দুটো শব্দকে নানা ধরনে সাজিয়ে খবর পাঠাই, ওদের ঢাকও 'গুম্ গুমা' এই দুটো বোলকে অবিকল সেইভাবে ব্যবহার করে খবর পাঠাচ্ছে। ঢাকের বাজনার সাহায্যে খবর পাঠানো পৃথিবীর সব দেশেই আদিম মানুষের রীতি। জঙ্গলের নানা জায়গায় ওদের সব জ্ঞাতিগোষ্ঠী, আত্মীয়স্বজন রয়েছে। কাছের বস্তি বা পুয়েব্লোতে যেমনি ঢাকের শব্দ পৌঁছয়, সেখানেও অবিকল ওই বোলগুলো ঢাকে বাজিয়ে দেওয়া হয়। তা শুনে আরেকটা পুয়েব্লোর লোকেরা নিজেদের ঢাক বাজিয়ে খবরটা ছড়িয়ে দেয়। এভাবে দশ-পনের মিনিটের মধ্যে কয়েকশো মাইল এলাকা জুড়ে খবরটা পৌঁছে যায়।

ম্যাসিও গোষ্ঠীর জীভারোরা নির্ঘাৎ শয়তান ট্র্যাভেল্লোর খবর ছড়াচ্ছিল আমাজনের অরণ্যে। চাঁদ তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। জ্যোৎস্নার রং ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়ালে আমি এগিয়ে চলেছি ঢাকের বাজনার দিকে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছি, চমকেও উঠছি। সেই ভয়ঙ্কর অমানুষিক চেরা গলার ডাকটা ভেসে আসছে কোত্থেকে—ইঁ ইঁ ইঁ হিঁ হিঁ হিঁ ! সঙ্গে সঙ্গে বাতাস থেমে যাচ্ছে যেন। সারা অরণ্য আতঙ্কে নিঃসাড় হয়ে পড়ছে। ওই আওয়াজটা কিসের ? সে কি কোন প্রাণী—নাকি অপদেবতা ? অমন বীভৎস চিৎকার করছে কেন সে ?

সামনে ফাঁকা ঘাসের মাঠ, তারপর উঁচু হয়ে উঠেছে টিলাগুলো। বড় বড় ক্যাকটাস বা ফণিমনসা গাছের ঝোপঝাড়। টিলার মাথায় উঠে ওপাশে নজর গেল। বিশাল উঁচু গাছের জঙ্গল শুরু হয়েছে ওদিকের ঢালুতে। অন্ধকার পাঁচিলের মতো দেখাচ্ছে। তার পিছনে

পাহাড় রয়েছে। কিন্তু ঢাকের আওয়াজ এবার খুব কাছে মনে হল। আর অন্ধকারের মধ্যে কিছু আগুনের ফুলকি নড়াচড়া করছে দেখলুম।

সাবধানে নেমে গেলুম। বড গাছগুলোর কাছে যেতেই দেখলুম হ্যাঁ, একটা নাচগানের আসর চলেছে। নেমার্তিন (যুদ্ধের নাচ) নাচছে কারা? গাছের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলুম। ওঃ! পথ যেন ফুরোতে চায় না! মনে হচ্ছিল কাছে অথচ এতদূর! পাহাড়ের নিচে একটা ফাঁকা সমতল জায়গায় ম্যাসিও জীভারোদের উৎসব চলেছে।

একদল জীভারো 'নাতেমা' (একরকম জঘন্য বিষাক্ত মদ) খাচ্ছে, তা ওদের হাতে একটা অদ্ভুত ধরনের কাঠের পাত্র দেখেই বুঝলুম। বাঁশের চোঙায় যারা খাচ্ছে, তাদের মদের নাম 'আওয়া-উসা'। এটা একটু মিঠে। কেউ কেউ খাচ্ছে পাতার ঠোঙায়, তার নাম 'আইয়াগুয়াসা'...এও সাংঘাতিক মদ। অনেকে গড়াচ্ছে মাটিতে। পিছনে রয়েছে ওদের বস্তিঘর বা 'হাসিয়েন্দা'। হাসিয়েন্দার মাত্র একটা দরজা থাকে। দরজায় কাঠের গুঁড়ির আসনে যে বসে ঝিমোচ্ছে, তাকে ভালো করে লক্ষ্য করার জন্য যেই একটু মুখ বাড়িয়েছি, অমনি আমার কাঁধে কার হাত পড়ল। চমকে উঠে মুখ ঘোরালুম। ঝোপের মধ্যে বেশ অন্ধকার। কে যেন কানের কাছে ইংরিজিতে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'চুপ, আমি তোমার বন্ধু!'

স্বপ্ন দেখছি না তো? কয়েক মুহূর্ত হাঁদারাম হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। তারপর লোকটাকে আবছা টের পেলুম। হ্যাঁ, ভূতটুত নয়, স্রেফ জলজ্যান্ত মানুষই বটে! সে আমার হাত ধরে টানল। ফিসফিস করে ফের বলল, 'এদিকে এসো!'

পিছু হটে বেশ খানিকটা গিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। আমিও দাঁড়ালুম। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে একটু করে। পাখিরা ঘুম ভেঙে ডাকাডাকি শুরু করেছে। চারপাশের জঙ্গলে আবার একটা দিনের সাড়া পড়ে গেছে। তার সুরে সুর মিলিয়ে জীভারোদের ঢাক বাজতে লাগল—গুম্ গুমা গুমা গুম্...

আলখাল্লার মতো অদ্ভুত পোষাক পরা লোকটা—হাতে বন্দুক আর বুকে টোটার মালা, মাথায় রেড ইণ্ডিয়ানদের ফেট্টি বাঁধা রয়েছে। সে আমার হাত ধরে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেল। একটা বড়ো পাহাড়ের আড়ালে খোলা জায়গায় দু'জনে বসলুম। এবার দেখলুম লোকটা লম্বা হাড়গিলে চেহারার এক বুড়ো। সে মিটিমিটি হাসছিল। অবাক হয়ে বললুম, 'কে আপনি?'

বুড়ো চাপা হেসে বলল, 'সিনোর (ইটালি বা স্পেন অঞ্চলে মশায় বা স্যারকে সিনোর বলে) টিটো, তুমি নিশ্চয় আমার নাম শুনেছ। তোমার মামা কিছুদিন আগে আমার মাননীয় অতিথি ছিলেন। তোমার খবর আমি সব জানি। তোমার মামা···'

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বললুম, 'মামা কোথায়? কেমন আছেন?'

'ব্যস্ত হয়ো না, সব বলছি। জীভারোরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার পর তিনি আর সিনোর সিয়েমেল দু'জনে লোকজন নিয়ে খুব খোঁজাখুঁজি করেন। পান না। তারপর আমার খামারবাড়ি গিয়ে হাজির হন। জঙ্গল কেটে আমি সামান্য চাষবাস করি। কিছু গরু-বাছুরও পুষি। পাসো স্যাণ্ডোতে আমার ফার্ম আর ক্যাটল রেঞ্চ রয়েছে। তা...'

'সিনোর জোয়াকিম! আপনি সেই সিনোর জোয়াকিম না!'

'হুম্। ঠিক ধরেছ বাছা। আমিই জোয়াকিম বুড়ো। বর্শা ছুঁড়ে এখনও পুমা মারতে পারি। নেকড়ে ঠ্যাঙাতে আমার জুড়ি নেই আমাজন তল্লাটে।' জোয়াকিম বুড়ো হাসতে লাগল।

'আমি আপনার খোঁজে বেরোব ভাবছিলুম।'

'তা শোন। তোমার মামা আর সিয়েমেল তো আমার অতিথি হলেন। জীভারোদের সঙ্গে আমার অল্পস্বল্প যোগাযোগ আছে। আমাকে ওরা শত্রু মনে করে না। মাঝে মাঝে জন্তু-জানোয়ার মেরে এদের উপহার দিয়ে আসি কিনা। তাছাড়া বুঝতেই পারছ, আমি একজন রেড ইণ্ডিয়ান। ওদের সঙ্গে আমার রক্তের যোগ রয়েছে। কাজেই আমি ওই এলাকায় খবর নিলুম তোমার। তখন জানলুম,

আসিমোরা তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে। আসিমোরা ভীষণ একগুঁয়ে জাত। একবার এক ব্যাটা আসিমোকে চেপে ধরলুম। তখন বুঝলুম, ওদের ওঝার হুকুম হয়েছিল একজন সাদা চামড়ার সভ্যলোকের মুণ্ডু দিয়ে 'সানসা' বানাতে হবে, তবেই ওয়াকিনি ইগুয়ানচির রাগ পড়বে। কিন্তু তুমি হাত ফসকে পালিয়ে গেছ। ওঝাটাও রাক্ষুসে গাছের কবলে পড়ে মারা পড়েছে। তাই আসিমোটা বলল, ওরাও তোমাকে খুব খোঁজাখুঁজি করছিল। পরে খবর পেয়েছে যে, তুমি ওদের শত্রুগোষ্ঠী 'ট্যাসিনো'দের সুহা (অতিথি বন্ধু) হয়ে আশ্রয় পেয়েছ।'

'হ্যাঁ, সিনোর জোয়াকিম! তারপর ওরা দল বেঁধে একরাত্রে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল।'

'জানি, সব জানি! তারপর শোন, তোমার মামা এ খবর পেয়ে ট্যাসিনোদের কাছে যাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু সেই রাতেই এক কাণ্ড ঘটে গেল। ম্যাসিও ওঝার যে 'সানসা' ওঁর কাছে ছিল, চুরি হল।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ। কিন্তু এই নিয়ে তোমার মামার সঙ্গে সিনোর সিয়েমেলের প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হল। কিছুতেই ওঁদের ঝগড়া মেটাতে পারলুম না। তোমার মামা ভাবছেন, সিয়েমেল চোর -সিয়েমেল ভাবছেন, তোমার মামাই চুরি করেছেন····গুপ্তধন একা মেরে দেবার মতলব' বুড়ো হেসে উঠল।

'তারপর···তারপর?'

'তারপর তোমার মামা রাগ করে একা চলে গেলেন। আমি ওঁকে কুইটো শহর অব্দি পৌঁছে দিয়ে এলুম হাঁটাপথে। ঘোড়ায় চব্বিশ ঘণ্টা লাগল পৌঁছতে। তোমার মামা কুইটোর ভারতীয় দূতাবাসে সব জানিয়ে একটা হেলিকপ্টার যোগাড় করলেন তোমাকে খোঁজার জন্যে। আমি চলে এলুম নিজের ফার্মে।'

'আর সিয়েমেল?'

'হ্যাঁ, চোর যে সিয়েমেল নিজে, আমি টের পেলুম ফিরে আসার পর। দেখি, শয়তান জেলে-ট্র্যাভেল্লোটা ওর কাছে জুটেছে রাতারাতি।

হুম্‌। ট্র্যাভেল্লোর কুবুদ্ধিতে পড়েই সিয়েমেল এই কর্মটি করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমি বাটপাড় খুনে ট্র্যাভেল্লোকে একদম দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। বললুম, এবার ভাগো দিকি সব। আমার গরু-বাছুরগুলো চুরি হল কিনা কে জানে? ওরা চলে গেল তক্ষুনি দলবল নিয়ে। আমি কিন্তু তোমার খবর দিব্যি রাখছিলুম। কিন্তু ট্যাসিনোদের হাসিয়েন্দাটা ঠিক কোথায় তা জানিনে। কারণ ওই এলাকাটা হচ্ছে আন্দেস পাহাড়ের কাছাকাছি। অনেকটা দূর···তার ওপর বারে বারে ফার্ম ফেলে গেলে খুব লোকসান হয়। আমার লোকগুলো বড্ড চোর। তবে জানতুম, সিনোর হিরণ তোমার খোঁজ নিশ্চয় পেয়ে যাবেন শিগগির। তাছাড়া তুমিও তো ওদের মুহা। মুহার কোন ক্ষতি ওরা করে না।'

জোয়াকিম একটু দম নিয়ে ফের বলল, 'ট্র্যাভেল্লোও জানে তোমার খবর। সে তোমাকে আন্দেস পাহাড় থেকে একবার দেখেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ মনে পড়েছে এবার, কাকে পাহাড়ের ওপর দেখেছিলুম।'

'ট্র্যাভেল্লো তখন জানত না যে, ম্যাসিওরা পাসো স্যাণ্টোর কাছাকাছি থাকে। সে ভেবেছিল, ওরা থাকে আন্দেসের ওদিকে, তাই গিয়েছিল। গত রাত্রে আমি হঠাৎ ঢাকের শব্দ শুনলুম। চমকে উঠলুম। ওই সাংকেতিক বুলির মানে আমি জানি। তাই চুপিচুপি ব্যাপারটা দেখতে এখানে আসছিলুম। হঠাৎ ওদিকে টিলার ওপর তোমাকে দেখলুম। পিছু নিলুম তক্ষুনি। আরে! এ নির্ঘাৎ সিনোর হিরণের ভাগ্নে ছাড়া কেউ নয়। কিন্তু তার চেয়ে অবাক কাণ্ড, ট্র্যাভেল্লো তো এদের মুহা হয়েছে. হারানো মুণ্ডু ফিরিয়ে দিয়েছে এদের. কিন্তু সিয়েমেল কোথায়?'

বারকতক প্রশ্নটা নিজেকেই করল জোয়াকিমবুড়ো,'কোথায় গেল সিনোর সিয়েমেল? তাকে তো দেখলুম না ট্র্যাভেল্লোর পাশে।'

আমি শিউরে উঠে বললুম, 'তাহলে কি তাকে শয়তান জেলেটা মেরে ফেলেছে?'

জোয়াকিম মাথা দোলাল, 'বলা কঠিন। ঢাকে সেরকম কোন খবর দেয় নি।'

'ওর পক্ষে তাই সম্ভব সিনোর জোয়াকিম!'

বুড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'জীভারোদের গুপ্ত-ধনের লোভে এমনি করে যুগ-যুগ ধরে কত মানুষ যে জান্ খোয়াচ্ছে ইয়ত্তা নেই। আমার বয়স এই জঙ্গলের সবচেয়ে বুড়ো ম্যানিওক গাছটার চেয়ে বেশি। আমি কি কম মানুষ মারা দেখলুম? ম্যাসিওদের ধনে অভিশাপ আছে। বাছা টিটো, এখন আর এখানে বসে থেকে লাভ নেই। দিনের বেলা কিছু ঘটবে না। এখন সারা দিন ওরা ঘুমোবে। চলো, আমার খামারবাড়ি যাওয়া যাক। চান-খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে নাও। তারপর রাত আসুক, তখন দেখা যাবে।'

'সে কতদূরে সিনোর?'

'তা মাইল দশ-বারো হবে।'

'আপনি এলেন কিসে?'

'কেন, ঘোড়ায়? ঘোড়াটা ওই টিলার ধারে গাছে বেঁধে রেখেছি। ওই গাছের ত্রিসীমানায় কোন জীভারো পা দেয় না। কেন জানো? ওই গাছে ওরা মোড়লের মড়া ঝুলিয়ে রাখে। তাই মোড়লের ভূত ওখানে ওৎ পেতে বসে রয়েছে। আর পূর্ণিমার রাত এলেই সেই ভূতটা মারাত্মক চেঁচায়।'

'আমি শুনেছি।'

'হ্যাঁ, একটু আগে তো ভূতটা ডাকছিল।'

'ভূত! সত্যিকার ভূত?'

জোয়াকিম আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'হ্যাঁ, ভূত ছাড়া আবার কী? সে রহস্য পরে বলব'খন। ওঠ, দিনের আলো ফুটেছে। ওদের চোখে আমি পড়ে গেলে কোন ভয় নেই, কিন্তু তোমাকে দেখলে…'

'আমার হাতে গুলিভরা রাইফেল থাকতে ওদের ভয় পাইনে, সিনোর।'

'সে তো দেখছি! বাহাদুর ছেলে! চলো, কেটে পড়া যাক্। মিছিমিছি মানুষ মেরে কেন পাপ কুড়োব বাছা! যেদিন থেকে আমি খ্রীস্টান হয়েছি একটা মানুষ মারিনি আর।'

হাঁটতে হাঁটতে বললুম, 'তার আগে নিশ্চয়ই খুব মারতেন?'

সিনোর জোয়াকিম দুঃখিত মুখে বলল, 'হ্যাঁ। তবে প্রাণের দায়ে, স্রেফ জান্ বাঁচাতে। তুমি তো জানো না, কীভাবে আমি একা সেই কচি খোকাটি থেকে এত বুড়ো হয়ে গেলুম! আমার বাবা-মাকে সাদা চামড়ার সায়েবরা গুলি করে মেরেছিল। কারণ, হীরের খনির খোঁজ তারা দিতে পারেনি। আমি বাচ্চা ছেলে, একা নদীর চড়ায় হামাগুড়ি দিয়ে তখন খেলা করছি। একটা কুমীর ওৎ পেতে ছিল··· এগোচ্ছে। আমি জঙ্গলে গুলির শব্দ শুনে কিছু বুঝতে পারিনি, পারার কথাও নয়। যাই হোক, সেখানেই সেদিন এক ইটালীয়ান শিকারী শিকার করতে এসেছিল! সেও সাদা চামড়ার মানুষ। কুমীরটা যখন মাত্র হাত তিনেক দূরে, সে দেখতে পেয়ে সেটাকে মেরে ফেলল। আমাকে নিয়ে গেল। তার সঙ্গে ইটালী চলে গেলুম। কিছুদিন থাকার পর ফিরে এল সে আবার সেই আমাজনে। যে খামারটার এখন আমি মালিক, ওটা তারই! তাকে আমি বাবা বলতুম। আমার বয়স যখন মোটে চৌদ্দ, সে পুমার আক্রমণে মারা গেল। আমি ফের বুনো হয়ে উঠলুম। স্বজাতির লোকদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলুম। খুনখারাপিও করতে হল কতবার নানা জায়গায়। কিন্তু বাবার তিনটি হুকুম আমি মেনে চলেছি বরাবর। এক : শিকার করতে হলে পুমা বা বাঘ; দুই : খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে হলে ফার্ম চালানো; তিন : মরার পর ভূত না হতে চাইলে খ্রীস্টান হওয়া।'

ফরসা হয়ে এসেছে চারদিক। আমরা ঘোড়াটার কাছে পৌঁছে গেলুম। একটা প্রকাণ্ড গাছে ঘোড়াটা বাঁধা রয়েছে। গাছের মধ্যিখানে কবে বাজ পড়েছিল, তাই কিছু ডাল পুড়ে মরে গেছে! আমি মাথা তুলে খুঁটিয়ে গাছটা দেখছি লক্ষ্য করে জোয়াকিম বলল,

'ভূত এখন থাকে না। এস, আমার পেছনে বসবে। ঘোড়ায় কখনো চেপেছো?'

'না সিনোর।'

'শিখিয়ে দেব'খন। অমন মজা তুমি তোমাদের মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে পাবে না। আরে! পাথুরে মাটি, পাহাড়, ঘাসের বন, ঝোপঝাড় জঙ্গুলে জায়গা—তার ওপর নদীনালা এসব কি ওই কলের গাড়ির পেরোবার সাধ্যি আছে? একটা ঘোড়া তোমাকে যেখানে খুশি, যেপথে ইচ্ছে বয়ে নিয়ে যাবে! বাছা টিটো, আমাজনের বনজঙ্গলে ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়ানোর কী সুখ তুমি জানো না! ওঃ! সে আনন্দের শেষ নেই। পায়ের নিচ থেকে সাঁৎসাঁৎ করে যখন সবকিছু পিছিয়ে যায়, মনে হয়, আমি এই জঙ্গলের সম্রাট! ঠিক এই রকম।'

ততক্ষণে আমরা ঘোড়ায় চেপে বসেছি। জোয়াকিম ঘোড়াটা ছুটিয়ে দিল। ওকে চেপে ধরে রইলুম। রাইফেল দুটো জিনে আটকানো রয়েছে। সত্যি, এই ছুটে যাওয়ার কোন তুলনা হয় না। আমার রক্ত নেচে উঠল।

কত টিলা, ছোটখাটো কম জলের নদী, অরণ্য, তৃণভূমি পেরিয়ে মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা খামারবাড়িতে পৌঁছে গেলুম। একটা উঁচু টিলার গায়ে কাঠের খুঁটি আর সরু ডালপালার বেড়া দিয়ে ঘেরা। একদিকে আরেকটা শক্ত বেড়ার মধ্যে অজস্র গরু রয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে দু'জন আধা বিলিতি আধা রেড ইণ্ডিয়ান পোষাকপরা লোককে পাহারা দিতে দেখলুম। দু'জনের হাতেই বন্দুক। কতকগুলো কুকুরও রয়েছে তাদের কাছে। ওরা জোয়াকিমের মাইনেকরা কাউ-বয় বা রাখাল। আমাদের দেশের মতো বাঁশের বাঁশি বাজানো উদাস রাখাল ছেলেটি নয়, রীতিমতো হিংস্র চেহারা। একজন তো জোয়াকিম বুড়োর বয়সী—গলায় টোটার মালা ঝুলছে।

বেড়ার ভিতর একদিকটায় চাষের ক্ষেত। ভুট্টা গম বজরা চাষবাস হয়। পাম্পিং যন্ত্রও রয়েছে। খাল কেটে নদী থেকে জল

আনা হয়েছে। সেই জল পাম্প চালিয়ে উঁচু ক্ষেতে সেচ দেওয়া হচ্ছে। জনা তিন-চার রেড-ইণ্ডিয়ান সায়েবী পোষাকে সেইসব কাজে ব্যস্ত। আমরা কাঠের ঘরে ঢুকলাম। বারান্দায় একটা তেজী কুকুর গর-গর করছিল, তাকে আগেই সামলেছে একটা লোক। সে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে জোয়াকিম বলল, 'সিনোর হিরণের সেই হারানো ভাগ্নেকে উদ্ধার করে আনলুম, টমাস। বুঝলি, ওকে ভালো করে খাইয়ে দে দিকি। বেচারা আজ তিন সপ্তাহ ধরে শুধু জীভারোদের জংলী খাবার খেয়ে কাটিয়েছে!'

টমাস বুকে ক্রস এঁকে বলল, 'হা যীশুখৃষ্ট! আজও তো সিনোর হিরণের হেলিকপটারটা ওইদিকে উড়ে যেতে দেখলুম। আমরা রুমাল নাড়লুম। নামলেন না।'

জোয়াকিম চোখ নাচিয়ে বলল, 'টমাসটা খুব ভক্তিমান খৃষ্টান। ও ফি রোববার ঘোড়ায় চেপে পঁচিশ মাইল দূরে অ্যান্টিগো গির্জায় প্রার্থনা করতে যায়। ভাবতে পারো? পাদ্রীসায়েব হচ্ছেন একজন ইংলিশম্যান।' তিনি বলেছেন, শিগগির ওর বিয়ে দেবেন। কী টমাস? সিনোর টিটোকে নেমন্তন্ন করবি তো বাবা?'

টমাস একগাল হেসে বলল, 'আমি ধন্য হবো তাহলে, সিনোর জোয়াকিম!'

আমার মন নেচে উঠল। এই নির্জন রহস্যময় আমাজনের অরণ্যে এরা কিভাবে চমৎকার দিনগুলো কাটাচ্ছে! আহা, এই তো জীবন! কোথায় কলকাতার ভিড়, নোংরা সব রাস্তা, কলেজের লেকচার শোনা, পড়া মুখস্থ, অফিসে চাকরি-বাকরি, ঝগড়াঝাটি—আর কোথায় এই বাধাবন্ধনহারা মুক্ত স্বাধীন জীবন। আমি আর দেশে ফিরে যাবো না।

চৌবাচ্চার জলে স্নান করাটা পছন্দ হল না। বললুম, 'আমি বরং নদীতে যাই, সিনোর! ওতে পোষাবে না!'

জোয়াকিম হেসে উঠল, 'আমাজনের হাওয়া লেগেছে! ভালো খাসা! কিন্তু বাছা, এদেশের নদীতে ভয়ঙ্কর সব কুমীর ভর্তি যে।'

বললুম, 'বা রে! আমি তো লুকাসের সঙ্গে নদীতে চান করতুম!'

'কে···লুকাস? বুঝেছি। ওকে এ তল্লাটে সবাই চেনে। ওই হতভাগাটাই তোমাকে খেয়েছে। ঠিক আছে বাবা টমাস! ওকে নিয়ে নদীতেই যাও। কিন্তু সাবধান! ঝটপট চলে আসবে।'

টমাস নদীর ধারে বন্দুক হাতে পাহারা দিল। আমি নদীতে স্নান করলুম। সাঁতার কাটা জমল না। অচেনা নদী। অজগর আর কুমীরের রাজত্ব। এই প্রথম মনে হল, হ্যারিচুদের আমি কত ভালবেসে ফেলেছি। বোন ইন্নার জন্যেও মন টানতে লাগল। সেই সুন্দর গাছপালা ঘেরা হাসিয়েন্দার মাচায় ঘুমনো, ভূত আর পরীর গল্প শোনা রাতগুলো, দিনে হইহল্লা করে নদীতে সাঁতার কাটা, মাছ ধরতে যাওয়া, শিকার করা—সারাক্ষণ মনে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে চলে এলুম। টমাস বলল, 'সিনোর, কেমন মনমরা হয়ে গেছেন? কেন?'

বললুম, 'কিছু না, এমনি।'

ট্যাসিনোদের পুয়েব্লোতে (বস্তী) না ফিরলে আর শান্তি পাব না। জোয়াকিমের ঘরে ফিরে সভ্য মানুষের খাবার আমার বিস্বাদ লাগছিল। আর এই নরম বিছানায় ঘুমোনো! ভ্যাট, ভ্যাট! এসব তো ফুলবাবুদের জন্যে! আমি যে এখন পুরোপুরি একজন জীভারো!

জানালার নীচে বিশাল উপত্যকায় খামার, গরুর বাথান ইত্যাদি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লুম! স্বপ্নে দেখলুম, আমি হ্যারিচুদের সঙ্গে লাল বাঁদর মারতে বেরিয়েছি। ইন্না বলছে, টিটোচু আমাকে সঙ্গে নেবে না? লুকাস তাকে মারতে গেল, খবরদার! মেয়েরা শিকারে গেলে ওয়াকিনির শাপ লাগে! গভীর জঙ্গলে কত সব ফুল ফল পাখি। হঠাৎ দেখি, ট্র্যাভেল্লো ইন্নার দিকে গুলি ছুঁড়ছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'ধরো, শয়তানটাকে ধরো! ইন্না! বোন ইন্না!'

ঘুম ভেঙে গেল। টমাস গায়ে হাত দিয়ে জাগিয়েছে। সে বলল, 'সিনোর টিটো! বেলা পড়ে গেছে। উঠুন, চা খান!'

উঠে বসে দেখি, সূর্য উপত্যকার পশ্চিমে জঙ্গলের নিচে চলে গেছে। প্রায় গোটা দিনটা ঘুমিয়েছি। বললুম, 'সিনোর জোয়াকিম কই, টমাস?'

টমাস চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সে এক কাণ্ড। একটু আগে একজন জংলী জীভারো গরু চুরি করতে এসেছিল। আমাদের কাউ-বয় ল্যাসিংটো তাকে গুলি করেছে তক্ষুনি। লোকটা ঘাসের জঙ্গলে গুটিগুটি আসছিল নাকি! তাই নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে এখনও। মালিক মশায় গেছেন ওখানে।'

ঢকঢক করে চা-টা গিলে বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম, জোয়াকিম কার কাঁধ ধরে নিয়ে আসছে। আলো পড়ে গেছে। তাই লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম না।

ক্রমে ওরা টিলা বেয়ে এই ঘরের দিকে উঠতে লাগল। আন্দাজ তিরিশ হাত দূরে আসার পর আমি চমকে উঠলুম। চিৎকার করে দৌড়ে গেলুম ওদের কাছে, 'হ্যারিচু! হ্যারিচু! তুমি এসেছ?'

জোয়াকিম দাঁড়াল। হ্যারিচুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলুম ফের, 'হ্যারিচু, তোমার গায়ে গুলি লাগেনি তো?'

হ্যারিচু এবার হাসল। জীভারোরা (লুকাসের কথা আলাদা) খুব আনন্দ না হলে একটুও হাসে না। বলল, 'তোমার খোঁজে বেরিয়ে এই দুর্দশা টিটোচু। মরতে মরতে বেঁচে গেছি। কিন্তু আজগুবি চুল মুখে আছে—এই লোকটা, একে আমি···'

ঘোড়ায় চড়ে-থাকা একজন কাউ-বয়ের দিকে সে তেড়ে যেতেই জোয়াকিম সামলাল ওকে। কিচুয়া ভাষায় বলল, 'খুব হয়েছে বাবা ট্যাসিনো বংশ, আর নয়। ভাগ্যিস রিফিলির নলটা একসুতো ওপরে উঠেছিল, তাই মাথাটা ফুটো হয়নি। তার ওপর আমি যদি না এই যন্তরে চোখ লাগিয়ে (বাইনাকুলার) বসে থাকতুম, আর চেঁচিয়ে বাধা না দিতুম, এতক্ষণ তোমার ভিরকুটি বেরিয়ে যেত।'

হ্যারিচু তক্ষুনি কিন্তু মাথা দোলাল 'হ্যাঁ, তা তো ঠিক। টিটোচু, এই বুড়ো মোড়লের সঙ্গে আমাদের কুকারোর (মোড়ল) খুব ভাব

ছিল শুনেছি। কিন্তু ওর এই লোকগুলো সব ভোঁদড়ের বাচ্চা! ওই লালমুখোটা তো ঢুগুার নাতজামাই!'

কাউ-বয় ল্যাসিংটো গেঁাফে তা দিয়ে বলল, 'আরে যা যা ব্যাটা উচ্চিংড়ে! আমার শরীরে ইনকাদের রক্ত বইছে। জীভারোরা ইনকাদের চিরকালের চাকর।' (ইনকারা সভ্য জাত ছিল প্রাচীন যুগে)।

হ্যারিচু লাফিয়ে উঠে বলল, 'তোর মুণ্ডুতে সানসা না বানালে ইগুয়ানচির রাগ হবে। ব্যাটা অলপ্পেয়ে ইনকা!'

জোযাকিম বুড়ো দুদিকে দু-হাত ছড়িয়ে দুপক্ষকে সামলাল।' 'সবুর খোকারা, সবুর! রাগগুলো এখন যে-যার মাথার ভেতরে পুরে রাখো। চলো বাবা হ্যারিচ, গিয়ে গল্পসল্প করা যাক। তোমরা সব চলে যাও তাহলে।' কাউ-বয় আর অন্যান্য কর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে কড়া হুকুম দিল সে।

আমরা বারান্দায় সুন্দর বিলিতী আসনগুলোয় বসলুম। হ্যারিচুও বসল। কিন্তু বারবার লাফিয়ে উঠতে লাগল, যেন গদীতে কী সাংঘাতিক একটা ব্যাপার আছে। তাকে যখন বুঝিয়ে দিলুম, এটা তোমাদের কাঠের আস্ত গুঁড়ির আসন 'কিপ্পুর'র মতনই জিনিস, কোন ভয় নেই; তখন সে আমার কথা বিশ্বাস করে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল বটে, কিন্তু তার চমক কাটল না। তার দু-চোখে ভয়ের ভাব থেকেই গেল। তা দেখে টমাস রেগে ইংরিজিতে বলল, 'জংলীটাকে একটুকরো কাঠ দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। কর্তামশায় যে কী…'

হ্যারিচু জীবনে এই প্রথম—না, দ্বিতীয়বারই বটে—ডেরা ছেড়ে এতদূরে এসেছে। প্রথমবার তো লুকাস আর আমি ছিলুম ওর সঙ্গে, এবার ও একা এতটা পথ পাড়ি দিয়েছে আমার খোঁজে, আর মোটামুটি এই সভ্য ব্যাপার-স্যাপার ওর সইছে না। চারদিকে ঘুরে ঘুরে সব দেখছে। হাত বুলোচ্ছে, কখনও উঠে দাঁড়াচ্ছে। ফের বললুম, 'কোন ভয় নেই হ্যারিচু। এখন তোমার খবর বলো! হঠাৎ এমন করে চলে এলে যে?'

হ্যারিচু বলল, 'ওঝা পাঠালো না এসে উপায় আছে ভাই টিটোচু?'

'কী বলেছে ওঝা?'

'আমাকে তা খুলে বলেনি। কিন্তু খবর খুব সাংঘাতিক জরুরী! পরীর পাহাড়ের ওপারে কী সব ঘটেছে। তাই তোমার যাওয়া দরকার।'

আন্দেস পর্বতমালাকে ওরা বলে পরীর পাহাড়। তার ওপারে কোন জীভারো প্রাণ গেলেও যাবে না। ওটা তাদের নিষিদ্ধ এলাকা। যদি বা কেউ যায়, টের পেলে দলের মোড়ল অমনি ঘ্যাচাং করে তার মুণ্ডুটা কেটে 'সানসা' বানাবে।

কিন্তু কী ঘটেছে ওখানে?' আমি গোলমালে পড়ে গেলুম। একদিকে ট্র্যাভেল্লো, অন্যদিকে ওঝা ক্যানাসার জরুরী ডাক। যদি হ্যারিচুর সঙ্গে চলে যাই, তাহলে এদিকে ট্র্যাভেল্লো গুপ্তধন হাতিয়ে কেটে পড়বে। ভাবতে লাগলুম। তারপর বললুম, 'লুকাসের খবর কী? বিয়ে হল তার?'

হ্যারিচু বলল; 'হ্যাঁ। ব্যাটা এখন খুব অ্যাওয়েউশা খাচ্ছে আর নাচছে। আজ থেকে ও আমাদের গাঁয়ের মোড়লের জামাই—কাজেই আজ থেকেই ক্যানাসা ওঝা ওকে মোড়ল বানিয়ে দিয়েছে। এখন ওই ভিনগাঁয়ের লোকটার হুকুমে আমাদের চলতে হবে। ছ্যা-ছ্যা! ওই পিডরোম্বা (শেয়াল জাতের প্রাণী) আমাদের কপালে ছিল!'

'ইন্না বোনটি খুসি হয়েছে তো?'

'ইন্না খুসি হবে না? লুকাসকে ওর বরাবর পছন্দ ছিল। হ্যাঁ, ইন্না বলেছে, তুমি না গেলে ও ছমরা নাচ নাচবে না।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ! ইন্না বলেছে, ভাই টিটোচু যেন তার জন্য সুপতি পাখির রাঙা পালক নিয়ে আসে। ভাইয়ের হাতে রিফিলি আছে, একটা সুপতি মারতে দেরী হবে না।'

'বেশ, নিয়ে যাব, হ্যারিচু!'

'আর ইন্নার মা বুড়ি বলেছে, ছেলে টিটোচু আরেকবার সুয্যি ওঠার আগে না এলে সে উপোস করে নদীর ধারে বসে না মরা অব্দি কাঁদবে। এই নাও, বুড়ির দিব্যি।' বলে, হ্যারিচু ট্যাঁক থেকে একটা আইনি গাছের দুধের মতো সাদা পাতা দিল আমার হাতে।

পাতাটা কপালে ঠেকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠলুম। আমায় মা ডেকেছে, বোন ডেকেছে। আমি কি বসে থাকতে পারি আর? বললুম, 'সিনোর জোয়াকিম। ট্র্যাভেল্লোকে তুমি সামলাও। আমি চললুম।'

* * *

চাঁদ তখন জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে নদীর জলে। দূর থেকেই কানে এল ঢাকের শব্দ। এ শব্দ অন্য রকম। উৎসবের বাজনা বাজছে হাসিয়েন্দার উঠোনে। ক্যানো থেকে নামতেই মোড়ল-বউ দৌড়ে এসে আমাকে আদর করতে শুরু করে দিল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল। বেড়া পেরিয়ে উঠোনে পৌঁছে দেখলুম, বিয়ের পরব চলেছে।

আমাকে দেখে ওঝা ক্যানাসা উঠে দাঁড়াল। ঢাকের বাদ্যি থেমে গেল। নাচও থামল। বুড়ি আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, 'আমার ছেলে এসে গেছে। টিটোচু এসে গেছে! ওরে বাছারা, তোরা চালিয়ে যা, চালিয়ে যা।' বলে, সে নাচ জুড়ে দিল একাই।

ওঝা তাকে ধমকে বলল, 'চুপ, চুপ। এসো মহান ইগুয়ানচির দূত! খবর বড্ড খারাপ। বসো বলছি।'

আমি ইন্নাকে খুঁজছিলুম। মশালের আলোয় দেখলুম, সে এক পাশে চুপচাপ গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে ফুলের পোষাক, মাথায় অজস্র পালকের মুকুট, হাতে-পায়ে-কানে সাদা শাঁখ আর নানা জাতের মাছের হাড়ের তৈরী গয়না। আর তার গলায় ঝুলছে, বড় বড় কয়েকটা হীরের মালা। এই মালাগুলো মোড়লের কাছে থাকে। কতকাল ধরে আছে কেউ বলতে পারে না। হীরে একসময় এদেশে যেখানে সেখানে পাওয়া যেত। মালাগুলো দেখে

কেমন অজানা ভয়ে বুক কাঁপল। কাছে গিয়ে বললুম, 'ইন্না বোন, আমার ওপর রাগ করেছো নাকি ?'

ইন্না জবাব দিল, 'করেছি। ভীষণ রাগ করেছি। ইচ্ছে হচ্ছে, সভ্য ভাইটার মুণ্ডু কেটে সানসা বানাবো।'

মাথা পেতে দিয়ে বললুম, 'বেশ বানাও।'

ইন্না আমার হাত ধরে নাচ জুড়ে দিল। সেই সময় লুকাস এসে বলল, 'ভাই টিটোচু, আমি মোড়ল হয়েছি। হ্যারিচু বলেনি তোমাকে ?'

'বলেছে।' বলে, পকেট থেকে সুপতি পাখির পালকগুলো ইন্নার চুলে গুঁজে দিলুম···ভুলেই গিয়েছিলুম ওগুলোর কথা। ইন্না আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'হুই, হুই!' সে সবাইকে দেখিয়ে বেড়াল, ভাই টিটোচু তার জন্যে সুপতি পাখির পালক এনেছে।

ওঝা ক্যানাসা ধমক দিয়ে বলল, 'খুব হয়েছে। এবার আমি নুহার সঙ্গে কথা বলব। তোরা ভাগ! নাচগান করগে···ভাগ।

ক্যানাসা আমার হাত ধরে তফাতে নিয়ে গেল। তারপর বলল, 'নুহা! পরীর পাহাড়ের ওপারে কাল ভোর রাতে ঢুণ্ডার আওয়াজ শুনেছি। সে আওয়াজ বড় ভয়ঙ্কর। শুনলে যার-তার কানের পর্দা ফেটে যাবে। তারপর আজ সকালবেলা চুপিচুপি গেলুম ওদিকে। ইগুয়ানচির গুহা অব্দি আমি যেতে পারি, অন্যেরা পারে না, বারণ আছে। তা, আমি তো এই জীভারিয়ার (জীভারো জগতের) সেরা ওঝা—আমি ভড়কাবার পাত্র নই। উঠলুম পাহাড়ে। উঠে দেখি, ইগুয়ানচির পাখি।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ, পবিত্র পাখিটা এসে নেমেছে।'

'তাহলে ঢুণ্ডার আওয়াজ নয় ?'

'সেটা বলা কঠিন। পরীর পাহাড়ে ঢুণ্ডা থাকে সবাই জানে।'

পবিত্র পাখি অর্থাৎ উড়োজাহাজের আওয়াজকেই ও ঢুণ্ডার আওয়াজ বলছে, তা বুঝতে পারলুম। কিন্তু উড়োজাহাজটা দেখার

আগে শুধু গর্জনই শুনেছে, দেখার পর আর শোনেনি। কাজেই নির্ঘাৎ টুণ্ডার গর্জন বলে ভুল করছে। কিন্তু কার উড়োজাহাজ নামল আন্দেস পাহাড়ে?

বললুম, 'ওঝা ক্যানাসা! আমি এক্ষুনি গিয়ে পবিত্র পাখিটার খবর নিতে চাই। তুমি তো জানো আমার কোন বিপদ হবে না তাতে।'

ক্যানাসা মাথা দোলাল, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। তুমি গিয়ে দেখো সুহা। কথা বলে এসো…জেনে এসো। ইগুয়ানচি কোন খবর পাঠিয়েছেন কিনা।'

'যাচ্ছি। সঙ্গে কিন্তু তোমাকেও যেতে হবে। শুধু দেখিয়ে দেবে জায়গাটা।'

ক্যানাসা ভড়কে গেল যেন! বলল, 'আমাকে যেতে হবে?'

'বারে! তুমি ইগুয়ানচির সেবক। তোমার ভয় কিসের?'

রাজী হল সে। বলল, 'যাব, কিন্তু পরীর পাহাড়ের ওপিঠে আমাদের জাতের যাওয়া মানা। লুকাস ছোঁড়াটা মোড়ল হয়েছে। টের পেলে আমার মুণ্ডু কেটে সানসা বানাবে।'

হাসি চেপে বললুম, 'আচ্ছা ওঝা মশাই, রিফিলিগুলো কোথায় রেখেছ?'

ক্যানাসা আমার হাত ধরে হাসিয়েন্দার ভেতরে নিয়ে গেল। মশাল জ্বলছে ভেতরে। কিছু মেয়ে রাতের রান্না করছে। মাচানের নিচে দেখলুম, অস্ত্রশস্ত্র বেশ যত্ন করে রাখা হয়েছে। ওপরে গাছের পাতা আর ডালপালা চাপিয়েছে।

একটু পরে খাওয়াদাওয়া সেরে দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম।

ক্যানোয় চেপে নদীতে তীরবেগে ভেসে চললুম আমরা। প্রায় পাঁচ মাইল যাবার পর সেই চেনা জলপ্রপাতের আগে এক জায়গায় ক্যানো বাঁধা হল। তারপর তৃণভূমি পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলুম। আমার হাতে টর্চ আর রাইফেল রয়েছে। ক্যানাসার এক হাতে বল্লম, অন্য হাতে তীরধনুক।

পাহাড়ে ওঠা শুরু হল এক সময়। পাহাড়গুলো সব ন্যাড়া। গাছ কেন, ঘাসও গজায় নি। জ্যোৎস্নায় চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খাতগুলো ঘন অন্ধকারে ভরা। ভাগ্যিস পাহাড়ে-চড়া ক্লাবের দৌলতে দার্জিলিংয়ে এই ব্যাপারটা রপ্ত করেছিলুম। আমার খুব একটা কষ্ট হল না। কিন্তু ক্যানাসা হাঁফাতে থাকল। পাহাড়ের ঢালু গায়ে বড় বড় পাথরের টুকরো রয়েছে। ওর আড়ালে হিংস্র জন্তু ওৎ পেতে থাকতে পারে। তাই সাবধানে টর্চের আলো ফেলে এগোচ্ছিলুম।

চূড়ায় ওঠা অসাধ্যও বটে কিন্তু তা আর দরকার হল না। মাঝামাঝি একটা ফাটল চূড়াকে দুভাগ করেছে। সেই ফাটল বেয়ে একটু এগিয়ে চোখে পড়ল বহুদূর ছড়ানো একটা উপত্যকা জ্যোৎস্নায় রহস্যময় দেখাচ্ছে। আর ঠিক মাঝখানে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, তার পাড়ে আলো জ্বলছে। ক্যানাসা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'ওই! ওই সেই পাখি।'

কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। তবে ওখানে সভ্যমানুষ যে আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দিনে এলে নিশ্চয়ই প্লেনটাও দেখতে পেতুম। বললুম, 'ওঝা মশাই, আপনি যদি এখানে অপেক্ষা করেন, তাহলে আমি একবার পাখিটার সঙ্গে কথা বলে আসি।'

ক্যানাসা প্রায় আর্তনাদ করে বলল, 'না, না।'

'তাহলে আমার সঙ্গে চলুন।'

'না-না।'

'সব-টাতেই না-না করলে কী হবে?' বিরক্ত হয়ে বললুম।

ক্যানাসা বলল, 'দেখ নুহা, তুমি এক কাজ করো। তোমার রিফিলি থেকে গুলি ছোঁড়ো। তারপর তোমার ওই পবিত্র আলোটা জ্বেলে নাড়াচাড়া করো। দেখ, ঠিক ইগুয়ানচির পাখি সাড়া দেবে।'

বেড়ে বলেছে তো! বুদ্ধি আছে ক্যানাসার! আমি তাই করলুম। ওপারে গিয়ে বড় একটা পাথরের চাতালে দাঁড়িয়ে পর পর পাঁচটা গুলি ছুঁড়লুম আকাশে। উপত্যকা প্রচণ্ড শব্দে মুখর হয়ে উঠল

কিছুক্ষণ। প্রতিধ্বনি হল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর টর্চ জেলে এদিকে-ওদিকে দোলাতে থাকলুম।

অন্তত দু'মিনিট পরে নিচে সেই আলোটার কাছে আমার টর্চের চেয়ে উজ্জ্বল একটা বিজলী বাতি জ্বলে উঠল এবং দুলতে শুরু করল। তারপর পাঁচবার গুলির আওয়াজে ফের নিঃঝুম রাতের ঘুমন্ত পাহাড় জেগে উঠল। ফের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল দূরে। পাহাড় এলাকায় প্রতিধ্বনি শেষ হয় না তক্ষুনি, অনেক সময় ধরে চলতে থাকে। সেটা এক সময় মিলিয়ে গেলে আমি দু'হাতে চোঙা বানিয়ে এবার যত জোরে পারলুম চেঁচিয়ে ডাকলুম, 'হিরণমামা—আ—আ। মামা—আ—আ!' প্রতিধ্বনি অজস্রবার 'মামা' উচ্চারণ করে চলল চারদিকের পাহাড়ে।

হ্যাঁ! আমার অনুমান ভুল হল না। স্পষ্ট বাংলা ভাষায় জবাব এল, 'টি—টো—ও—ও—ও। টি—টো—ও—ও—ও। কোথায় তুমি—ই—ই—ই?'

অমনি ক্যানাসা ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'নুহা! পাখি তোমার নাম ধরে ডাকছে যে!'

১১. টুণ্ডার জাগরণ

আমাদের 'হাসিয়েন্দা' আজ ফুলে ফুলে সাজানো হয়েছে। ট্যাসিনো-গোষ্ঠীর জীভারো-কন্যার সঙ্গে আচুয়াল-গোষ্ঠীর জীভারো-বরের বাসি বিয়ের পরব। সেই পরবে কিনা বরকনেকে আশীর্বাদ করতে দূত পাঠিয়েছেন ইগুয়ানচিদেব। এই দূত এসেছেন বিরাট পক্ষীরাজে চেপে। খবর পেয়ে বর লুকাসের গ্রাম (পুয়েবলো) থেকে ওর আত্মীয়-কুটুম্ব দলে দলে হাজির হয়েছে। ওরে বাবা! একি যা-তা কথা? লুকাস ভিনগাঁয়ের মোড়ল হয়েছে, বিয়ে করেছে মোড়লের মেয়েকে, তার ওপর আশ্চর্য ব্যাপার, তার বিয়েতে স্বয়ং দেবতা পাঠিয়েছেন পক্ষীরাজ!

লুকাস কিন্তু সব বোঝে। সে মুখ টিপে হাসছে। চুপি চুপি বলেছে আমাকে, 'সাদা মানুষদের ওই উড়ুক্কু যন্তরমন্তর আমি ঢের দেখেছি। আমি একবার চাপব ওতে। তোমাকে আইনিগাছের পাতা ছিঁড়ে এনে দিব্যি দেব টিটোচু। তোমার মামাকে বলো কিন্তু।'

হিরণমামা হেলিকপটারটা কুইটো শহরের ভারতীয় দূতাবাস থেকে চেয়ে এনেছেন। তার বদলে একগুচ্ছের টাকা জমা রাখতে হয়েছে সেখানে। তিনি এক সময় সেরা পাইলট হিসেবেও ভারতে নাম করেছিলেন। তাই ওটা পেতে অসুবিধে হয়নি।

জাহাজটা বস্তীর কাছে একটা ফাঁকা জায়গায় রয়েছে। চারদিকে জঙ্গলে পাহারা দিচ্ছে জীভারো যোদ্ধারা। বলা যায় না, হুয়ামবিজা গোষ্ঠীর জীভারোরা কাছাকাছি এলাকায় থাকে। তারা এসে হানা না দেয়। ওদের দেবতা আবার যে সে নয়—বজ্রদেব। বুকে বজ্রের তিলক আঁকা দেখলেই তুমি চিনবে, লোকটা হুয়ামবিজা জীভারো। বড্ড মারকুট্টে খুনে আর ঝগড়াঝাটিতে পটু। কথায় কথায় বর্শা হাঁকড়ায়।

হিরণমামা অস্থির। ট্র্যাভেল্লো এতক্ষণ কী করে বসবে কে জানে? খুব দেরী হয়ে যাচ্ছে যে! অস্থির আমিও। কিন্তু এরা অতিথি বা নুহাদের ছাড়লে তো! হুমরা-নাচ নাচছে ইন্না। শেষ না হলে ছাড়ান নেই। ইন্না এত ভালো নাচতে পারে জানতুম না।

মামা এক সময় ঘড়ি দেখলেন। বারোটা বাজে। মাথার ওপর সূর্য। হুমরা-নাচ শেষ হল। এবার খাওয়া দাওয়ার পালা। মামা, আমি, ওঝা ক্যানাসা, আর লুকাস ও ইন্না আলাদা খেতে বসলুম। ওদের শিকারীরা হরিণ-জাতের একটা জন্তু মেরে এনেছিল। তার পোড়া মাংস, ম্যানিওকের মূল সেদ্ধ, ভুট্টার পিঠে, একরাশ চমৎকার পাকা কলা (জীভারোরা কলার বাগিচা করে) আর তিন রকমের ঝোল, দু-রকমের সরবত—এইসব হল আমাদের খাবার। আজ মাছ খেতে নেই।

খাওয়ার পর মামা পাইপ ধরালেন। এই সময় ইন্না বলল, 'পাখিতে চাপাবে না ভাই টিটোচু?'

হ্যাঁ, এবার লুকাস আর ইন্না পাখির পিঠে চাপবে। সে এক হইচই পড়ে গেল চারদিকে। হেলিকপটারটার ওখানে ভিড় জমে গেল। কিন্তু কেউ ভুলেও কাছে যাবে না। চারপাশে অনেকটা দূরে জঙ্গলের ছায়ায় দাঁড়াল। মুখে মুখে উত্তেজনা থমথম করছে ওদের। ইন্না আর লুকাসের হাত ধরে হেলিকপটারে গিয়ে ঢুকলুম। ইন্না থরথর করে কাঁপছে। লুকাসও খুব ভয় পেয়ে আড়ষ্ট।

হিরণমামা ষ্টার্ট দিল যখন, মাথার ওপর প্রপেলারটা বনবন করে ঘুরতে লাগল এবং গর্জন শুরু হল, অমনি চারপাশের সব জীভারো পড়ি কি মরি করে জঙ্গলে ঢুকে অদৃশ্য হল। কেবল ওরো ক্যানাসা দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল। সে ইয়াগুনচির প্রতিনিধি এই জীভারিয়ার—তার ভয় পেলে ভড়ং চলে যাবে যে।

হেলিকপটার উড়ল। গাছগুলো দুশো-তিনশো ফুট উঁচু চারদিকে। তা ছাড়িয়ে উঠলে সাহসী মেয়ে ইন্না অনবরত হাসতে লাগল। কিন্তু লুকাসকে সামলানো কঠিন, সে লাফিয়ে উঠছে আর বলছে, 'নামিয়ে দাও, মরে যাব। ওরে বাবা! কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

জীভারিয়া অর্থাৎ আমাজনের অরণ্যের আড়াই হাজার মাইল-ব্যাপী এলাকা আমাদের নীচে। অজস্র নদী, হ্রদ, পাহাড়, আর ঘন জঙ্গল—যার মধ্যে আজও অনেক জায়গায় সভ্য মানুষের পা পড়ে নি, নীচে ভেসে উঠল ছবির মতো। হঠাৎ বললুম, 'মামা, এই ফাঁকে জোয়াকিম বুড়োর খামার-বাড়িটা ঘুরে এলে হতো। ট্র্যাভেল্লোর খবর নিতুম বুড়োর কাছে।'

কথাটা মনে ধরল মামার। পাসো ফ্যাণ্ডোর দিকে—পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এসে এক সময় পৌঁছে গেলুম। ঘাসের মাঠ পেরিয়ে বাথান বা ক্যাটল রেঞ্জের কাছে জাহাজ নামল। ঘোড়ায় চেপে ল্যাসিংটো চলে এল কাছে। নেমে বললুম, 'সিনোর জোয়াকিম কোথায়?'

ল্যাসিংটো বলল, 'কর্তামশাই কাল রাত্তির থেকে নেই। কোথায় গেছেন আমরা জানি না।'

টমাসকে দৌড়ে আসতে দেখলুম। সে কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'এই যে সিনোর হিরণ, আর সিনোর টিটো এসে গেছেন। কর্তামশাই বলে গেছেন, সিনোর টিটো এলে যেন ম্যাসিও বস্তীর ওদিকে চলে যান, ওখানে কোথাও উনি থাকবেন।'

হিরণমামাও চিন্তিত মুখে বললেন, 'কিন্তু লুকাস আর ইন্নাকে নিয়ে সমস্যায় পড়া গেল যে। ওরা…'

বললুম, 'ইন্না বোন, টমাসের কাছে থাক। লুকাস চলুক আমাদের সঙ্গে।'

লুকাস বলল, 'কোথায় যাবে তোমরা?'

বললুম, 'ম্যাসিও জীভারোদের গাঁয়ে।'

লুকাসকে খুব সংক্ষেপে সব বুঝিয়ে দিতেই সে ইন্নার দিকে তাকাল। ইন্না জেদ ধরে বলল, 'উঁহু, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো।'

অগত্যা ওদের সঙ্গে নিতে হল। ল্যাসিংটো তখন থেকে একবারও ইন্না ছাড়া আর কারও দিকে তাকায়নি। আড় চোখে দেখলুম, ওর দৃষ্টি ইন্নার গলায় হীরের মালাগুলোর দিকে। সভ্য-জগতে ওগুলোর দাম কমপক্ষে কোটি টাকা তো বটেই। বুঝলুম, আমাজনে যুগযুগ ধরে আদিম এই মানুষগুলো কেন সভ্যদের হাতে মারা পড়ে। হ্যাঁ, ইন্না চলুক আমাদের সঙ্গে।

ফের হেলিকপটারে ওঠা হল। সোজা পুবে পঁয়ত্রিশ মাইল, তারপর পাহাড়ের শুরু। পাহাড়ের এপাশে উপত্যকায় নামল আমাদের উড়োজাহাজ। সেটা ঢেকে রাখা হল ত্রিপল আর ঝোপ-ঝাড় দিয়ে। লুকাস আর ইন্না আমাদের পিছনে চলল। আমি সেই ভুতুড়ে গাছটা চিনতে পারলুম। কারণ জোয়াকিমের ঘোড়াটাকে কাছেই চড়তে দেখলুম।

জঙ্গলের মধ্যে যত এগোচ্ছি, লুকাস আর ইন্না তত উত্তেজিত

হয়ে পড়ছে। ঢাক বাজছে না অবশ্য। কিন্তু ম্যাসিওদের ওরা কী ভয় করে, তা বোঝা যাচ্ছে। এক জায়গায় গিয়ে তো দু'জনেই গাছের মতো দাঁড়িয়ে গেল, কিছুতেই ওদের নড়াতে পারলুম না। প্রকাণ্ড গাছ মাথার ওপর, আষ্টেপৃষ্ঠে ঘন লতার ঝাঁপি, বাঁদরগুলো দাঁত খিঁচোচ্ছে—এই অবস্থায় ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলুম। তখন লুকাস বলল, 'ওয়াকিনির গুপ্তধনের চেয়ে হীরের খনি অনেক ভালো। আমি তোমাদের খনি দেখাব, কিন্তু প্রাণ গেলেও ম্যাসিওদের আড্ডায় যাব না।'

লুকাস হীরের খনির খোঁজ জানে, তা বরাবর অনুমান করেছি। কিন্তু তখন আমার তো অন্য জীবন। হিরণমামা বললেন, 'সে পরে হবে, বাবা লুকাস। এখন আমাদের অন্য কাজ করা দরকার যে। আমাদের বন্ধু সিয়েমেল নিশ্চয় শয়তান জেলেটার হাতে বন্দী হয়েছে। তাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি, গুপ্তধন আনতে নয়।'

ঠিক সেই সময় কার পায়ের শব্দ শোনা গেল ওদিকে। কে দৌড়ে আসছে যেন। চোখের পলকে লুকাস আর ইন্না লতাঝোপের মধ্যে ঢুকল। মামাও আমার হাত ধরে গাছের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর দেখি, জোয়াকিম বুড়ো পায়ে লতা জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলুম, 'সিনোর জোয়াকিম!'

জোয়াকিম উঠে দাঁড়াল। আমাদের দেখতে পেল। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'সিনোর রয়! পালিয়ে চলুন, শিগগির পালান, আর একদণ্ডও নয়।'

মামা বললেন, 'কী হল, কী হল সিনোর জোয়াকিম?'

জোয়াকিম আমাদের দু'জনেরই হাত ধরে দৌড়তে লাগল। বলল, 'সে জেগে উঠেছে। পালান, পালিয়ে চলুন।'

এই সময় ইন্না আর লুকাসকে দেখলুম, দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে আমাদের সঙ্গ ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। ওদের ডাকতে যাচ্ছি, জোয়াকিম বলল, 'চুপ, চুপ! একটি শব্দও নয়। সে জেগে উঠেছে!'

হিরণমামা বললেন, 'কে জেগেছে? কে সে?'

'জোয়াকিম দৌড়ে যেতে যেতে জবাব দিল, ঢুগ্গা।'

ভূতুড়ে গাছটার কাছে এসে জোয়াকিম বুড়ো ঘোড়ায় চেপে চলে গেল। আমরা হেলিকপটারের দিকে এগিয়ে গেলুম। কিন্তু লুকাস, ইন্না কোথায় গেল? তাদের এমনি করে ফেলে যাওয়া চলে না। হিরণমামা বললেন, 'ওসব ঢুগ্গা-টুগ্গা আমি মানিনে। টিটো, জোয়াকিমও দেখছি ওই আজগুবি জিনিসে বিশ্বাস করে। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক ওর পক্ষে। যাই হোক, ও তো আসলে একজন আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান। ওর রক্তে পুরনো কুসংস্কারগুলো আছে।'

সায় দিয়ে বললুম, 'ঠিক বলেছ মামা। ঢুগ্গা কী, আমাদের হাতে-নাতে দেখা উচিত। তাছাড়া লুকাস-ইন্নার খোঁজ করাও দরকার।'

'জোয়াকিম তার খামারবাড়িতে আমাদের জন্য আপক্ষা করবে।' হিরণমামা চোখে একটা বাইনাকুলার রেখে খুঁটিয়ে চারদিকটা দেখতে দেখতে বললেন, 'কিন্তু লুকাসরা কই?'

একঘণ্টা অপেক্ষা করেও তাদের পাত্তা পেলুম না। ভেবেছিলুম, তারা এখানেই আসবে। কারণ তাদের বস্তীতে যেতে হলে কমপক্ষে পশ্চিম-উত্তর দিকে সত্তর মাইল জঙ্গল আর নদী পেরোতে হবে। ক্যানো কোথায় পাবে ওরা? সবচেয়ে বিপদ অন্য গোষ্ঠীর লোকেদের পাল্লায় পড়ে ওরা খুন হয়ে যাবে নির্ঘাৎ। হুয়ামবিজা গোত্রের জীভারোরা ট্যাসিনো কিংবা আচুয়ালদের যাকে পাবে তার মুণ্ডু কেটে সানসা বানাবে। বিশেষ করে বোন ইন্নার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল। তার গলায় অতো হীরের মালা রয়েছে! সভ্য লোকেদের সামনে পড়লেও তো ওর রক্ষে নেই।

হিরণমামা বললেন, 'ওরা চুলোয় যাক, টিটো। আয়, আমরা বরং এক-চক্কর ম্যাসিওদের বস্তীর ওপর ঘুরে দেখে আসি কী ব্যাপার? আর তুই এই দূরবীনটা চোখে রাখ। লুকাসদের দেখতে পেলে বলবি।'

আমাদের হেলিকপটার উড়ল। খানিকটা নীচু দিয়ে আমরা

ম্যাসিও বস্তীর ওপর গেল্‌ম। কিন্তু কী আশ্চর্য! হাসিয়েন্দা নির্জন খাঁ-খাঁ করছে। জীভারোরা কোথাও বেশিদিন বাস করে না। বস্তী বদলায়। নতুন ঘর বানায় অন্য জায়গায়। আসলে শিকারের অভাব হলে তারা পুরনো বস্তী ছেড়ে চলে যায়। যেখানে জঙ্গলে অঢেল শিকার আর জলে প্রচুর মাছ মেলে, সেখানে আস্তানা পাতে। ইন্নাদের বস্তীটার বয়স মোটে দুই পূর্ণিমা—তার মানে এক মাস। এখনও শিকার পাচ্ছে বলে ওরা ওখানে আছে। যেদিন ফুরোবে, চলে যাবে অন্যখানে।

আমরা অনেকবার চক্কর দিয়েও ম্যাসিও বস্তীতে একটি প্রাণীও দেখলুম না। তাহলে কি ঢুণ্ডার ভয়ে রাতারাতি ওরা পালাল? আর ট্র্যাভেল্লো গেলো কোথায়? বস্তীর পিছনে পাহাড় এলাকায় গেলুম। কোথাও কোন লোক নেই। জোয়াকিম বলছিল, ঢুণ্ডা জেগেছে। তার কোন চিহ্ন তো দেখছি না। বিশাল পাহাড়, খাদ, জলপ্রপাত আর উঁচু গাছের ঘন জঙ্গল সব খানে। পাহাড়ের শেষ নেই। পুবে যদ্দূর যাচ্ছি, পাহাড় ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। যে কোন চূড়ার সঙ্গে ধাক্কা লেগে হেলিকপটার গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে। তাই আর এগোনো গেল না।

আমরা পুব-দক্ষিণ ও পশ্চিম ঘুরে আবার ম্যাসিও বস্তীর ওপর এলুম। তারপর হিরণমামা বললেন, 'টিটো! যা আছে কপালে, এখানেই নেমে পড়া যাক। রাইফেলটা রেডি রাখ। আর তোর সিটের তলায় গ্রেনেডের মোড়ক আছে অনেক। ব্যাগ আছে দেখবি। ব্যাগ ভরে পিঠে ঝুলিয়ে নে। দরকার হলে ছুঁড়বি।'

হ্যাণ্ড গ্রেনেড মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটায়। যুদ্ধে এগুলো সৈনিকরা শত্রুর দিকে ছুঁড়ে মারে। গোলার মতো ফেটে যায়। তৈরি হয়ে নিলুম। একটা ঢালু ফাঁকা জায়গায় নামা গেল নিরাপদে। আমরা বেরিয়ে সাবধানে হাসিয়েন্দাটার দিকে চললুম। বেড়া পেরিয়ে উঠোনে গেলুম। বিশাল হাসিয়েন্দা ঘরের ভিতরটা ফাঁকা। শুধু বাঁশের মাচাগুলো রয়েছে। কোন জিনিসপত্র নেই। ম্যাসিওরা

পালিয়েছে। হিরণমামা পরীক্ষা করে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'টিটো, টিটো! মাত্র কিছুক্ষণ আগে এরা পালিয়েছে! কারণ এই ছাখ উনুনে এখনও আগুন রয়েছে।'

কী ঘটল হঠাৎ যে ওরা এমন করে পালাল? আমরা ঘুরে ঘুরে সবকিছু লক্ষ্য করলুম। কোণের দিকে অন্ধকার হয়ে আছে। সেখানে টর্চের আলো ফেলে হিরণমামা বললেন, 'টিটো, দেখে যা!'

গিয়ে দেখি, একটা কাঠের খুঁটিতে ছেঁড়া লতার দড়ি জড়ানো, কাকে যেন বেঁধে রাখা হয়েছিল। আর মাটির মেঝেতে সেখানে ইংরিজিতে কাঠি দিয়ে লেখা হয়েছে: সাসা সিয়েমেল তার লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করছে। জায়গাটায় রক্তের ফোঁটা দেখা যাচ্ছিল। শয়তান ট্র্যাভেল্লো, যদি তোকে একবার সামনে পেতুম!

হিরণমামা পরীক্ষা করে বললেন, 'ছাখ টিটো, রক্তের দাগটা ঘরের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে। তার মানে আহত সিয়েমেলকে ওরা বয়ে নিয়ে গেছে সঙ্গে। না, মরেননি সিয়েমেল। তাহলে আমরা লাসটা এখানে দেখতে পেতুম। চল, এই দাগ ধরে এগিয়ে যাই।'

হ্যাঁ, বাইরে উঠোনেও রক্তের ফোঁটা দেখা গেল। আমরা অনুসরণ করে চললুম। পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুদূর গিয়ে রক্তের দাগ দক্ষিণের জঙ্গলে ঢুকেছে। সতর্কভাবে এগিয়ে চলেছি আমরা। ঘন উঁচু গাছপালা, ভিতরে লতা আর ঝোপ, এগোনো কঠিন। টর্চের আলো না জ্বেলে এক পা যাওয়া যায় না। রক্তের দাগ আর অনেক লোকের ঝোপঝাড় ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চিহ্ন রয়েছে। ক্রমশ নিচে নামতে হল। তারপর জলের শব্দ পেলুম। জলপ্রপাত দেখতে পাওয়া গেল। ওখানে একটা নদীর সৃষ্টি হয়েছে। নদীর ধারে ধারে রক্তের দাগটা চলেছে। সমতলে গিয়ে দক্ষিণে এগোতে হল। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এবার। ম্যাসিও বস্তীতে উড়োজাহাজটা রয়েছে। ঝোপঝাড় চাপিয়ে ঢেকে রাখা উচিত ছিল তখনকার মতো। আবার সেখানে ফিরতে হলে তো এই রক্তের দাগ ছাড়া উপায় নেই। বরাবর পথে চিহ্ন দিয়ে আসা উচিত ছিল।

হঠাৎ মামা থমকে দাঁড়ালেন। সামনে টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'টিটো! ওই ভাখ সিয়েমেলকে ওখানে ওরা বেঁধে রেখে গেছে!'

হ্যাঁ, তাই। একটা গাছের গুঁড়িতে মোটাসোটা লতা দিয়ে বেঁধেছে ওঁকে। উপুড় হয়ে পড়ে আছেন সিয়েমেল। কাছে গিয়ে মামা ডাকলেন, 'মিঃ সিয়েমেল! সাসা সিয়েমেল!'

মিঃ সিয়েমেলের সারা শরীর রক্তাক্ত। চিৎ করা হল। বাঁধন খুলে দিলুম তাড়াতাড়ি। অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন। দু'জনে ধরাধরি করে নদীর ধারে নিয়ে গেলুম। মুখে জলের ঝাপটা দেবার পর জ্ঞান হল। কয়েক মিনিট লালচোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অতি কষ্টে বললেন, 'রয়, আমাকে ক্ষমা করো।'

হিরণমামা বললেন, 'ফার্স্ট-এডের বাক্সটা হেলিকপটারে রয়ে গেছে। ইস্, যদি বুদ্ধি করে ওটা সঙ্গে আনতুম। আয় টিটো, এঁকে নিয়ে ওখানে ফিরে যাই।'

• • •

প্রায় চারঘণ্টা লেগে গেল হাসিয়েন্দার কাছে ফিরতে। পরিশ্রম যা হল বলবার নয়। এই প্রকাণ্ড রাশিয়ানটিকে বইতে আমরা হাঁফিয়ে পড়েছি। কতবার বসে বিশ্রাম নিয়েছি, কতবার মনে হয়েছে, এ অসম্ভব। মামা অনুমতি দিলে আমি একাই ওষুধের বাক্সটা নিয়ে আসতুম, কিন্তু আমাকে যেতে দিলে তো!

বেলা পড়ে আসছিল। ভালোমতো সেবাশুশ্রূষা করার পর যখন সিয়েমেল কথা বলতে পারলেন, তখন সূর্য ডুবছে কিনা জানি না, অরণ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। হিরণমামা ওকে ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিলেন। সিয়েমেল একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে আস্তে আস্তে বললেন, 'ট্র্যাভেল্লো আমার সর্বনাশ করেছে। ও ম্যাসিও ওঝার মুণ্ডুটা ওদের ফেরত দিয়ে খাতির জমিয়ে ফেলে। কিন্তু ওর হুকুমে ম্যাসিও জীভারোরা আমাকে প্রচণ্ড মার মেরে বেঁধে রাখে। তারপর একদল জীভারোকে নিয়ে গত রাত্রে ও গুপ্তধনের গুহার দিকে বেরিয়ে

পড়ে। ওরা হারানো পবিত্র মুণ্ডুটা এতকাল পরে ফিরে পেয়ে ট্র্যাভেল্লোকে দেবতার দূত ভেবে বসেছে। তাই দেবতার গুপ্তধন কোথায় আছে দেখাতে নিয়ে যায়। তারপর শেষ রাতে পাহাড়ের ওদিকে এক অমানুষিক গর্জন শুনতে পেলুম। মিঃ রয়, জীবনে বহুবার অ্যাডভেঞ্চারে গেছি। অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এমন গর্জন কখনও শুনিনি। না, কোন জন্তু অমন গর্জন করতে পারে না। সে রক্ত-চমকানো গর্জন শুনলে সাহসীও ভিরমি খাবে। ভাষা দিয়ে তা বোঝানো যায় না। যেন একসঙ্গে পাহাড়গুলো আঁ-আঁ করে কাঁদছে—নাকি হা-হা করে হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘরে যারা ঘুমোচ্ছিল, জেগে গিয়ে তক্ষুনি ছেলেপুলে জিনিসপত্র নিয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। আর, একটু পরেই দৌড়ে ফিরে এলো ট্র্যাভেল্লো আর চার-পাঁচজন জীভারো। তারা এসে কিছু না বলে আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। যেখানে তোমরা আমাকে দেখতে পেয়েছো, সেখানে গিয়ে ওদের কী মতলব হল কে জানে, আমাকে নামিয়ে রেখে ফের আষ্টে-পিষ্টে বাঁধল। তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেল।'

হিরণমামা বললেন, 'ট্র্যাভেল্লো কিছু বলল না?'

সিয়েমেল জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, বলে গেল, আমাকে মেরে ফেলার ইচ্ছে নেই। অত পাপ সে করবে না। কিন্তু বিপদের সময় বোঝা বইতে রাজী নই। আমি এখন বোঝা। তাই জঙ্গলের দেবতা ওয়াকিনির কাছে রেখে গেল।'

রেগেমেগে বললুম, 'হতচ্ছাড়া বদমাস কোথাকার। ওই ট্র্যাভেল্লোটাকে বরাবর আমার সন্দেহ হতো।'

হিরণমামা বললেন, 'গুপ্তধন পায় নি সে?'

সিয়েমেল বললেন, 'না পায় নি। ওদের কারো কাছে কিছু দেখি নি, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া কিছু ছিল না হাতে।'

হিরণমামা বললেন, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, গুহার মধ্যে একটা

কিছু আছে। জোয়াকিম বুড়ো বলছিল, ঢুগ্গা জেগেছে। ঢুগ্গা কী জানিনে, কিন্তু সম্ভবত ঢুগ্গাই পাহারা দিচ্ছে ওয়াকিনির গুপ্তধন।'

সিয়েমেল অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন এতক্ষণে। বললেন, 'আমি সুস্থ হয়ে গেছি, রয়। আমার পাপের সাজা যা পাবার পেয়েছি। এখন যদি আমাকে বিশ্বাস করো তাহলে একটা রাইফেল দাও। তারপর চলো আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ি।'

'কোথায়? রত্নগুহার সন্ধানে?' হিরণমামা ভেবে বললেন।

'হ্যাঁ। ঢুগ্গার গর্জন আমি শুনেছি। ভয় নিশ্চয় পেয়েছি। কিন্তু ঢুগ্গা কী, তা না জেনে আমার আর স্বস্তি হবে না।'

'এতসব পাহাড়ের মধ্যে কোথায় খুঁজব মিঃ সিয়েমেল?'

'ট্র্যাভেল্লোর সঙ্গে জীভারোরা যখন গতরাত্রে আলোচনা করছিল, আমি জায়গাটা কোথায় তা শুনেছি। কোথায় একটা লাল রঙের তে-কোণা পাহাড় আছে, তার মধ্যেই গুহাটা।'

'কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসছে। চাঁদ উঠতে দেরী হবে। কীভাবে চিনবো?'

'নিচে অন্ধকার, কিন্তু আকাশে এখনও বেলা আছে, মিঃ রয়! হেলিকপটারে চেপে পাহাড়টা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না।'

* * *

আমাদের উড়োজাহাজ আবার উড়ল। হেলিকপটারে ওপরে উঠে দেখি, সূর্য সবে অস্ত যাচ্ছে। পাহাড়গুলোর চূড়ায় আলো রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা লাল তে-কোণা পাহাড় সত্যি দেখতে পেলুম। কিন্তু নামার মতো জায়গা নেই কাছাকাছি। খানিকটা দূরে নদীর পাড়ে অনেক সাবধানে নামলুম আমরা। তারপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বিজলীবাতিও নেওয়া হল সঙ্গে। একটা ব্যাগে গ্রেনেডগুলো ভরে পিঠে বেঁধে নিলুম।

এক জায়গায় গিয়ে আলো ফেলতেই থমকে দাঁড়ালুম। দশ-বারোটা জীভারোর দেহ পড়ে রয়েছে। রক্তাক্ত বীভৎস দেহগুলো দলাপাকানো, যেন কোন দানব প্রকাণ্ড চাঁটিতে তাদের থেঁৎলে

কাদার তাল বানিয়ে ফেলেছে। হতভাগারা ট্র্যাভেল্লোর পাল্লায় পড়ে মারা গেছে। কিন্তু কী সেই টুপ্তা, যা ওদের এমনি করে হত্যা করেছে ?

রক্ত-পাহাড়ের চূড়ায় আলো কমে গেল ক্রমশ। আমরা সামনে একটা গুহা দেখলুম। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে হিরণমামা বললেন, 'যাওয়া যাক এবার।'

ভেতরে ঢুকতেই ভ্যাপসা জঘন্য একটা গন্ধ নাকে এল। প্রাগৈতিহাসিক কালের অন্ধকার এই গুহায় জমে রয়েছে। আলো ফেলে আমরা সাবধানে এগোচ্ছি। ক্রমশ চওড়া হচ্ছে পথ। ছাদও উঁচু হচ্ছে। একটু পরে অনেক চওড়া থামওয়ালা একটা উঠোনে পৌঁছলুম। এটা কারা তৈরী করেছিল ? কারা পাহাড় খোদাই করে গুহাটা বানিয়েছিল ? হয়তো ইনকাদেরই পূর্বপুরুষ। তবে যে জেভিয়ারের ডাইরিতে দেখলুম, গাছের নিচে গুপ্তধন পোঁতা আছে।

উঠোনের ওপর দিকে একটা বেদী। বেদীর দুধারে যা দেখলুম শিউরে উঠলুম। অনেকগুলো রক্তাক্ত লাস পড়ে আছে মানুষের ! তারা সবাই জীভারো। কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে সিয়েমেল বললেন, 'মনে হচ্ছে এরা প্রহরী ছিল এখানে। কিন্তু টুপ্তা জেগে উঠে এদেরও রেহাই দেয় নি।'

হিরণমামা বললেন, 'মিঃ সিয়েমেল, ওই বেদীর মধ্যে গুপ্তধন নেই তো ?'

সিয়েমেল কী জবাব দিতে যাচ্ছিলেন. আচম্বিতে গুহার ভিতর একটা খসখস শব্দ শোনা গেল। তারপরই কান ফেটে যাবে মনে হল। যেন হাজার হাজার বছর ধরে ঘুমন্ত কোন প্রাগৈতিহাসিক শক্তি জেগে উঠেছে, আঁ-আঁ-আঁ-হা-হা-হা—হাজার মানুষ এক সঙ্গে হাসছে অথবা কাঁদছে। সে কী ভয়াবহ আওয়াজ !

তারপর আমরা টুপ্তাকে দেখতে পেলুম। হ্যাঁ, আলোর সামনে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে করতে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে একটা মহাকায় দানব যেন। তার মাথাটা ছাদে ঠেকেছে। মুখটা সিংহ

আর গরিলার মাঝামাঝি, সারা গায়ে লোম। তার জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে যেন। দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। সে গর্জাচ্ছে, আঁ-আঁ--হা-হা-হা-হা…

জ্ঞানশূন্য হয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে গেলুম একটার পর একটা। কান ফেটে গেল বিস্ফোরণের শব্দে। ধোঁয়ায় বারুদের গন্ধে গুহা ভরে গেল। সিয়েমেল আর হিরণমামা আমার হাত ধরে দৌড়তে শুরু করলেন। গুহার বাইরে এসেও আমরা শুনতে পেলুম আহত ঢুণ্ডা সমানে গর্জন করে এগিয়ে আসছে।

আমরা অনেকটা নিচে একটা পাথরের আড়ালে তৈরী হয়ে বসলুম। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। গুহার দরজায় এবার ঢুণ্ডা গর্জন করে উঠল। আলো ফেললেন হিরণমামা। প্রাগৈতিহাসিক কালের এই দানবীয় প্রাণীটা মারতে পারলে দেশময় হইচই উঠবে সন্দেহ নেই। তিনটি রাইফেল সমানে গর্জে উঠতে থাকল। তারপর হঠাৎ ঢুণ্ডার আওয়াজ থেমে গেল। আলোয় দেখা গেল, দানবটা উবুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

আমরা তিনজনে দৌড়ে গেলুম সেদিকে। কিন্তু প্রকৃতি যেন এটা পছন্দ করলেন না। ঢুণ্ডা যেন তাঁর আদরের সন্তান। মাত্র কয়েক ফুট দূরে থাকতে আচমকা পাহাড়গুলো জেগে উঠল। লাল পাহাড়ের চূড়ায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দেখা গেল। তার পরেই গোটা পাহাড়টা কাঁপতে কাঁপতে আগুন ফেটে বেরোতে থাকল। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ! আকাশে বিশাল সব পাথরের টুকরো ছড়ালো। সিয়েমেল বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ! এ যে আগ্নেয়গিরি দেখছি। পালান, পালিয়ে আসুন।'

চারদিকে ঝলকে ঝলকে আগুনের আভা ছড়াচ্ছে। ধোঁয়া আর আগুনে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। আমাদের আশে-পাশে সশব্দে পাথর ছিটকে পড়ছে। মাটি থরথর করে কাঁপছে। গাছ-পালার ওপর জ্বলন্ত পাথর পড়ে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠছে।

হেলিকপটারে চেপে আমরা তক্ষুনি নিরাপদ এলাকায় সরে

গেলুম। আকাশ থেকে সেই ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ দেখতে দেখতে আমরা পশ্চিম-উত্তরে জোয়াকিমের খামারবাড়ি লক্ষ্য করে এগিয়ে চললুম।

খামারবাড়িতে সেই রাত আর একটা সকাল কাটিয়ে আমরা রওনা হলাম। আসবার সময় জোয়াকিম বুড়ো বলল, 'সিনোর টিটো, সেই ভূতুড়ে গাছের রহস্য জেনে গেলে না?,

তাও তা বটে! বললুম, 'হ্যাঁ, সেই হী-হি-হি ডাকটা কিসের?'

'ওটা বাজপোড়া গাছ। দুটো শুকনো মরা ডাল আছে আড়াআড়ি। রাতের দিকে পিল্টানো নামে মস্ত রাতচরা পাখী এসে একটা ডালে বসে। তখন তার ভারে ওপরের সরু একটা ডাল এসে মোটা ডালে ঠেকে যায়। সেই সময় যদি জোরে বাতাস বয়, তা হলেই ঘষা খায় ডাল দুটো। আর বেহালার ছড়ের মতো সরু ডালটা ঘষা দিতে দিতে ওই ভূতুড়ে আওয়াজ বের করে।' বলে, হাসতে লাগল জোয়াকিম বুড়ো।

যদ্দূর গেলুম, তার আর টমাসের হাত নাড়া দেখলুম। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ট্যাসিনো হাসিয়েন্দার পৌঁছলুম। লুকাস আর ইন্না ফিরেছে কিনা খবর নিতে হবে। তা ছাড়া বিদায় নিতে হবে সবার কাছে।

হ্যাঁ, ফিরেছে ওরা। ওরা জঙ্গলের মানুষ। পথে অবশ্য একটা ক্যানো করতে হয়েছে লুকাসকে। তবে ইগুয়ানচির দিব্যি, সে ক্যানোটা ফেরত দিয়ে আসবে। ইন্নার গলায় হীরের মালাগুলো আছে দেখে স্বস্তি পেলুম। সে রাগে প্রথমে আমার সঙ্গে কথাই বলল না। শেষে বলল, 'নেহাৎ চলে যাচ্ছ তাই বললুম। ভাই টিটোচু, আবার আসবে তো ইগুয়ানচি দেবের রাজ্য থেকে?'

তার মা আমার গালে নাক ঘষে বলল, 'বাছা, কবে দেখা হবে আবার?'

লুকাস আর ওঝা ক্যানাসা আমাদের দিকে ঘুরে তাকাল না। ওরা এখন রাইফেল আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। উদ্বাস্তু হানটা। সভ্য লোক দেখলেই হটাও জীভারিয়া থেকে। জীভারিয়া তাদের স্বদেশ। স্বদেশের মাটি অপবিত্র করতে দেবে না তারা।

জীভারোর মাকে বললুম, 'আবার দেখা হবে।'

আমাদের হেলিকপটার উড়ল। দেখতে দেখতে গেলুম, ওরা হাত নাড়ছে নিচে। মনে মনে বললুম, 'আবার আসব বোন ইন্না, যদি এ জন্মে না পারি, আরেক জন্মে আসব, একজন জীভারো হয়ে আসব।